শিবভূমি ডুয়ার্স

ময়নাগুড়ি

কেমন আছে?

ইকো পর্যটন বংকুলুং কুলেনবাড়ি। শৌলমারি আশ্রম

এখন ডুয়ার্স

বিশেষ সংখ্যা অগাস্ট ২০১৮। ২০ টাকা

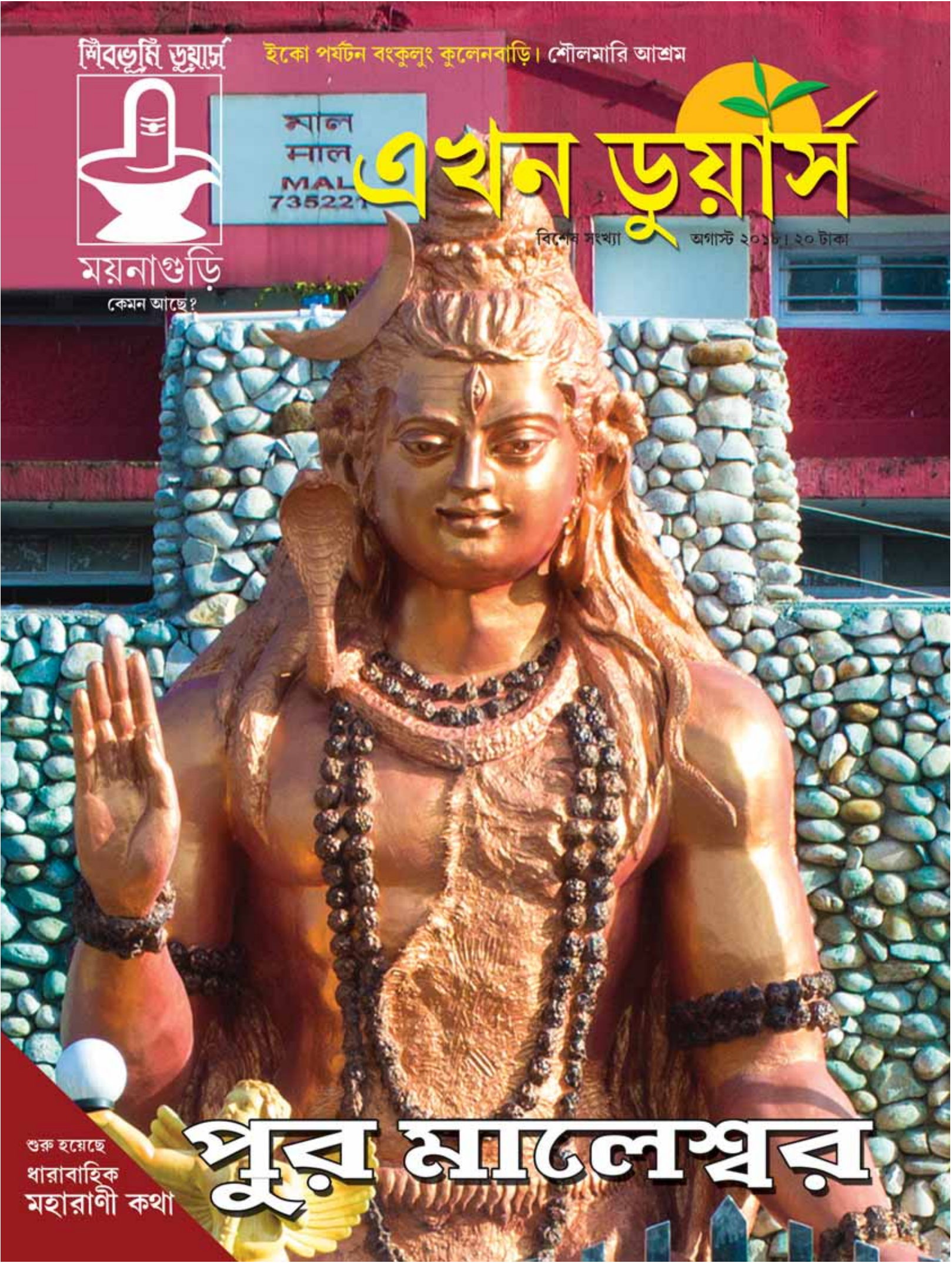

শুরু হয়েছে
ধারাবাহিক
মহারাণী কথা

পুর মালেশ্বর

সাহিত্য সংস্কৃতি সৃজনশীলতার সঙ্গে ১৩০ বছর

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি পৌরসভা শহরের নাগরিকদের প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে ১৩০ বছর অতিক্রম করেছে। এই প্রাচীন পৌরসভার শিকড়টি শহরের গভীর থেকে গভীরের মাটি ছুঁয়ে এখনও সবুজ, এখনও দৃঢ়। শহরের উন্নয়ন, সংস্কার, সৌন্দর্যকরণ-এর সাথে সাথে সভ্যতা, সংস্কৃতি কৃষ্টি ইত্যাদি ক্রমশই নানাভাবে এই শহরটিকে ধনবান করে তুলেছে এবং বাংলায় খ্যাতির শিয়রে পৌঁছে দিচ্ছে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে এ যাবৎ নানান পত্র, পত্রিকা স্মারক, কবিতা গ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সুবাদে জলপাইগুড়ি পৌরকর্তৃপক্ষের কাছে পত্রিকা প্রকাশক, সম্পাদকের কিছু অনুরোধ উপরোধ থেকেই যায়। বছরভর নানা উৎসব, পার্বণ-বই-মেলা-নাট্যমেলা শহরে অনুষ্ঠিত হয়েই চলে। জলপাইগুড়ি পৌরসভা থেকে ওই সকল ক্ষুদ্র পত্রিকা স্মারক বা স্মরণ সংকলন ইত্যাদিতে কিছু নিয়মমাফিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সার্বিক উন্নয়ন— যেমন রাস্তাঘাট, পথবাতি, পরিবেশরক্ষণ, পানীয়জল সহ বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি সর্বতভাবেই জলপাইগুড়ি পৌরসভা থেকে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির স্বাভাবিক বিষয়। তাই নতুন করে বিষয়গুলিকে মনে না করিয়ে শহরের বিভিন্ন কলাকুশলীদের মন ও মননের সৃষ্টিশীল প্রয়াস, সংস্কৃতিবান মানুষের সৃজনশীল চিত্ত পটের অনুরন, গীত-বাদ্য-কলা-অঙ্কন-কবিতা-উপন্যাস-নাটক প্রভৃতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে উক্ত সকল সংস্কৃতির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জলপাইগুড়ি শহর— এই পৌরসভা আরও প্রগতিশীল ও সম্পন্ন হয়ে উঠুক। ধন্যবাদান্তে

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, অগাস্ট ২০১৮

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

নয়া পঞ্চায়েত নব গ্রাম
আগামী সংখ্যায়
মেখলিগঞ্জ

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস। মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি।
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রচ্ছদ ছবি: সুমন সূত্রধর

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের কলমে ৫

বিশেষ প্রতিবেদন
মন্দির-মসজিদ-দেশভাগ ৮

প্রচ্ছদ নিবন্ধ: ময়নাগুড়ি কেমন আছে?
প্রাচীন জনপদ আজও আড়ালেই অবহেলিত ১৩, কৃষিতে আগাগোড়া সমৃদ্ধ ময়নাগুড়ি আজ কি খানিক দিশাহীন? ১৭, মাটির মিঠে সুরে মজে থাকেন ময়নাগুড়ির লোকশিল্পীরা ১৯, অতীত ডুয়ার্সের নানান সময়কে ধরে রাখা ময়নাগুড়ির নানান গ্রামের নামে ২২ শিবরাত্রির জল্পেশকে ছাপিয়ে যায় এখন শ্রাবণী মেলার ভিড় ২৪, জল্পেশ নাম কী ভাবে হল ২৫ মন্দিরময় ময়নামতীর দেশে ইকো পর্যটনের খনি সন্ধানে আসুন ২৬, বিডিও-র কলমে ময়নাগুড়ি ৩৫

ডুয়ার্সের হেথা হোথা
মালেশ্বর ৩০

পর্যটন
বংকুলুং কুলেনবাড়ি সঙ্গে আরও কিছু ৩২

শ্রীমতি ডুয়ার্স
স্বপ্না বর্মণের স্বপ্ন সার্থক হোক! ডুয়ার্সবাসীর শুভেচ্ছা! ৩৮, আমার ঠিকানা নয় বৃদ্ধাশ্রম! নিপীড়িত বৃদ্ধাদের সুরক্ষাকবচ আইন ৩৯, সেই পান্না সবুজ দিনগুলিকে ইচ্ছে করে পেতে ৪০, মনসা পূজা ৪৮

পুরাণ অফুরান
হিড়িম্বা ৫০

উত্তরপক্ষ
প্রতিমা নির্মাণের কারিগরদের পাশে দাঁড়ায় কোন্ দেবতা? ৫৩

ডুয়ার্স পরিক্রমা
শৌলমারি আশ্রম, ফালাকাটা ৫৪

প্রতিবেশি পিএনপিসি
কোচবিহারের কড়চা— শৈবতীর্থ বাণেশ্বর বৌদ্ধমূর্তি? নাকি বৌদ্ধ প্রভাব? ৫৬, দিনাজপুরের দিনলকাল— ৬০০ বছরের প্রাচীন ভৈরবীর মন্দির ৫৭, হিলকার্ট ৬১

বইপত্র
কোচবিহার বৃত্তান্ত ৫৯, জয় জল্পেশ ৫৯

খেলাধুলায় ডুয়ার্স
গোল্ডেন অতীত ৬০

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
মহারাণী কথা ৪২, শালবনে রক্তের দাগ ৪৪, ডুয়ার্স থেকে শুরু ৫১

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬, ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ১০, রাসায়নিক রস ৬২

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

আড্ডাঘর নিউজ

মোবাইল ফোন ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ২০১৮

প্রথম বছর অভাবনীয় সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এসেছিল হাজারখানেকের বেশি ছবি। তার থেকে বাছাই করে ৯২ জনের একটি করে ছবি নিয়ে চলেছিল সপ্তাহব্যাপী ছবি। তাদের মধ্যে থেকে সেরা আটজনকে দেওয়া হয়েছিল পুরস্কার। এবছরও ঘোষণা করা হয়েছে প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ। যে কেউ তার মোবাইলের হ্যান্ডসেটে তোলা সেরা পাঁচটি ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠিয়ে দিতে পারেন ৯৮৩০৪১০৮০৮-এ। সঙ্গে অবশ্যই নাম ও যোগাযোগ নম্বর। শেষ তারিখ ৩১ অগাস্ট ২০১৮। বাছাই ছবির প্রদর্শনী ২-৬ অক্টোবর, পুরস্কার ঘোষণা ৬ অক্টোবর, ২০১৮।

জলপাইগুড়ি শহরের নামী মোবাইল ফোন বিক্রেতা 'সাগরিকা প্লাস' এগিয়ে এসেছেন তাঁদের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা নিয়ে এবারের প্রতিযোগিতাকে আরও সফল করবার জন্য। যাঁরা এবারও যোগ দিতে চান প্রস্তুত থাকুন। লক্ষ্য রাখুন আড্ডাঘর ফেসবুকের পাতায়।

ডানপিটেদের ডুয়ার্স

এখন প্রতি রবিবার সকালে সাড়ে দশটা থেকে আড্ডাঘরে বসছে 'ডানপিটেদের ডুয়ার্স'। শিশুকিশোরদের ঘন্টাদুয়েকের ক্লাবঘর। কী হবে সেখানে? যা রোজকার পড়ার বইয়ের সিলেবাসে নেই, অথচ যা আমাদের চৌখস হয়ে উঠতে কাজে লাগবে। গান, ছড়া, ছবি আঁকা, অভিনয়, সায়েন্স, যোগা, হৈচৈ— একে একে সব হবে। আপনার বাড়িতে বা পরিচিত যে কোনও ডানপিটে থাকলে নিয়ে আসুন ক্লাবে। আড্ডাঘর ক্লাব সদস্যদের উদ্যোগে সদস্যদের প্রথমেই কোনও প্রবেশ মূল্য দিতে হবে না।

ইয়ং ডুয়ার্স ক্যাম্প

প্রত্যন্ত বাংলার কোণে বসে বসে রীতিমত হতাশ তরুণ সমাজ, যাদের বাইরের শহরে চলে যাওয়ার উপায় সামর্থ মার্কস কোনওটাই নেই। সরকারি চাকুরি দূর অস্ত, বেসরকারি সেলসের ভাল চাকুরি পেতে গিয়ে পেরে ওঠে না বড় বড় শহরের স্মার্ট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ফলে হতাশা আরও বাড়তে থাকে। তাদের জন্য আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে দু' সপ্তাহের একটি ক্যাম্প হচ্ছে আড্ডাঘর হলে, যেখানে কলকাতার প্রশিক্ষকরা আসবেন, রোজ দু'-তিন ঘণ্টার নিবিড় অনুশীলন করাবেন। ইংরেজিতে কথা বলতে ও বুঝতে পারার, আদব কায়দা শেখার, কম্পিউটার বেসিক মেইন্টেন্যান্স ও অ্যাকাউন্টস সফটওয়্যার চালাবার প্রস্তুতি কী ভাবে নেওয়া যায় তা জানতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা। ন্যুনতম হায়ার সেকেন্ডারি পাশ যে কেউ যোগ দিতে পারবেন নামমাত্র খরচে। আবেদনপত্র পাওয়া যাবে আড্ডাঘর কাউন্টারে।

আড্ডাঘর ক্লাব সদস্য হওয়া মানেই 'রংরুট' ও 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার গ্রাহক

ফর্ম ভরে দু কপি ছবি সহ ৫০০টাকা জমা দিন আড্ডাঘর কাউন্টারে। জেনে নিন বাকি নিয়ম কানুন। যোগাযোগ করুন গৌতম চক্রবর্তীকে। এখন ডুয়ার্স ফেসবুকেও ইচ্ছের কথা জানাতে পারেন ইনবক্সে। পত্রিকা প্রকাশ হলেই জানিয়ে দেওয়া হয়। ইচ্ছুক থাকলে ফোন করুন ০৩৫৬১২২২১১৭ নম্বরে।

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি	
হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড	৯৪৩৪৪৪২৮৬৬
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড	৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির	
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার	৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি	
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে	৯৭৩৩২৪৬৯১৩
বিজয় ঝা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৮৫৩৮৮২২৪০৪
মালবাজার	
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)	৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা	
দিলীপ সরকার, চালসা মোড়	৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি	
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল	৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া	
বরুন ঘোষ, পোকিসা	৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট	
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি)	৯৭৪৯৭২৫৭৮১
লাটাগুড়ি	
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)	৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি	
দেবাশিষ বসুভাট	৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা	
অমল চন্দ্র পাল	৯৪৩৪৪১২৬৪৯
তুফানগঞ্জ	
আনন্দবাজার বুক স্টল	৯৩৩৩৬৮৮৬৭১
দিনহাটা	
হরিপদ রায়	৯৯৩২৬৩৯০৬৮
আলিপুরদুয়ার	
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট	৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার	
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)	৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে	৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাচারি মোড়	৯৮৫১২৩৪৮৮৯
মালদা	
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি	৯৯৩২৯৬৭৯৯১
বালুরঘাট	
মাধববাবু	৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন	৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

সম্পাদকের কলমে

বনমহোৎসবে বৃক্ষ নিধন ও আমাদের উজ্জ্বলতর আগামী !

জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি উঠে এসেছিল খবরের শিরোনামে। হাইওয়ে বানাতে, ফ্লাইওভার বানাতে গেলে গাছ কাটতে হয়। এবারও তাই হয়েছে, নতুন কিছু নয়। পরিবেশপ্রেমীদের আবেদনে এর আগে হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করলেও গ্রিন বেঞ্চের রায়ে তা খারিজ হয়ে গেছে। বনদপ্তরের হাতে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র। তার পরেও মানুষ ক্ষেপে উঠতে পারে এই আশংকায় কড়া প্রশাসনিক সুরক্ষায় সম্পন্ন হয়েছে অরণ্য নিধন পর্ব। বেশির ভাগ দৈনিক সংবাদপত্রে স্বভাবতই দেড় দিনের বেশি গুরুত্ব পায় নি এ খবর। ডুয়ার্সের শত সহস্র প্রকৃতিপ্রেমীর নীরব প্রতিবাদে কণ্ঠ মেলায় নি বাকি পৃথিবী !

মজার ব্যাপার হল, আসল প্রশ্নগুলি কিন্তু রয়েছে অন্যত্র ! যেমন শত বৈধতা সত্ত্বেও তড়িঘড়ি করে বন মহোৎসবের সময়টাই কেন বেছে নিল বন দপ্তর ? রেল দপ্তরের তাগাদা ? না কি অন্য কোনও মহলের চাপ ? লাটাগুড়ির কথা না হয় আইনের দোহাইতে ছেড়েই দিলাম, এ ছাড়াও ডুয়ার্সের মরাঘাট কাঠামবাড়ি বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে রাতভর বেআইনি গাছকাটার সিন্ডিকেট চলে বলে খবর প্রকাশিত হলেও কেন অচঞ্চল থাকে বন দপ্তর ? কেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিরূপ মন্তব্যের পরেও কোনও হেলদোল নেই বন কর্তাদের ? 'কাউকে কেয়ার করি না' এই হাবভাব নিয়ে বেপরোয়া গাছ কেটে চলেছে যারা তারা কি বন দপ্তরের আশ্চর্য নিঃস্পৃহতাকেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে না ?

বনমন্ত্রী যতই চৌত্রিশ বছরের 'পুরনো ঢাল' নিয়ে বন সুরক্ষার সাফাই গাইতে থাকুন না কেন, বনকর্মীদের অসহায় স্বীকারোক্তিই কি প্রমাণ করছে না উত্তরে বনের সংরক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ কোনওটাই আজ আর বনবিভাগের হাতে নেই ? বনের গাছপালা বা বন্যপ্রাণ, বনসংলগ্ন মানুষ কিংবা বনরক্ষার কর্তাব্যক্তিরা কেউই আজ ভাল নেই ? তা না হলে ঝেড়ে কাশতে অসুবিধে কোথায় দুঁদে সব আইএফএসদের ? লাটাগুড়িতে রেললাইনের ওপর ফ্লাইওভার নির্মাণের বাধ্যবাধকতা নিয়ে প্রচার বা বিজ্ঞপ্তি কোথায় ? গাছ কাটার চাইতেও ফ্লাইওভার তৈরি হলে মানুষের বেশি উপকার কী কী হবে এ নিয়ে তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য সাধারণ মানুষকে খোলাখুলি জানাবার ব্যাপারে এত নিরাসক্ত কেন তাঁরা ?

এরাজ্যের বন বিভাগের রীতিনীতি আগাগোড়াই কখনও সুস্পষ্ট নয়, এ অভিমত দেশের অন্যান্য অরণ্যবহুল রাজ্যের বনকর্তাদের। একটা সময় বৃক্ষ সম্পদ বাড়াতে গিয়ে ঘাসবন নিশ্চিহ্ন হয়েছে, ব্যাপক বিঘ্নিত হয়েছে বাস্তুতন্ত্র বা প্রাকৃতিক বায়োডাইভারসিটি, প্রমাণিত হয়েছে তখনকার বনবিশেষজ্ঞদের অদূরদর্শিতা, এ অভিমত ব্যক্ত করেন এযুগের বনসাহেবরা। বাস্তু ভারসাম্য স্বাভাবিক করতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে তাঁদের। আবার তা করতে গিয়ে বন্যপ্রাণের সংখ্যাধিক্য সরাসরি সংঘাত ঘটাচ্ছে বনভূমিতে মানব সভ্যতার অনিয়ন্ত্রিত বিস্তারের সঙ্গে। বন্যপ্রাণের আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন খালি চোখেই ধরা পড়ছে। তার ওপর কখনও চোরাশিকার, কখনও ছুটন্ত ট্রেন, কখনও হাইভোল্টের বিদ্যুৎ তার বিপাকে ফেলে দিচ্ছে এই ঢাল-তরোয়ালহীন লোকলস্করহীন নিধিরাম সর্দারদের। বনসম্পদ সংরক্ষণের চাইতে তাঁদের অনেকেই আজ হোটেল-ব্যবসাকেই নিরাপদ পন্থা বলে ভাবতে শুরু করেছেন। 'ইকো পর্যটন' হাল আমলের একটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ড, বনের জন্তু বা গাছ চুলোয় যাক, মানুষ খুশি থাকলে অন্তত নেতা-মন্ত্রীদের সন্তুষ্ট রাখা যায়, নয় কি ? কিন্তু গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়ায় এই সব রাস্তা-ব্রিজ-ফ্লাইওভার বানাবার পরিকল্পনা ! শ্যাম রাখি না কুল রাখি এই দ্বন্দ্বেই তখন বোধ হয় নৈর্ব্যক্তিক নীরবতা বেছে নেন সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ ও ডিগ্রি প্রাপ্ত দেশের জঙ্গল রক্ষায় শপথ নেওয়া অফিসাররা।

বনদপ্তরের উন্নাসিক আচরণের পাশাপাশি অবশ্যই নজর কাড়ে স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মুখে কুলুপ আঁটা ভূমিকা। 'ডিএম ডেকে বলে দিয়েছেন গাছ কাটা আটকানো যাবে না', অতএব পুরো উল্টোদিকে মুখ করে 'মজবুত' কোনও অজুহাতের জন্য তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা কি ভেবেছেন সাধারণের চোখ এড়িয়ে গেছে ? গাছকাটায় প্রতিরোধ সম্ভব না হোক নিজেদের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতীকী প্রতিবাদে সামিল হলে কি 'চাকরি' যাওয়ার ভয় থাকে ? অথচ যে প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন একদিন, সেই প্রতিবাদের ভাষা আজ ভুলে গেলে কাল যে অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যেতে পারে সেকথা ভেবেছেন তাঁরা ? সবাই জানে ভূমিসন্তান হয়ে এ জিনিস মনেপ্রাণে হয়ত মেনে নিতে পারেন নি তাঁরা ! বনপ্রহরীদের মতই গণতন্ত্রের প্রহরীদেরও এ হেন 'আত্মসমর্পণ' দেখলে বুক দুরু দুরু করে বইকি ! ভাগ্যিস 'বহুগুণে বৃক্ষরোপণ' বা 'পুনর্বাসন'এর মত জুতসই শব্দগুলি চট করে খুঁজে পেয়েছিলেন !

যেভাবে একদিন দরিদ্র নিরন্ন শ্রমিকের চা বাগান হটিয়ে আবাসনের বিলাস-বিপণনের অট্টালিকা উঠেছে, সেভাবে অচিরেই একদিন লাটাগুড়ির ঝাঁ চকচকে ফ্লাইওভারের ওপর দিয়েও সাঁই সাঁই ছুটে যাবে পর্যটক বোঝাই হুডখোলা জিপসি, পাশে গড়ে উঠবে হস্তশিল্পের হাট, মায়াবী আলোর সান্ধ্য পাব, নীচ দিয়ে বন কাঁপিয়ে চলবে মাল ও টুরিস্ট ট্রেন, আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে আমাদের ডুয়ার্স। কারুরই আর মনে থাকবে না এই দিনগুলির কথা।

আমরা জানি গাছ কাটলে ভোট কাটা যায় না ! আমরা জানি উন্নয়ন ডুয়ার্সে আজ অতি প্রয়োজন। আমরা জানি বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্তের একত্রিত হওয়ার সদিচ্ছা আজ লুপ্ত, প্রতিবাদী ফেসবুকের বাইরে নীরব জীবন যাপনই আজ শ্রেয় ! যেভাবে একদিন দরিদ্র নিরন্ন শ্রমিকের চা বাগান হটিয়ে আবাসনের বিলাস-বিপণনের অট্টালিকা উঠেছে, সেভাবে অচিরেই একদিন লাটাগুড়ির ঝাঁ চকচকে ফ্লাইওভারের ওপর দিয়েও সাঁই সাঁই ছুটে যাবে পর্যটক বোঝাই হুডখোলা জিপসি, পাশে গড়ে উঠবে হস্তশিল্পের হাট, মায়াবী আলোর সান্ধ্য পাব, নীচ দিয়ে বন কাঁপিয়ে চলবে মাল ও টুরিস্ট ট্রেন, আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে আমাদের ডুয়ার্স। কারুরই আর মনে থাকবে না এই দিনগুলির কথা। পক্ষীবিষ্ঠায় বিবর্ণ অজস্র শহীদ বেদির মতই রেললাইনের দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকবে একফালি ন্যাড়া লাটাগুড়ি, কখনও বা বসন্তের উড়ে আসা বুনো ফুল সে মাটিতে ছড়িয়ে দেবে চির ক্ষমাশীল অরণ্য। কোনওদিন যদি কোনও উৎসুক পর্যটক স্মৃতি রোমন্থনের বাসনায় ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে এদিকটায় ! তার টিশার্টের বুকে হয়ত বা লেখা থাকবে প্রাচীন এক স্লোগান 'দাও ফিরে সে অরণ্য' !

সাপৈ

বাপ রে বাপ! যাওয়া আসা করে সাপ! ধূপগুড়ির গেরস্ত হামেশাই দেখছিলেন যে ঘরে ঢুকলেই এক ব্যাটা সর্প লেজ তুলে বাইরে ভাগছে। তাই তিনি তক্কে তক্কে ছিলেন কখন বাইরে থেকে ভেতরে এনট্রি নেয়! তা সেদিন মাহেন্দ্রক্ষণে গেরস্ত ঘর থেকে বের হওয়ার তোড়জোড় করছেন ওমনি সাপবাবু এনট্রি নিলেন। এবার গেরস্ত দেখলেন, বাপ! এ তো গোখরো সাপ! তক্ষুনি মোবাইল তুলে ফোন দিলেন সর্পগ্রেপ্তার কমিটির লোকজনকে। তাঁরা হৈ হৈ করে চলে এসে খপাৎ করে সাপবাবুকে পাকড়াও করে ভরে ফেললেন বস্তায়। তারপর গেরস্তকে বললেন, এ ব্যাটা সাপ আপনার ঘরেই থাকত। শুনে গেরস্ত ঘেবড়ে ঘ! ঘরে মানে? কোথায়? শুরু হল তদন্ত। তারপর জানা গেল ভয়ঙ্কর ইনফো! বিছানার তোষক তুলতেই ফ্যানের হাওয়ায় মেঝেতে উড়ে গিয়ে পড়ল একটা খোলস! তার মানে মিস্টার স্নেক থাকতেন তোষকের নিচে!! আর তার ওপরে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতেন গেরস্ত!! বাপৈ! এ কী টাইপের সাপৈ? এই সিজিনে ধূপগুড়ি থেকে গ্রেপ্তার হওয়া চার ডজন সাপের কেউ তো এমন তোষকপ্রেমী ছিল না রে!

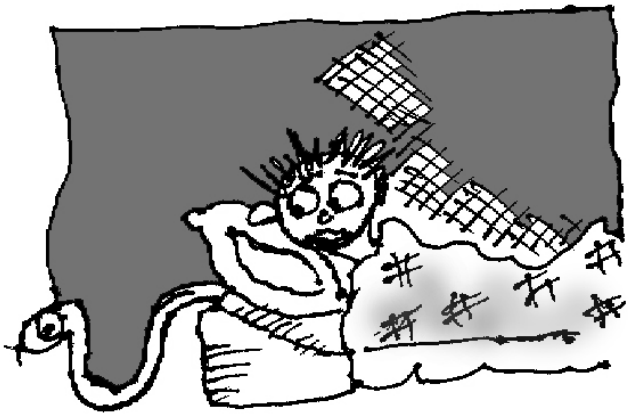

সভামপতি

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে সভাপতি আছেন আবার সভামপতিও আছেন বটেক। দ্বিতীয় পতিটি হল ভামদের সভাপতি। সেই ভাম— যাকে নচিকেতা বলেছিলেন 'বুড়ো ভাম'। সেই গন্ধগোকুল ওরফে ভামবাবুরা বহাল তবিয়তে জেলা পরিষদে চাকরি করছেন। মাইনে টাইনে অবশ্যি পায় না, তবে আপিসটাকে কোয়ার্টার হিসেবে ভোগ করছে তারা। হামেশাই ফাইলপত্র দেখতে আসে। দোপেয়ে কর্মিরা উন্নয়ন ঘটাচ্ছে কি না, তা মাপতে আসে। কম্পিউটরের প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা। তারা আতপ চাল থেকে তৈরি বডি স্প্রে মেখে আসে বলে আপিস ঘর ম ম করে সুগন্ধে। দপ্তুরি সে গন্ধে মাতাল হয়ে ভুল ফাইল নিয়ে আসেন। বড়োবাবুর মন

উদাস হয়ে যায়। আসলে আপিস ঘরের তাকে/ ফাইলের সঙ্গে তারাও থাকে। এদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার জন্য গর্ম্মেন্টকে নোট শিটও পাঠান হয়েছে। হেড এঞ্জিনিয়ার প্যাঁচ কষছেন সভামপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার জন্য। ভামবাবুদের বক্তব্য অবশ্যি জানা যায় নি আর প্রাণিপ্রেমিরা বলেছেন, ভাম থাকা অতি আনন্দের খবর কারণ তারা তো এখন প্রায় 'নেই'। মানেটা বুঝলেন তো? নেই যখন তখন থাক।

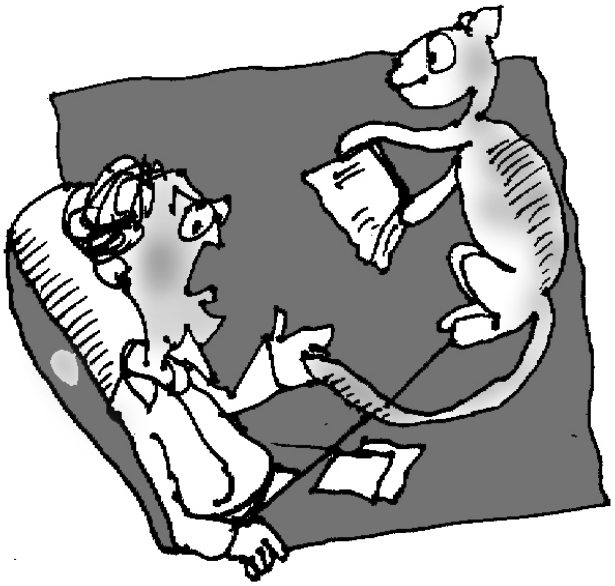

যুক্তি বটেক

জয়গাঁতে আবার দিব্যি চলছে ভূটানি নোট। বছর কয়েক আগে ডুয়ার্স ছেয়ে গেছিল ভূটানি নোটে। বিস্তর চ্যাঁচামেচির পর গর্ম্মেন্ট জেগে উঠে কী কী সব স্টেপ নিয়ে বন্ধ করেছিল সেটা। আবার চালু হয়েছে গো! আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক নাকি বলেছেন, কই! জানি না তো? জয়গাঁতে ভূটানি নোট চলে না বুঝি? ঠিক আছে। অর্ডার এলে ব্যবস্থা নেব! বুঝুন কত্তা! দেশের মধ্যে বিদেশি টাকার লেনদেন বন্ধ করার জন্য বুঝি আলাদা অর্ডার লাগে? আইসি সাহেবও নাকি বলেছেন, অর্ডার নেই! মহা সমস্যা! কেউ কেউ মাথা চুলকে জানিয়েছেন, ভূটানি নোট বন্ধ হলে তো জয়গাঁতে ব্যবসাই বন্ধ হয়ে যাবে স্যার! এইবার বুঝলুম কত্তা! এটাই হল হক কতা! ভূটানি টঙ্কা লেনদেন করে টু পাইস কামিয়ে নেওয়ার সিন্ডিকেট বন্ধ হয়ে গেলে অনেক মহারথী পথে বসবে যে! কিন্তু এত যে দেশপ্রেম দেশপ্রেম ভাব— তা কি জয়গাঁয় এসে আপোষ করে ফেলল গো? আচ্ছা, যাঁরা কইতাসেন ভূটানি মুদ্রা বন্ধের অর্ডার নাই তাঁরা কি ওই মুদ্রা চালু করার অর্ডার পাইসিলেন? যাউক গা! বেশি লজিক ফলাইয়া কাম নাই। গণধোলাই খাইতে পারি।

শিক্ষাচোর

আচ্ছা কত্তা! চিকিৎসক হাতুড়ে হয় শুনেছি, কিন্তু হাতুড়ে ডক্টর? মানে গবেষক গো! ওই যাঁরা গরু খোঁজার মত পরিশ্রম করে শিক্ষার মণিমুক্তো খুঁজে আনেন তাঁদের কথাই বলছি হুজুর। এনবিইউ-র কত্তারা নাকি জানাচ্ছেন গরু খোঁজার বদলে গরু চুরি করাই এখন ফ্যাশান হয়েছে। সেই নবম শ্রেণি থেকে টুকলিফাই করতে করতে বাবুদের জিনে নাকি এতটাই মিউটেশন হয়েছে যে গরু খোঁজার আসরে নেমে এর-তাঁর গরু কপিপেস্ট করে নিজেদের ড্রইং খাতা ভরিয়ে দিয়ে হাসিমুখে ছবি তুলে ডক্টর হয়ে বিয়ের মার্কেটে দাম বাড়াচ্ছেন। সবাই অবশ্যি নয় তবে অনেকেই। সেই সব চোথা আবার পয়সা দিয়ে ছাপানরও ব্যবস্থা আছে কত্তা! সাধেই কি ম্যাগাজিনে 'কমলালেবুতে সাবঅল্টার্ন প্রভাব' গবেষণাপত্র পড়ে পাব্লিকের ডেঙ্গি হয়! এই তো সেদিন এক হবু গবেষক জানাল যে গাইডরা নাকি সিলেবাসের বাইরে গবেষণা করতে গেলে অসন্তোষ প্রকাশ করে ফেল করিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছেন। গাইডবাবু নিজেই নাকি তাঁর বিখ্যাত ও অপঠিত কেতাব 'মনসাপুজো ও খ্রিষ্টধর্ম' পুরোটাই কপিপেস্ট পদ্ধতিতে রচনা করেছেন। দেশে কী কলিযুগ এল বলুন তো! ভাবছি আপনি মাস তিনেক ছুটি দিলে আমিও পিএইডি করব। মানে, পি-এর পর কিউ না এসে কেন এইচ আর ডি এল তা নিয়ে ফাটিয়ে একটা টেক্সট লিখব। শুধু কিছু টাকা আগাম দিয়েন— আফিং কিনব কি না। বিনে আফিমে শিক্ষে চুরি করি কী ভাবে বলুন?

গেট লস্ট

রায়গঞ্জ শহরের রেল গেট কিঞ্চিৎ মেজাজি বটে। ঝম ঝম করে ট্রেন আসছে। এই অবস্থায় নেমে পড়ার কথা গেটবাবুর। কিন্তু নামবেই যে তার কোনও গ্যারান্টি নেই। রেলের লোক তখন লাল পতাকা নিয়ে প্রাণপণে নাড়িয়ে মনে করিয়ে দেয় একদা রাজ্যে লাল পার্টি ছিল। তারপর ধরুন রেল যাওয়ার আগে গেটবাবু সোনামুখ করে নেমে পড়েছেন। কিন্তু আর ওঠেন না। এক্কেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুম রে দাদা! এক ট্রেন গিয়ে আরেক ট্রেনের আসি আসি ভাব, তবুও ওঠে না। তা গেটবাবুর এমন ডিউটি ফাঁকির কথা শুনে রেল কী বলছে? বলছে, গেট পড়ার সময় পাব্লিক হুস হুস করে তলা দিয়ে যেতে গিয়ে ধাক্কা দেয়। তাই গেট যায় বিগড়ে! শুনে পুলিশের লোক মহাখাপ্পা হয়ে বলছে, ইয়ার্কি! গেটের সামনে রাতদিন আমাদের লোক ট্রাফিক সামলায়। আজ পর্যন্ত কেউ ধাক্কা মারে নি গেটবাবুকে! বললেই হল? পাব্লিক অবশ্যি আরো ভয়ানক তথ্য দিচ্ছে! গেটবাবুর নাকি ওঠা-নামার সময় ভেঙে পড়ার ব্যামোও রয়েছে। বাপ রে! শিগগির গেটবাবুকে রিটায়ার করিয়ে দিন। গেট রেডি নয় কো, গেট এক্কেবারে লস্ট।

টু চাংড়াবান্ধা যাই। পথের ধারে সার সার ট্রাক অর্ধেক রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে দেখি। আরো দেখি গুরুদেব রাস্তার ধারে বোল্ডারের পাহাড়। সে সব দেখতে দেখতেই যাই। কিন্তু সেদিন মহাদিদি যখন গেলেন তখন কী ম্যাজিক! কী ম্যাজিক! রাস্তার এ ধারে ট্রাকের লাইন? ভ্যানিশ! রাস্তার ওধারে বোল্ডারের স্তুপ? ভ্যানিশ! কী করে হল বলুন তো? —আরে না হওয়ার কী আছে বৎস্য? তিনিই তো মহাম্যাজিক! অমন একজন ম্যাজিক ফিগার যে পথ দিয়ে যাবেন সে পথে কি বাধা থাকতে পারে বৎস্য? তাই বোল্ডার তুলতে সোল্ডারে সোল্ডার লাগিয়েছে গম্মেন্টের লোক। ট্রাক গেছে ট্র্যাকে। তারপর যেই তিনি গেছেন ফিরে, স-অ-ব আবার আগের জায়গায় এসে গেছে, তাই না? —ওম্মা! গুরুদেব কি ত্রিকালদর্শী? কী করে বুঝলেন?

ফলেন পাখি আয়তে

ফল গাছ থাকলে ফল পাওয়া যাবে। তাহলে পাখিরাও আসবে দলে দলে ফলের লোভে। যাকে বলে ডাবল ফল। কিন্তু ডাবল ফলের বদলে ডুয়ার্সে ডাবল ফল্ট হচ্ছে মামা! পাখিরা কমে যাচ্ছে মানে ফলের গাছ কমে যাচ্ছে। এমনিতে জঙ্গলের ভেতরে কারা জানি কাঠ কাটে। বনরক্ষী দেখলে তেড়ে আসে। পরিবেশপ্রেমিরা বাহ্যিক আন্দোলনে বিশ্বাসি— মানে জঙ্গলের বাইরের গাছ কাটলে তাঁরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন কিন্তু অন্তরের গাছ পটল তুললে তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা বনমন্ত্রী আছেন বলে গম্মেন্টের তালিকায় পাই, কিন্তু আসলে তিনি থাকিয়াও নাই। তিনি বনমহোৎসব করেন আর বন কমে যায়। তিনি ফলের গাছ লাগাবার আবেদন করেন, ফল ফলে না। তিনি বলেন, গাছকে শিশুর মত ভাবুন— গাছ শিশুদশায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। এবার তিনি কহিয়াছেন তিন কোটি গাছের চারা আর আধ কোটি ফলের চারা লাগাবেন। আশা করি কোটিতে গুটিক বাঁচিবে। সুতরাং ফলের ফলাফল সফল হইবার আশা কম। রাস্তা তাই একটাই দেখছি মামা! ফরেন থেকে পাখির ডিম এনে ডুয়ার্সে ফোটান। বনমন্ত্রী (যদি থাকেন) চাকুরি হারাতে চাইলে এই প্রস্তাব আন্ডাশ্রী নামে হাওড়ায় পাঠিয়ে দেখতে পারেন।

মেখলি ম্যাজিক

আচ্ছা গুরুদেব! জানাডু থেকে কি জাদুকর ম্যানড্রেক এইচিলেন মেখলিগঞ্জে। আমি তো নিত্তি ময়নাগুড়ি

টুক্রাণু

জল্পেশ মেলায় সাধুর ছদ্মবেশে পাক খাচ্ছে পুলিশ। এবার গরমে দার্জিলিং-এ ফ্যান বিক্রি বেড়ে গেছে। অধিকারী বিধায়কের মতে, ডুয়ার্সের জঙ্গল নাকি বাঁশবন —বাইরে থেকে গভীর লাগে। বেঙ্গল সাফারির

বাঘমামাদের জন্য বাঘমামি প্রয়োজন। বাঙলাশ্রী খ্যাত বাস পয়লা দিনেই গুঁতো মারল ট্রাকে। গয়েরকাটায় কোথাও উন্নয়ন দাঁড়াতে পারছে না। কাঠের আগুনে মিড ডে মিল ফলতঃ ধোঁয়ায় নাকাল পড়ুয়া, বাসনের কালি তুলতে নাকাল বাসনমাজিয়ে— জলপাইগুড়িতে। বেরুবাড়িতে লালনের মূর্তি অবহেলায় পড়ে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মানুষের ঘর ভাঙায় হাতিদের কোনও বিরাম নেই ডুয়ার্সে। দিনহাটার পেটলা বাজারে নাকি ঘণ্টায় ঘণ্টায় গুলি-বোমা চলছে। ময়মনসিং পাড়া গ্রামের বাসিন্দারা মাত্র চল্লিশ বছর ধরে একটা সেতুর জন্য আবেদন জানিয়ে আসছেন। বিয়ে দিয়ে ফেরার পথে পুরুৎ মশাই কামড়ে দিল এক হতাশ, অবিবাহিত ধূপগুড়িয়ান সাপ।

ছড়রা

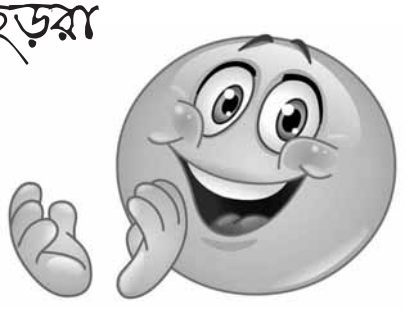

ডুয়ার্স বাপের জমিদারি?

অন্ধ গলির চিলতে ছাদের ছটাক ছয়ের বাড়ি
স্কন্ধ ঝাঁকাই ডুয়ার্স আমার বাপের জমিদারি!

জিপসি চেপে জঙ্গলে যাই টিপসি টেলিলেন্স
সন্ধে গড়ায় সান্তালি নাচ বোগাস অল ননসেন্স!

ঘাস জঙ্গল ঘুমিয়ে পড়ে গন্ডার পরিবার
বান্দরদল বিন্দাস ভাগে নামলে অন্ধকার

মুর্তি চরের ফুর্তি ঘরে পাগলা হাতির সাথে
হুস্কি পিয়ে টুসকি লিয়ে জমাই খাতির রাতে।

সার্চ লাইটে মার্চ করে যায় সম্বর বাইসন
লেপার্ডরা সব লেংটি গোটায় কাঁপতে থাকে বন।

নিশুত রাতি চড়ুইভাতি কানুনকে কাচকলা
পাগলু দাঁতাল ঢুলুঢুলু কয়, ভাগলু এবার শালা!

সনাতন চন্দ

(ব্যঙ্গ ছড়া পাঠান। বিষয় সাম্প্রতিক ডুয়ার্স। ইমেল: editor.ekhonduars@gmail.com)

বিশেষ প্রতিবেদন

মন্দির-মসজিদ-দেশভাগ নিয়ে

ইতিহাসের আধুনিক ব্যাখ্যা জানা ও জানানোটা দেশ ও নিজের ভবিষ্যত রক্ষায় অতি জরুরি

দেবপ্রসাদ রায়

এদেশের আধুনিক কালের ইতিহাস যতই ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতই আধুনিক হচ্ছে ততই অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা উঠে আসছে, অনেক বেশি তথ্য ভিত্তিক হয়ে নিরপেক্ষ হয়ে উঠছে— কেউ তা' যদি মেনে না নিয়ে সেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে লেখা ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তা' হলে ইতিহাসের প্রতি যেমন অবিচার হয় তেমনই নতুন প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনে ত্রুটি থেকে যায়।

সম্প্রতি বহুল প্রচলিত ও পঠিত একটি পাক্ষিক পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় একজন নিয়মিত নিবন্ধ লেখকের একটা লেখা (রাম কার?) পড়ে আমার এ' ধারণাটা আরও একবার প্রামাণ্য বলে মনে হয়েছে। এই প্রতিবেদন সেই নিবন্ধকারের সঙ্গে ইতিহাসের ব্যাখ্যা নিয়ে কোনও যুদ্ধে নামার বাসনায় নয়, তথ্যটিকে সঠিক ভাবে প্রকাশিত করবার একটি প্রয়াস মাত্র। লেখকের নিবন্ধের দু'টি মন্তব্য ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। বাবরি মসজিদ নিয়ে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন— "১৯৯২ সালে অযোধ্যায় রামের জন্মস্থান বলে কথিত ভূমিতে মোগল শাসক বাবর ষোড়শ শতকে যে ইসলামীয় প্রার্থনাস্থল তৈরি করেছিলেন....." কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা কি এই উক্তিকে সমর্থন করে? ঐতিহাসিক তথ্যের গভীরে অনুসন্ধান চালিয়ে যে তথ্যটি উঠে আসে তা' কিন্তু অন্য কথা বলে।

অযোধ্যা রামভক্তদের দ্বারা '৯২ সালে কালিমালিপ্ত না হলে, ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক নিদর্শন হতে পারত। এমন কোনও স্থান আর এদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র জন্মেছেন (পুরাণের মতে), ভগবান বুদ্ধ জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছেন, জৈন ধর্মের প্রবক্তা মহাবীর ও শিখ ধর্মগুরু গুরুনানক পদার্পণ করেছেন। ফা-হিয়েন থেকে হিউ-এন-সাং, আবুল ফজল থেকে উইলিয়াম ফিঞ্চ সমস্ত ঐতিহাসিক তথা পরিব্রাজক অযোধ্যা নিয়ে সব তথ্যই জানিয়েছেন— শুধু তাঁরা যা জানাননি, তা আজ মসজিদ ধ্বংসকারীরা জানাচ্ছে যে, অযোধ্যার রামজন্মভূমি মন্দির বাবর ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ তৈরি করেছিলেন। ধ্বংসের কথাও ঠিক, মসজিদ-নির্মাণের কথাও ঠিক। কিন্তু যা ঠিক নয় তা হল, ধ্বংস হওয়া ইমারত মন্দির ছিল না, আর মসজিদ নির্মাতা বাবর ছিলেন না।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী অযোধ্যা ছিল জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান। 'সাকেত' ও 'শ্রাবস্তি'— দুটি জনপদ ছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের লীলাভূমি। গড়ে

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের অনুসন্ধান অনুযায়ী বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে। তাহলে ইতিহাসের সঙ্গে আজকের বিতর্কের সম্পর্ক কোথায়? এই ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করে আমরা যদি বাবরের দ্বারা মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল বলে স্বীকৃতি দিয়ে দিই, তাহলে পরোক্ষে যাঁরা সেখানে যে অজুহাতে, মন্দির নির্মাণ করতে চাইছেন, তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে যায়। একটা 'মিথ'-কে নিরন্তর প্রচারের মাধ্যমে 'ফেইথ'-এ পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু সেটা যে 'ট্রুথ' নয়, তা সোচ্চারভাবে বলা দরকার।

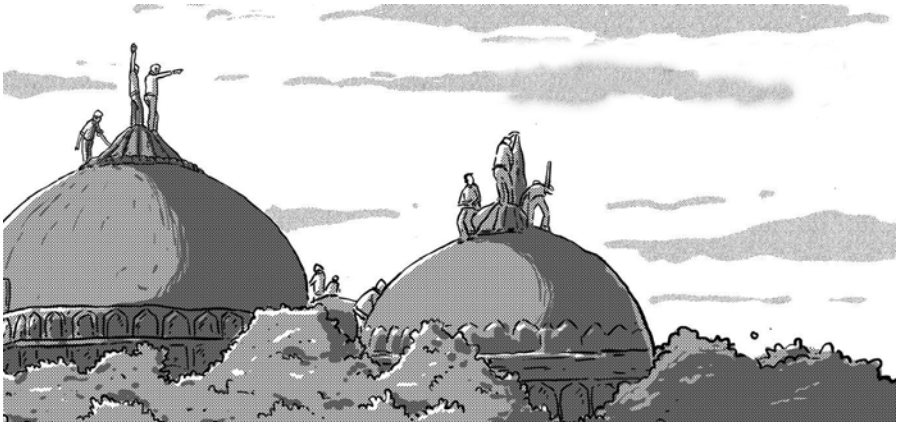

উঠেছিল অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ ও জৈন মন্দির। সপ্তম শতাব্দী থেকে অবক্ষয় শুরু হয় এবং আধুনিক ইতিহাস বলছে, একাদশ শতাব্দীতে প্রথম পাঠান আক্রমণ হয় অযোধ্যার মাটিতে। এবং একাদশ শতাব্দীতেই অযোধ্যা দিল্লিতে ইলতুতমিসের শাসনকালে দিল্লির সুলতানি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পাঠানরা নিজেদের প্রয়োজনে তৈরি করেছিল জৌনপুরের সারকী স্থাপত্যের অনুকরণে বৌদ্ধ স্তূপের ওপর জামা মসজিদ। বাকি স্তূপগুলি পরিচিত হল পরবর্তীকালে মণিপর্বত, কুবের পর্বত ও সুগ্রীব পর্বত নামে। বিত্তশালী জৈন বণিকরা গয়া থেকে আনিয়েছিলেন কালো পাথরের কারুকার্যকরা স্তম্ভ, বানিয়েছিলেন আদিনাথ মন্দির। তার ধ্বাংসাবশেষ থেকে স্তম্ভগুলিকে তুলে নিয়ে এসে ব্যবহার করা হল জামা মসজিদে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী চালে জামা মসজিদ হল বাবরি মসজিদ এবং বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ রূপান্তরিত হল রাম মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গভর্নর স্লিম্যানের আইন শৃঙ্খলাজনিত রিপোর্ট, ১৮৫৩-৫৫ সালে বাবরি মসজিদের দখল নিয়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ এবং অযোধ্যার সার্বভৌমত্ব খারিজ করে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্তি— সবই এক সুতোয় বাঁধা, এক সুগভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত। অযোধ্যার নবাবরা ছিলেন শিয়া, মোঘলরা সুন্নি, ব্রিটিশের প্রয়োজন মোঘল শাসনের অবসান— তাই নবাব ও ব্রিটিশ উভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ভগবান বুদ্ধ ও মহাবীরের কর্মভূমি কেবলমাত্র রামচন্দ্রের জন্মভূমি ও লীলাভূমি রূপে স্বীকৃতি পেতে লাগল। সরকারি জমিতে সরকারি আনুকুল্যে গড়ে উঠল ১৩১টি রামচন্দ্রের তীর্থস্থান ও মন্দির। ব্রিটিশ আনুকুল্য আরও বৃদ্ধি পেল সিপাহি বিদ্রোহের সময়, হিন্দু মহন্ত ও বৈরাগীদের বন্ধুসুলভ আচরণে। বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশদের আশ্রয়দানে ও অযোধ্যা থেকে গোন্ডা পলায়নে সাহায্যের প্রতিদান রূপে বৈরাগীরা পেলেন গ্রামের পর গ্রাম উপঢৌকন ও মন্দির গড়ে তোলার আর্থিক সাহায্য। ফৈজাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দুদের নিয়ে কমিটি গঠন করলেন রামচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি চিহ্নিতকরণের জন্য। প্রিন্স অব ওয়েলস-এর আগমন উপলক্ষে যে অর্থ সংগৃহীত হল তা তিনি ফৈজাবাদ না আসায় সে টাকাও দেওয়া হল মন্দির সংস্কারের কাজে ব্যবহার করার জন্য।

এই পটভূমিতে জন লেডেন লিখছেন। সেই ইতিহাস অথবা জন লেডেনের ইতিহাস দিয়ে এই পটভূমির শুরু— 'বাবর এলেন ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে মার্চ

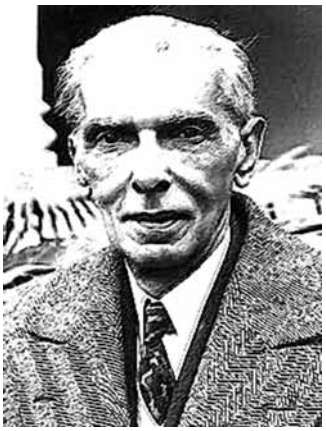

অযোধ্যায়। মীর বাঁকিকে ফরমান দিলেন রাম জন্মভূমি মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ তৈরি করতে।' লেডি বেভেরিজ ১৯০১ সালে লিখলেন, বাবর এসেছিলেন 'বাহরাইচে'— অযোধ্যা থেকে ৭২ মাইল দূরে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের অনুসন্ধান অনুযায়ী বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে। তাহলে ইতিহাসের সঙ্গে আজকের বিতর্কের সম্পর্ক কোথায়? এই ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করে আমরা যদি বাবরের দ্বারা মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল বলে স্বীকৃতি দিয়ে দিই, তাহলে পরোক্ষে যাঁরা সেখানে যে অজুহাতে, মন্দির নির্মাণ করতে চাইছেন, তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে যায়। একটা 'মিথ'-কে নিরন্তর প্রচারের মাধ্যমে 'ফেইথ'-এ পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু সেটা যে 'ট্রুথ' নয়, তা সোচ্চারভাবে বলা দরকার।

সেই নিবন্ধকার আরও লিখেছেন, 'একটা ধর্মের দোহাই দিয়ে জিন্না তৈরি করেছিলেন পাকিস্তান'। হয়ত তাই, কিন্তু তারও একটা পূর্বভূমি আছ। দেশভাগের আগে শেষ যেখানে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সহাবস্থান হয়েছিল তা হলো 'অন্তবর্তী মন্ত্রিসভা'। ৭ই আগস্ট ১৯৪৬- পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেন। ক্ষিপ্ত জিন্না তার প্রতিক্রিয়াতে ১৬ই আগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' ঘোষণা করেন। যা ইতিহাসে 'কালো অধ্যায়' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তবুও দেশভাগ রুখতে গান্ধীজী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু শেষ চেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে ১৫ই অক্টোবর মুসলিম লিগ অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে রাজি হয়। সে 'ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা' নিয়ে বলতে গিয়ে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ জানাচ্ছেন ঃ

"উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ওয়ার্কিং কমিটি এবং বিশেষ করে তার যে সদস্যরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ছিলেন, দেশভাগের পরিকল্পনায় সায় দিয়েছিলেন... কারণ তাঁরা দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা দেখছিলেন যে দাঙ্গা একটা দৈনিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল, এবং হতেই থাকবে বলে মনে হচ্ছিল, এবং সরকার এগুলো আটকাতে অপারগ ছিল, কারণ মুসলিম লিগের মন্ত্রীরা সর্বত্র বাধা দিচ্ছিলেন... ফলে প্রশাসন চালানো অসম্ভব হয়ে উঠছিল। আমরা ভাবলাম যে দেশভাগ মেনে নিয়ে আমরা অন্তত যে অংশটা আমাদের দিকে থাকবে, সে দিকটা আমাদের মত অনুযায়ী চালাতে পারব, দেশের বৃহত্তর অংশে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারব, আর এমনভাবে সংগঠিত করতে পারব যে, আমরা সবচেয়ে ভাল ভাবে তার সেবা করতে পারব। আমাদের সেই জন্য দেশ ভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া আর পথ ছিল না।"

ওয়ার্কিং কমিটি এবং বিশেষ করে তার যে সদস্যরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ছিলেন, দেশভাগের পরিকল্পনায় সায় দিয়েছিলেন... কারণ তাঁরা দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা দেখছিলেন যে দাঙ্গা একটা দৈনিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল, এবং হতেই থাকবে বলে মনে হচ্ছিল, এবং সরকার এগুলো আটকাতে অপারগ ছিল, কারণ মুসলিম লিগের মন্ত্রীরা সর্বত্র বাধা দিচ্ছিলেন... ফলে প্রশাসন চালানো অসম্ভব হয়ে উঠছিল। আমরা ভাবলাম যে দেশভাগ মেনে নিয়ে আমরা অন্তত যে অংশটা আমাদের দিকে থাকবে, সে দিকটা আমাদের মত অনুযায়ী চালাতে পারব, দেশের বৃহত্তর অংশে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারব, আর এমনভাবে সংগঠিত করতে পারব যে, আমরা সবচেয়ে ভাল ভাবে তার সেবা করতে পারব। আমাদের সেই জন্য দেশ ভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া আর পথ ছিল না।' *—বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ*

এই নিষ্ঠুর নিয়তি কি এড়ানো যেত? হয়ত যেত না। তবুও এই পরিণতির ইতিহাসটারও একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাই, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম'-এ... "শেষ পর্যন্ত লিগ মন্ত্রীসভায় অংশ নিতে সম্মত হওয়াতে মন্ত্রীসভার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিল এবং তাঁদেরকে জায়গা করে দিতে কাউকে কাউকে সরে দাঁড়াবার প্রশ্ন উঠে এল। ঠিক হল, মিঃ শরৎ চন্দ্র বোস, স্যার সাফাৎ আহমেদ খাঁ এবং সৈয়দ আলি জাফর পদত্যাগ করবেন। লর্ড ওয়াভেল চাইছিলেন, ওদের একটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর যেন দেওয়া হয়। ওনার নিজের মত ছিল গৃহ মন্ত্রকটি লিগকে দেওয়া হোক কিন্তু এ প্রস্তাবে সর্দার প্যাটেল ভয়ানকভাবে বেঁকে বসলেন। নতুন ব্যবস্থায় যেহেতু আইন শৃঙ্খলা রাজ্যগুলির হাতেই থাকবে, কেন্দ্রের বিশেষ কিছু করার থাকবে না, আমিও চাইছিলাম, গৃহ মন্ত্রণালয়ই লিগকে দেওয়া হোক। কিন্তু সর্দার প্যাটেল এতই বিষয়টি নিয়ে স্পর্শকাতর ছিলেন যে তিনি প্রয়োজনে পদত্যাগ করার হুমকি দিয়ে রাখলেন। অচলাবস্থা কাটাতে রফি আহমেদ কিদোয়াই সাহেব, পরামর্শ দিলেন, তাহলে বরং অর্থ মন্ত্রকটাই লিগকে দেওয়া হোক। কারণ দপ্তরটি এতোই 'টেকনিক্যাল' যে তা সামলাবার মত কোনও ব্যক্তিত্ব লিগের কাছে নেই। হয় ক'দিন পরে ফেরৎ দেবে অথবা চালাতে গিয়ে নিজেকে হাস্যাস্পদ করবে। দুটোতেই কংগ্রেসের লাভ। প্রস্তাবটা সর্দার প্যাটেল লুফে নিলেন, যদিও আমি বলতে চাইছিলাম, 'অর্থ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর এবং সেটা হাতছাড়া করা বোধহয় কংগ্রেসের দিক থেকে ঠিক হবে না। কিন্তু সর্দার সাহেব বললেন, ওরা কিছুতেই নিতে রাজি হবে না এবং এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করবে।"

তাঁর লেখাটি থেকে জানতে পারা যায় (পৃঃ ১৭৯) যে বাস্তবে উলটো হয়েছিল। লিয়াকত আলি অর্থমন্ত্রী হলেন এবং সে সময়ে অর্থ দপ্তরে যে তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন মুসলিম রাজ কর্মচারীরা ছিলেন তাদের সহায়তায় লিগ এমন পরিস্থিতি তৈরি করল যে, সর্দার প্যাটেল গৃহমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নিজের দপ্তরে একজন 'চাপরাসি'-ও নিয়োগ করাতে পারছিলেন না। শুধু তাই নয়, মন্ত্রী সভার যে কোনও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে 'নেগেট' করবার ক্ষমতা অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলির হাতে থাকবার ফলে তিনি এক অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার পরিণতিতে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের খেদোক্তি। দপ্তর বন্টনের ত্রুটিতে, লিগের অসহযোগিতা করার সুযোগ এবং কংগ্রেসের মন্ত্রী সভায় চালকের আসনে থেকেও কিছু করতে না পারা অসহায়তা, বোধহয় দেশভাগকে আরও অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। তাই ইতিহাসের এই নির্মম সত্যটিকে স্বীকার করে নেওয়াই বোধহয় দায়িত্বশীলতার লক্ষণ।

কুমলাই ডামডিম সাইলি

প্রকৃতির অঢেল ঐশ্বর্যের মাঝে ভালই আছে

উত্তরবঙ্গে প্রকৃতির জীবন্ত অ্যালবাম যদি দেখতে আগ্রহী হন তো বেরিয়ে পড়ুন ডুয়ার্সের পথে-প্রান্তরে — জঙ্গল, পাহাড়, নদী, চা বাগান, ঝোড়া, খোলা সবমিলিয়ে এক দুরন্ত কোলাজের ডুয়ার্সে। যেন স্বপ্নলোকের দেশে যাত্রা। ভোরের প্যাসেঞ্জার ট্রেন যখন শিলিগুড়ি জংশন থেকে হিজিবিজি মাকড়সার জাল ছাড়িয়ে দাঁড়ায় গুলমা স্টেশনে, মনে হবে এখানেই পেয়ে গেছি স্বপ্নলোকের চাবি। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, চা-বাগানের মধ্যিখানে স্টেশনবাড়িটি চুম্বকের মত টেনে ধরে দুই চোখ আর অভাগা শহুরে মনটাকে। তারপরে মহানন্দা অভয়ারণ্যের মাঝখান দিয়ে সেবক — এই যাত্রাপথের সৌন্দর্য বর্ণনা করা সে পিপাসু মনের সাধ্যাতীত। এবারের চা বাগিচা সফরে বেরিয়ে পড়লাম ডামডিম। কারণ তালিকায় আছে কুমলাই, ডামডিম, সাইলি, রানিচেরা এবং রাঙ্গামাটি চা বাগিচা। একথা বলাই বাহুল্য যারা সত্যিকারের প্রকৃতি পর্যটক, অর্থাৎ পাহাড় জঙ্গল নদী

ঝোরা ভালোবাসেন তবে একবার ঘুরে যান এই সার্কিটে। রাত কাটাতে থাকতে পারেন ডামডিম চা বাংলোতে, সাইলিতে, রাঙ্গামাটিতে বা পশ্চিম ডামডিমে, থাকার জায়গার অভাব নেই। আর বেড়ানো? উন্মুক্ত আকাশ, পাহাড়, চা বাগান তো পড়েই রয়েছে সামনে। পাঠকদের চা বাগিচার দুঃখ-যন্ত্রণা পরিকাঠামোর সমস্যা নিয়ে লিখতে লিখতে বাগানের পর বাগান যাচ্ছি আর দেখছি রাগ, ঘৃণা, ক্ষোভের প্রতিচ্ছবি চোখে মুখে। পৃথিবীর কাউকে এই নিরন্ন মানুষগুলি আর বিশ্বাস করতে পারছে না। এমনকি নিজের সম্প্রদায়ের নেতাদেরও গদ্দার বলতে ছাড়ছে না। কিন্তু এবারের সফরে ডামডিম, রাঙ্গামাটি বাগান দেখে যেমন মন ভরে গেল, তেমনি কুমলাই, সাইলি, রানিচেরার মতো মোটের উপর ভালো বাগানগুলিও পেলাম। আর পর্যটনের কথা যদি বলা যায় তাহলে আগে পড়ুন এবারের এই পর্ব। তারপর ভাবুন আসবেন কিনা।

চিরচেনা পথ দেখতে দেখতে যাওয়া। বাঘপুল, সেবকেশ্বরী মন্দির, মংপং নেচার রিসর্ট পার হয়ে নিবিড় শালকুঞ্জের শেষে এলেনবাড়ি চা-বাগান। কিছুটা এঁকেবেঁকে রংডং খোলা পার হয়ে ওয়াশাবাড়ি, বাগরাকোট চা বাগান। ডানদিকে লিজ রিভার এবং সোনালী চা বাগান। শিলিগুড়ি থেকে গরুবাথান এর দুরত্ব ৬০ কিলোমিটার। নিজের গাড়িতে কিংবা ভাড়া ট্যাক্সিতে গেলে অনায়াসে দেড় ঘণ্টায় পৌঁছানো যায়। অবশ্য সেবকের লেবেল ক্রসিং বন্ধ কিংবা ধস বা যানজট হলে আলাদা কথা। বাসে সোয়া দুই ঘন্টা সময় নেয়। আমার কোনও তাড়াহুড়ো নেই। গাছের নিচে হাঁড়িয়া পান, ভ্যানরিকশা, দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তোলার ছন্দময় দৃশ্য দেখতে দেখতে ডামডিম মোড়। ডামডিম মোড় থেকে বাঁ হাতের রাস্তা দিয়ে ৭ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম ডামডিম। রাস্তার অবস্থা যে ভাল সেটা বলা যায় না। আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে হেলতে-দুলতে আমাদের ভ্যানগাড়ি এগোচ্ছিল। যত সামনের দিকে যাচ্ছিলাম ততটাই জনবিরল হয়ে পড়ছিল পথঘাট।

ওদলাবাড়ি রেলস্টেশনের পিছন দিয়ে আরও একটু এগোতেই চলে এল আমাদের গন্তব্যস্থল পশ্চিম ডামডিম রিসর্ট। যেটির দেখভাল করেন তারক ভট্টাচার্য। আমাদের রিসর্ট বুক করাই ছিল ফোনে। তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। জানা গেল পর্যটকদের জন্য নতুন ঠিকানা হিসেবে উঠে এসেছে এই পশ্চিম ডামডিম রিসর্ট। বিরাট জায়গা জুড়ে মোট ছয়টি কটেজ। একটির সঙ্গে অন্যটির ৩৫ থেকে ৪০ মিটারের মতো দুরত্ব। একদিকে ডাইনিং হল। এলাকাটা বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ঘেরা। এক পাশে ঢেউ খেলানো সবুজ চা-বাগান, অন্যদিকে তিরতির করে বয়ে চলা নদী। এত নিস্তব্ধ চারিদিক যে কান পাতলেই চেল নদীর কলতান শুনতে পাওয়া যায়। নদীর ওপাশে আপালচাঁদ ফরেস্ট। কালচে সবুজ এই গহীন অরণ্যের কথা ডুয়ার্স তো বটেই, ডুয়ার্সের বাইরেও সুবিদিত। সন্ধে হলেই হাতির দল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাদের নিজস্ব করিডর দিয়ে চলাচল করে। ৪০-৫০ টি হাতির পাল দেখতে পাওয়া যায় প্রায়ই। দেখা যায় ময়ূর। চা-বাগানে একজোড়া লেপার্ড আছে। বেশ কিছু পর্যটক এর সেই চিতাবাঘগুলোকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। খেয়েদেয়ে বেড়িয়ে পড়লাম সাইকেল নিয়ে কুমলাই এবং ডামডিম চা বাগিচা সফরে। আমার সঙ্গী তারকদার ভাই অনুপম।

কুমলাই চা বাগান

মালবাজার সাব ডিভিশনের কুমলাই চা বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী দি কুমলাই টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। বাগানটি ডি বি আই টি এ সংগঠনের সদস্য। বর্তমান কোম্পানি কলকাতার রাজকুমার কানোল অ্যান্ড কোং ১৯৯৪ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা এখন একটিই, ডি টি ডি পি এল ইউ। কুমলাই চা বাগানটির আয়তন এবং চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৫৮৭.৬২ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল এবং মোট চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ২৯৩.৮২ হেক্টর। প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৬০০ কেজি করে চা ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়। মোট কর্মরত শ্রমিক ১১০৩ জন। কুমলাই চা বাগানে নিজস্ব কাঁচা চা পাতা উৎপাদনের গড় ২০ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব উৎপাদিত চা ৫ লাখ কেজি। প্যাকেজড টি উৎপাদনের পরিমান ৬ লাখ কেজি। মোট বাৎসরিক উৎপাদিত চা ১১-১২ লাখ কেজি। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাগানে ইনঅরগ্যানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়।

কুমলাই চা বাগিচায় ছোট হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারি আছে। ডাক্তার আছেন। মেল ওয়ার্ডের বেড সংখ্যা ১২টি, ফিমেল ওয়ার্ডে সংখ্যা ১২ টি, আইসোলেশন ওয়ার্ডে ৪টি, মেটারনিটি ওয়ার্ডে ২টি। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার আছে। অ্যাম্বুলেন্স আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও আছে। চিকিৎসার জন্য গড়ে বছরে ৫০০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয়। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয় না বললেই চলে।

বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই ২০১২ সাল থেকে। এর কারণ জানা যায়নি। বাগিচায় ক্যান্টিন নেই। ভ্রাম্যমান ক্রেশের সংখ্যা ২টি। ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা এবং শৌচালয় নেই। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের দেওয়া হয় বলে দাবি থাকলেও বাস্তব ভিন্নধর্মী। শিশুদের পোশাক সরবরাহ করা হয় না নিয়মিত। পর্যাপ্ত পানীয় জল ক্রেশে এবং চা বাগানে সরবরাহ করা হয় না। পানীয় জল সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্যও নয়। ক্রেশে মোট অ্যাটেন্ডেন্ট ৩ জন। বাগিচায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় নেই। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা হিসাবে একটা বাস আছে। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে। কুমলাই টি গার্ডেনে প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে নিয়মিত অর্থ জমা পড়ে না বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। বোনাসের পরিমাণ ২০ শতাংশ হলেও মালিকপক্ষ বোনাসের সময় ন্যায্য টাকা দিতে গড়িমসি করে বলে অভিযোগ। বকেয়া পি এফ এর মোট অর্থ জানা যায়নি। তবে মোটা অঙ্ক বলেই জানা গেছে। গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ গড়ে বছরে দু লাখ টাকা। বছরে গড়ে ১৩ জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়।

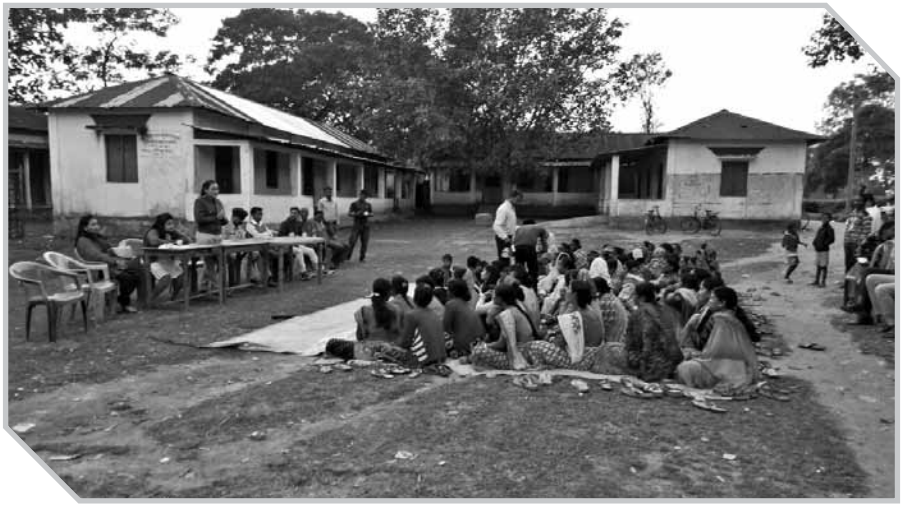

কুমলাই চা-বাগানে মজুরির দাবিতে চলছে মিটিং

ডামডিম টি এস্টেট

ডামডিমে এলেই কেমন যেন নস্টালজিক হয়ে পড়ি। অনেকবার এসেছি ডামডিমে। বহুবছর আগে প্রথম এসেছিলাম ডামডিম। মিনগ্লাস চা বাগিচায় আমন্ত্রণ ছিল বন্ধু মনোজ খেড়িয়াদের বাড়িতে। দেখেছিলাম মোরগা লড়াই। সেই প্রথম দেখেছিলাম ডুয়ার্সের হাট। ঘুরতে ঘুরতে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল। ক্রমে রাতও হয়ে গিয়েছিল। আমার জন্য বাড়িতে মনোজকে বকা খেতে হয়েছিল প্রচুর। এবার ডামডিম চা বাগানের ভেতরে ম্যানেজারের বাংলোতে সটান ঢুকে পড়ি। সবুজ সমুদ্রের মাঝে বহু পুরনো বাংলোটি যেন ছবির মতো সেঁটে আছে। বাংলোর মুখোমুখি নরম সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। বাংলোয় যাবার পথে লাল কৃষ্ণচূড়া ফুলের পাপড়ি কেউ যেন পুষ্পবৃষ্টির মতো ছড়িয়ে দিয়েছে। লাল-সবুজের অদ্ভুত মিশ্রণ। ব্রিটিশরা চলে গেলেও চা বাগানের ম্যানেজারদের আদব-কায়দাগুলি রয়ে গেছে। মদ্যপান, হুল্লোড়, নানাপ্রকার স্ট্যাটাস তো আছেই। বাংলোর পেছনে আম, জাম, লিচু, ফল ফুলের গাছ। টাটারা এখন মন দিয়েছে টি টুরিজমে। ডুয়ার্সের চা পর্যটন খায়, না মাথায় দেয় বোঝা দুষ্কর। অথচ সদিচ্ছা থাকলে কত কি করা যায় মকাইবাড়ি তার প্রমাণ। প্রায় ঘন্টাদেড়েক বাংলোতে কাটিয়ে আমরা পরিত্যক্ত গেস্ট হাউসগুলি পরিদর্শনে যাই। পর্যটকদের আহ্বান করে আনলে তো চলবে না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, খাদ্য-পানীয়, বেড়ানোর কথাও তো ভাবতে হবে। সবাই তো বিশাল বাংলোতে পানভোজন করতে চান না। অনেকেই চান কাছে পিঠে বেড়াতে। বিদেশি পর্যটকদের কথাও ভাবতে হবে। মোটকথা, পরিচ্ছন্ন, সুষ্ঠু, পরিষেবাও চাই এবং পরিকাঠামোর উন্নতিও।

ডামডিমে কিন্তু চা বাগিচা জমজমাট। মাঠে ফুটবল খেলছে আদিবাসি ছেলেরা। বাগিচার ফুটবল টিম রয়েছে। খেলোয়াড়েরা অন্য বাগানে খেলতে যায়। চলে এলাম গুদামঘরের কাছে। এখান থেকেই খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্পে পরিবার পিছু মাসে ৩৫ কেজি করে চাল, গম বিলি করা হয় রেশনের দিন। লোকালয়, দোকানপাট, আদিবাসিদের জমাটি ভিড়। হাটে শুয়োর কেটে বিক্রি হচ্ছে। এখানে ওখানে শিরীষ, কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে মদেশিয়া মেয়েগুলি হাঁড়িয়া বিক্রি করছে। ক্রেতা মরদ জওয়ানরা। সমাজসংস্কারক, চা-বাগানের ওয়েলফেয়ার অফিসার, শ্রমিক নেতারা মাঝে মাঝে নরম গরম বক্তৃতা দিয়ে হাঁড়িয়া এবং জুয়ার অপকারিতা বোঝান। কিন্তু সাধ্য কার মোড়গ লড়াই, বা হাঁড়িয়া পান বন্ধ করে ? শ্রমিকদের জীবনযাপন দেখে তো মনে হয় তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি, সুদখোর প্রতারকেরা আজও শ্রমিকদের সর্বনাশ করে চলেছে। সরু কাঁচা সড়ক পেরিয়ে চা বাগিচার আঁকাবাঁকা পথ, ছায়াগাছ। নির্জন দুপুরে পৌঁছে গেলাম ডামডিম বড় সাহেবের কুঠি। পাশেই গেস্ট হাউস। চৌকিদার ফটক খুলে দিলে আমরা ঢুকে পড়ি। দুপাশে নানা রঙের কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, গুলমোহর, জারুল, অশোক। রংয়ের যেন রায়ট লেগেছে। মোটামুটি সাজানো-গোছানোই, শুধু আরেকটু পরিষ্কার করলেই যথেষ্ট। অনুপমের কাছ থেকে জানলাম এই ছোট্ট সবুজ মাঠে আদিবাসিদের নাচ হবে, গান হবে, ধামসা মাদল বেজে উঠবে দ্রিমি দ্রিমি শব্দে, মুখর হয়ে উঠবে অচেনা ডামডিম।

মালবাজার সাব ডিভিশনের ডামডিম চা বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী দি অ্যামালগামেটেড প্ল্যান্টেশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। বাগানটি ডিবিআইটিএ সংগঠনের সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ২০০৮ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ৩ টি। এখন জয়েন্ট ফোরাম এবং শাসকদলের ট্রেড ইউনিয়ন উভয়েই ক্ষমতা দখলের লড়াইতে ব্যস্ত। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল এবং মোট চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৭৩৮.০২ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৫২৯ কেজি করে চা ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়। মোট কর্মরত শ্রমিক ২৪০৯ জন। ডামডিম চা বাগানে নিজস্ব কাঁচা চা পাতা উৎপাদনের গড় ৫০-৫২ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব উৎপাদিত চা ১০-১২ লাখ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চা এর পরিমান গড়ে ৩ লাখ কেজি। প্যাকেজড টি উৎপাদনের প্রয়াস আছে। ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত বিক্রয়যোগ্য মোট বাৎসরিক উৎপাদিত চা এর পরিমান গড়ে ১৫ লাখ কেজি। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাগানে ইনঅরগ্যানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। ডামডিম বাগানটি চরিত্রগতভাবে অত্যন্ত উন্নত প্রকৃতির।

ডামডিম চা বাগিচায় হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারি আছে। স্বীকৃত এমবিবিএস ডাক্তার আছেন, তিনি আবাসিক হিসাবে বাগিচায় তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা ২ জন। বাগিচায় নার্সের সহযোগী মিড ওয়াইভস ৩ জন। কম্পাউন্ডার অথবা স্বাস্থ্য সহযোগী ২ জন। মেল ওয়ার্ডের বেড সংখ্যা ১৩টি, ফিমেল ওয়ার্ডের বেড সংখ্যা ১৩ টি। আইসোলেশন ওয়ার্ড ৪ টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড ৪ টি। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার নেই। অ্যাম্বুলেন্স আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। চিকিৎসার জন্য গড়ে বছরে ১৫০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয়। ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয়। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরন করা হয় না। বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের নাম ডি শ্রেষ্ঠা। তিনি ২০০৮ সাল থেকে কর্মরত। বাগিচায় ক্যান্টিন আছে। ভ্রাম্যমান ক্রেশের সংখ্যা ৩ টি এবং স্থায়ী ৩ টি। ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যাবস্থা এবং শৌচালয় আছে। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের দেওয়া হয়। শিশুদের পোশাক সরবরাহ করা হয় নিয়মিত। পর্যাপ্ত পাণীয় জল ক্রেশে এবং চা বাগানে সরবরাহ করা হয়। তবে পাণীয় জল সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্য নয় বলে অভিযোগ আছে। ক্রেশে মোট অ্যাটেন্ডেন্ট ১১ জন। বাগিচায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় আছে। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা হিসাবে একটা বাস আছে। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে। এই টি

কমিউনিটি প্রজেক্টের কাজ চলছে ডামডিম-এ

গার্ডেনে প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে নিয়মিত অর্থ জমা পড়ে। মালিকপক্ষ বোনাসের সময় ন্যায্য টাকা দিতে গড়িমসি করে না। মোট বোনাস বাবদ প্রদেয় অর্থ প্রায় ১.৫০ কোটি টাকা। গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ গড়ে বছরে ১৫-১৬ লাখ টাকা। বছরে গড়ে ৫০ জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয় ডামডিম চা বাগানে।

সাইলি টি এস্টেট

পশ্চিম ডামডিমে যখন ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এবারের সফরের শেষ বাগান সাইলি টি এস্টেট। কেবল ডুয়ার্স নয়, গোটা উত্তরবঙ্গবাসী শীতে বনভোজনে উৎসাহিত হয়ে ওঠে প্রবল ভাবে। হাতে একটা ছুটির দিন পেলেই হল, দলবেঁধে দে ছুট। পাহাড়ে জঙ্গলে অথবা নদীর ধারের পরিচিত পিকনিক স্পটগুলিতে ভিড় লেগেই থাকে। পশ্চিম ডুয়ার্সও তার ব্যতিক্রম নয়। ঝালং, বিন্দু, রকি আইল্যান্ড, লালিগুরাসের পাশাপাশি গরুবাথান এর ডালিমখোলা বা পাপরখেতিও তৈরি থাকে প্রতিবছরই বনভোজনপ্রেমীদের স্বাগত জানাতে। শীতের পিকনিক মরসুমে চেনাজানা স্পটগুলোর পাশাপাশি বনভোজনের জন্য আকর্ষণীয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে পশ্চিম ডুয়ার্সের অপরিচিত কিছু জায়গা। চেল লাইন পিকনিক স্পট তার মধ্যে অন্যতম। রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত সাইলি চা বাগানের চেল লাইন শ্রমিক বস্তির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। তার ধারে বনভোজনপ্রেমীদের পাশাপাশি যদি ডুয়ার্স বেড়াতে আসা পর্যটকরা ভিড় জমান তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ চেল লাইনের অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্যের কথা যেভাবে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

বাজার থেকে ডামডিম হয়ে যে পথটা গরুবাথান এর দিকে চলে গেছে সেই পথে সাইলি হাট পৌঁছে বাঁ দিকে বাঁক নিলে জেলা পরিষদের রাস্তা। পিচঢালা সরু রাস্তাটি ডান হাতে সাইলি এবং বাঁয়ে রানিচেরা বাগানকে দাঁড় করিয়ে রেখে সোজা পৌঁছে গেছে চেল নদীর ধারে। ওই নদী তার উৎসমুখ থেকে নৃত্যরতা সুন্দরীর মতো একের পর এক পাহাড়ি পথ পরিক্রমা করে অবশেষে গরুবাথান পেরিয়ে সমতলে নেমেছে। যদিও গরুবাথান পেরিয়ে এসে চেল নদী এখানে বেশ চওড়া। তার গতি অনেক স্লথ। দীর্ঘ পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে নদী যেন কিছুটা ক্লান্ত। তাই চেল এখানে খরস্রোতা নয়। সেখানে শান্ত নদীর উত্তর-পশ্চিম দিকে চোখ মেললেই দেখা যায় ঠিক নদীর ধার থেকেই যেন মাথা তুলেছে গিরিরাজ হিমালয়। তারপর শৃঙ্গের পর শৃঙ্গের ঢেউ তুলে এগিয়ে গেছে। উত্তর আর পশ্চিমে অদূরেই ভুট্টাবাড়ির জঙ্গল। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লেই খাবারের সন্ধানে যেখান সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে হাতির দল। তারপর পাহাড় যেখানে নদীর কাছে নতজানু হয়েছে ঠিক সেই পথ ধরে সোনালী ধানের খোঁজে ছড়িয়ে যেতে পারে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম, এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে। আবার নদীর পূর্ব প্রান্তে রয়েছে প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন ওয়েস্টার্ণ ডুয়ার্স ক্লাব যাকে স্থানীয় লোকেরা বলে চেল ক্লাব। চা-বাগানের ব্রিটিশ ম্যানেজারদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল সুইমিংপুল। বাস্কেট বল, লন টেনিসের পাশাপাশি বিভিন্ন ইনডোর গেম এখানে খেলা হত। এছাড়া ক্লাবের ঠিক সামনেই রয়েছে সবুজ মখমলের মতো গলফ

ডামডিম রিসর্ট

গোটা উত্তরবঙ্গবাসী শীতে বনভোজনে উৎসাহিত হয়ে ওঠে প্রবল ভাবে। হাতে একটা ছুটির দিন পেলেই হল, দলবেঁধে দে ছুট। রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত সাইলি চা বাগানের চেল লাইন শ্রমিক বস্তির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। তার ধারে বনভোজনপ্রেমীদের পাশাপাশি যদি ডুয়ার্স বেড়াতে আসা পর্যটকরা ভিড় জমান তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

কোর্স। এখনও ছুটির দিনগুলোতে বিভিন্ন চা বাগানের ম্যানেজারেরা সাজসরঞ্জাম নিয়ে নেমে পড়েন গলফ খেলতে। এছাড়াও ক্লাবের ভিতরে কাঠের তৈরি ড্যান্স ফ্লোর এবং পুরনো আসবাবপত্র আজও এই ক্লাবের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। যদিও চা-শিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ক্লাবের সেই জৌলুস অনেকটাই অস্তমিত, তবুও চেল নদীর ধারে আদিগন্ত বিস্তৃত সবুজের মাঝে লাল রংয়ের ক্লাব চেল লাইনের অন্যতম আকর্ষণ।

মালবাজার সাব ডিভিশনের সাইলি টি গার্ডেনটির পরিচালক গোষ্ঠী সাইলি টিএস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। বাগানটি ডিবিআইটিএ সংগঠনের সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ২০১১ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৪ টি। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৫৯১.৪৪ হেক্টর। প্রতি হেক্টর ড্রেন এবং সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১০৭০ কেজি করে চা ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়। মোট কর্মরত শ্রমিক ১৬১৬ জন। সাইলি চা বাগানে নিজস্ব কাঁচা চা পাতা উৎপাদনের গড় ৩২-৩৫ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব উৎপাদিত চা ৭-৮ লাখ কেজি। বাইরের বাগান থেকে সংগৃহিত কাঁচা পাতা থেকে প্রস্তুত রেডিমেড চা ৫০০০০ কেজি। মোট বাৎসরিক উৎপাদিত চা ৭-৮ লাখ কেজি। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাগানে ইনঅরগ্যানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়।

সাইলি চা বাগিচায় হাসপাতালের সংখ্যা ১টি। ডিসপেনসারি ৩টি। ডাক্তার আছেন, তিনি আবাসিক হিসাবে বাগিচায় তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষিত নার্স নেই। বাগিচায় নার্সের সহযোগী মিডওয়াইভস ১ জন। কম্পাউন্ডার অথবা স্বাস্থ্য সহযোগী ১ জন। মেল ওয়ার্ডের বেড সংখ্যা ১৬ টি, ফিমেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ১২ টি। আইসোলেশন ওয়ার্ড ১ টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড ১টি। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার নেই। অ্যাম্বুলেন্স আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। চিকিৎসার জন্য গড়ে বছরে ৫০০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয় না। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয় না বললেই চলে।

সাইলি চা বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই ২০০৪ সাল থেকে। বাগিচায় ক্যান্টিন নেই। ভ্রাম্যমান ক্রেশের সংখ্যা ৩ টি। ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা আছে। শৌচালয় নেই। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের দেওয়া হয় না। শিশুদের পোশাক সরবরাহ করা হয় না নিয়মিত। পর্যাপ্ত পানীয় জল ক্রেশে এবং চা বাগানে সরবরাহ করা হয় না, সময়ে সময়ে তা ব্যবহারযোগ্যও নয়। ক্রেশে মোট অ্যাটেন্ডেন্ট ৩ জন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় নেই। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা হিসাবে একটা বাস আছে। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে। সাইলি টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে টাকা জমা পড়েছে। তবে বাগানে পি এফ সঠিক সময়ে জমা না পড়ার অভিযোগ আছে। বাগিচায় বাৎসরিক বোনাসের পরিমাণ ২০ শতাংশ হলেও বোনাসের টাকা অনেক সময়েই বকেয়া থাকে বলে অভিযোগ। বকেয়া পি এফ এর মোট অর্থও বেশ কয়েকলাখ টাকা। গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বছরে গড়ে চার লাখ টাকা হলেও অনেকসময়ে গ্র্যাচুয়িটিও বকেয়া থাকে। বছরে গড়ে ১৫০ জনের ওপর শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন, এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়।

সাইলি চা বাগানের কাজ সেরে হাতে পেয়ে গেলাম অনেকটা সময়। পরের দিন যাব রানিচেরা, রাঙ্গামাটি হয়ে গরুবাথান। ঠিক হল গরুবাথান বাংলোতে রাত্রিবাস করে ফাগু, সাকাম, সামবিয়ং ঘুরে আসব। এমন সীমাহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছেড়ে কি চট করে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে কারও ?

ভীষ্মলোচন শর্মা

প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ আজও আড়ালেই অবহেলিত?

জগ্গা জাসুস খুঁজে বের করলেন দুই বাস্তব সত্য!

বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার অনুরাগ বসুর ফিল্ম 'জগগা জাসুস' দেখতে বসেছিলাম। কয়েক মিনিট কেটে যাবার পরই চোখ কচলে নিয়ে ভাবলাম ঠিক দেখলাম কি? ছবি শুরু হচ্ছে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে? বলিউডি ছবিতে ময়নাগুড়ি? কিন্তু উত্তেজনার পারদ ওখানেই থেমে যায়! রোগীদের অবস্থা কিন্তু একদমই সিনেমার মতো নয়, যদিও সাম্প্রতিককালে এটি রাজ্যের অন্যতম পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রামীণ হাসপাতাল বিবেচিত হয়েছে। আসল বাস্তবচিত্র একেবারেই অন্যরকম। এই বিশাল অঞ্চলের এবং তার সংলগ্ন গ্রামগুলির প্রসব বেদনা থেকে শুরু করে পেটব্যথা যে কোনও রোগেই একমাত্র ভরসা ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল। বাকি সব গ্রামীণ হাসপাতালের মতোই ময়নাগুড়ি হাসপাতালটিও ডাক্তার ও নার্সের অভাবে ভুগছে। যাঁরা আছেন তাঁদের নাভিশ্বাস উঠছে আউটডোর এবং ওয়ার্ডের রোগী সামাল দিতে। রোগীর চাপ এতটাই থাকে যে বছরের বেশিরভাগ সময়ই এক বেডে দুজন আর বাকিদের স্থান হয় মেঝেতেই। আর পরিচ্ছন্নতার হাল নিয়ে কিছু না বলাটাই ভাল। ছাদ দিয়ে জল পড়া বা মেঝেতে জল জমে থাকবার মতো ঘটনাতো আছেই। তবে হ্যাঁ, আগে যেখানে সামান্য গড়বড়ে রোগী এলেই রেফার করে দেওয়া হত জেলা হাসপাতালে বা মেডিক্যাল কলেজে, এখন অবশ্য তা হয় কম।

কাহিনির প্রথমেই হাসপাতালের এই অনিচ্ছাকৃত দুর্দশা বর্ণনা দুটি বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে।

এক। ময়নাগুড়ির ভৌগলিক অবস্থানের গুরুত্ব — শিলিগুড়ি বা জেলা শহর জলপাইগুড়ি থেকে সমতলের তিস্তা পেরিয়ে ডুয়ারসভূমিতে প্রবেশ করলে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে যে আদি জনপদ তার নাম ময়নাগুড়ি, ডুয়ারসের এক বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষ কেবল চিকিৎসাতেই নয়, লেখাপড়া, ব্যবসা বাণিজ্য, ধর্ম, পরিবহণ সব কিছুর জন্যই ময়নাগুড়ির উপরে নিরভরশীল।

দুই। ময়নাগুড়ির জনসংখ্যা আপাতত লাগামহীন বল্গা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে এই আধা শহরের পরিধি সমস্ত দিকেই। মোট ষোলটি গ্রামপঞ্চায়েতের ময়নাগুড়ি ব্লকে মোট জনঘনত্বের পরিসংখ্যান যা দেখাচ্ছে তাতে চোখ কপালে উঠে যাওয়ার অবস্থা। ২০০১ সালে যেখানে জনঘনত্ব ছিলো ৪৫০ প্রতি বর্গ কিমিতে সেই জনঘনত্বই ২০১১ সালে পৌছেছে ২৪৬৩ প্রতি বর্গ কিমিতে। এক কথায় দশ বছরে ময়নাগুড়ির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় চার গুণ।

ইতিহাসের রোমাঞ্চ বনাম পর্যটকের নিরাশা

অষ্টাদশ শতকে যার নাম ছিল জামেরকোট আর যাকে ব্রিটিশরা ব্যবহার করত তাদের ভুটানের আঠারোটি 'ডোরস' বা দ্বারগুলোতে পৌছোনোর জংশন পয়েন্ট হিসেবে। এই 'ডোরস' থেকেই হয়ত ডুয়ার্স শব্দের সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতকে সেখানে বারবার ভুটানি আক্রমণ।

১৮৬৪-৬৫ সাল নাগাদ জল্লেশের সৈনিক ব্যারাকে হয় ভয়ানক কলেরার সংক্রমণ। মারা যেতে থাকে ব্রিটিশ সেনারা। সরকার আদেশ জারি করে জর্দা নদীতে জনসাধারণ বা গবাদি পশুর স্নান নিষিদ্ধ। জনমানসে তীব্র ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হয় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। নদীতে স্নান সেরেই তখনও যে পুজো দেওয়ার রীতি ছিল জল্লেশ মন্দিরে।

কখনও ইংরেজদের সঙ্গে তাদের সখ্যতা আবার কখনও শত্রুতা। হরগোবিন্দ কাঠাম তখন ময়নাগুড়ি বা জামেরকোটের শাসক। জামেরকোটের একদিকে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত পরিবার আর অন্যদিকে অসীম শক্তিশালী কোচবিহার রাজপরিবার। বৈকুণ্ঠপুরের আসনে তখন রাজা দর্পদেব রায়কত। ময়নাগুড়ির আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম যেমন ভোটপাট্টি-দোমোহনি-জল্লেশ এই সব জায়গাতেই তখন ছিল ভুটানি দুর্গ। ১৮৬৪-৬৫ সাল নাগাদ সেখানে হয় ব্রিটিশ আক্রমণ। ব্রিটিশ সেনারা ছাউনি ফেলে জর্দা নদীর তীরে। যুদ্ধে গুড়িয়ে যায় ভুটানি দুর্গগুলি। দুর্গ ফেলে পালায় ভুটানি সেনারা। আবার সেই সময়ই জল্লেশের সৈনিক ব্যারাকে হয় ভয়ানক কলেরার সংক্রমণ। মারা যেতে থাকে ব্রিটিশ সেনারা। সরকার আদেশ জারি করে জর্দা নদীতে জনসাধারণ বা গবাদি পশুর স্নান নিষিদ্ধ। জনমানসে তীব্র ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হয় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। নদীতে স্নান সেরেই তখনও যে পুজো দেওয়ার রীতি ছিল জল্লেশ মন্দিরে।

কয়েকবছর আগের কথা। গ্রীষ্মকালের এক ভোর। সারারাত ভ্যাপসা গরমের পর জেলাশহর জলপাইগুড়ি সবে চোখ মেলছে। সকালের পথচারীরা পায়ে পায়ে পথে নামছেন। চায়ের দোকানগুলিতে ঝাঁট পড়ছে বা জল চেপেছে স্টোভে। খানিক আগেই ভোরের তিস্তাতোর্সা এক্সপ্রেস তার ভোঁ বাজিয়ে শহরের ঘুমে এক ধাক্কা দিয়ে গেছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে

বটেশ্বর মন্দির

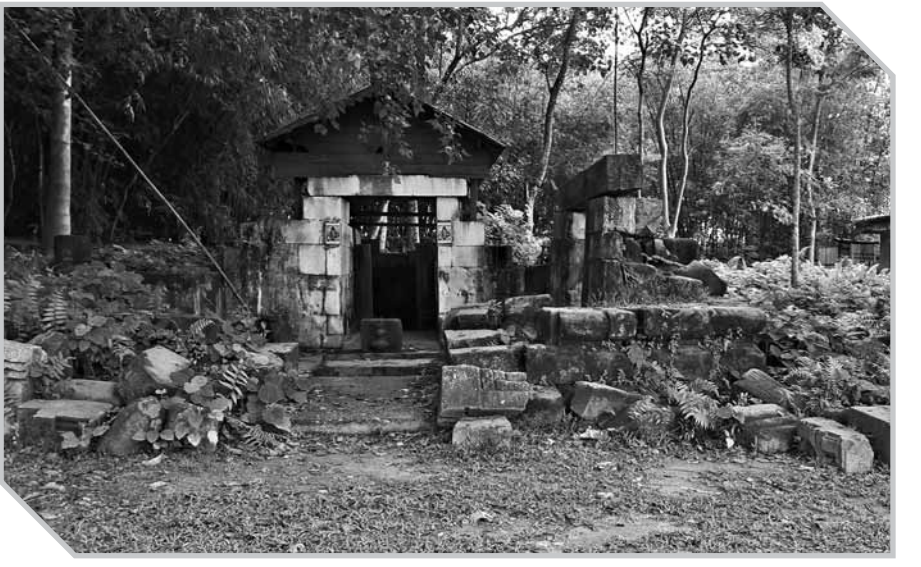

আপাতত গরমের ছুটি। তাই একের পর এক গাড়ি পর্যটক বোঝাই হয়ে মাথায় লাগেজ চাপিয়ে দৌড়চ্ছে ডুয়ার্সের পথে। কেউ লাটাগুড়ি-গরুমারা, কেউ আবার জলদাপাড়া। দুটো বড় গাড়ি রাস্তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। এক ভদ্রলোক নামলেন। উৎসুক হেয় খোঁজ নিয়ে জানা গেল কলকাতার কোনও ইন্সটিটিউট থেকে জনা তিরিশেক ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘুরতে এসেছেন। বুকিং নেই। ড্রাইভার নাকি বলছেন লাটাগুড়িতে থাকার জায়গা পাবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ওনারা ডুয়ার্সে ঘুরতে চান। দেখলাম শুধু জঙ্গলই নয়, ইতিহাস-ভূগোলটাকেও জানতে চান। কথাবার্তায় বোঝা গেল পড়াশোনা করে এসেছেন। শুধু গতে বাধা গরুমারা বা জলদাপাড়া নয়, জল্পেশ-জটিলেশ্বর-দেবী চৌধুরাণি-শিকারপুর-বোদাগঞ্জ-বনদুর্গা সব কিছুর নাম বলছেন। আবার একই সাথে যেতে ইচ্ছুক চ্যাংড়াবান্ধা-তিনবিঘা করিডোর এইসব জায়গাতেও। বললাম ময়নাগুড়ি চলে যান, ওখান থেকে সব সমান দূরত্বের মধ্যেই পড়বে। সব শুনে আপ্লুত ভদ্রলোক বললেন, সেখানকার ভদ্রস্থ একটা হোটেলের নাম বলে দিন। ডর্মিটরিও চলতে পারে। কিন্তু অনেক চিন্তা করেও বলতে পারলাম না। ময়নাগুড়িতে ভাল পরিবেশে কোনও হোটেল বা রেস্টহাউস তখনও ছিল না, এখনও নেই। ভদ্রলোক নিরাশ হয়ে আবার গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি ধুলো উড়িয়ে চলে গেল লাটাগুড়ির দিকে। বাকিটা জানা কিংবা অজানাই রয়ে গেল।

সচ্ছল এক পুরনো জনপদ

ময়নাগুড়ির মানুষই বলে, কোনওকালেই অভাবী ছিল না এই প্রাচীন জনপদ। আশপাশে ছড়িয়ে আছে প্রায় আশিটি সম্পন্ন বড় গ্রাম। এই সব গ্রামই কৃষিতে অত্যন্ত উর্বর। ধান-পাট-তামাক-আলু ছাড়াও টমেটো-করলা-বাঁধাকপি-ফুলকপি-পটল-কচু এবং আরো অনেক ফসল উৎপাদনে এখানকার কৃষকরা অনেকটাই এগিয়ে আছেন। প্রচুর কৃষিজ পণ্য এখান থেকে ট্রাকে করে পাড়ি দিচ্ছে রাজ্যের বা দেশের বিভিন্ন জায়গায়। ময়নাগুড়ি রোড বা আরও অনেক জায়গাতেই বহির্বঙ্গের সমস্ত ট্রাকগুলি যে পণ্য বোঝাই হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে খোঁজখবর করলেই এই তথ্য মিলবে। এছাড়াও আছে চা বাগান। ময়নাগুড়ির চারপাশের গ্রামগুলির এক বিশাল পরিমাণ আবাদি জমি গত দশ বা পনেরো বছরে পরিবর্তিত হয়েছে চা বাগানে। সেখানে পাতা তুললে মজুরি মেলে ভালই।

এছাড়াও আছে ময়নাগুড়ির আশেপাশে বা গোটা ময়নাগুড়ি ব্লক জুড়ে গড়ে ওঠা ছোট চা ফ্যাক্টরি যেগুলিকে ডাকা হয় বটলিফ ফ্যাক্টরি নামে। এই সমস্ত চা ফ্যাক্টরিগুলির নিজস্ব কোনও বাগান নেই, বিভিন্ন ছোট চা বাগান থেকে পাতা কিনে এরা চা তৈরি করে। এই সমস্ত ফ্যাক্টরিতেও কাজ করছে গ্রামের প্রচুর মানুষ। সঙ্গে রয়েছে একশ দিনের কাজ। তাই আজ গ্রামের দারিদ্র নেই। আর এই জনগোষ্ঠির অধিকাংশই নির্ভর করে চলে ময়নাগুড়ি বাজারের ওপর। জামাকাপড় চাল মসলা বই খাতা কলম ইত্যাদি সকলই তারা কিনে থাকে ময়নাগুড়ি বাজার থেকেই।

যেথায় কেউ কথা কয় না কিছুই সেথা হয় না!

গত দশ বছরে জমির দাম ময়নাগুড়ি সদর এলাকায়

ময়নাগুড়ি শহরের রাস্তা

শিলিগুড়ি থেকে সারাদিন ডজন কয়েক বাস সার্ভিস রয়েছে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা এবং আসাম তথা উত্তরপূর্বের বিভিন্ন জায়গায়, তাদের বেশির ভাগই চলে বাইপাস দিয়ে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা রোদ-ঝড়-জলের মধ্যে বা রাত বিরেতে বাইপাসে গিয়ে বাস ধরার জন্য হয়রান হতে হয় মানুষকে, কিন্তু কোথাও কোনও প্রতিবাদের আঙ্গুল উঠতে দেখা যায় না।

প্রায় দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়েছে। গত কুড়ি বছরে আর্থিক সম্পন্নতার নিরিখে অনেকটাই উঠে এসেছে ময়নাগুড়ি। শিক্ষার প্রসার, গ্রামের অনেক ছেলেমেয়েই বর্তমানে চাকুরিরত। গ্রামের বাড়ির দূরত্ব-যোগাযোগ কম হওয়ায় তারা ময়নাগুড়ির শহর এলাকায় জমি কিনে বাড়ি করছেন। কিন্তু তাঁদের কাছে প্রশ্ন হল, বাড়ি ময়নাগুড়িতে করছেন ঠিকই কিন্তু নাগরিক পরিষেবা কতটা পাচ্ছেন? অলিগলি বা তার নিকাশি ব্যবস্থা কতটা উন্নত এখানে? ট্যাপকলের জল মেলে কি প্রতি পাড়ায়? কয়েক বছর আগে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে ময়নাগুড়ি মিউনিসিপালিটি ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু তার কাজ এই কয়েকবছরে কতদূর এগিয়েছে সে খবর ময়নাগুড়িরই কি কেউ সঠিক জানেন? জানলে বলতে পারবেন সমক্ষে? এবছরেও এখানে রমরমিয়ে পঞ্চায়েত ভোট হয়েছে। মিউনিসিপালিটির আইন ও কর্মপ্রক্রিয়া জারি না হলে আর কয়েক বছর পর নাগরিকদের দুর্দশা বাড়ার

এনবিএসটিসি বাস ডিপো, ময়নাগুড়ি

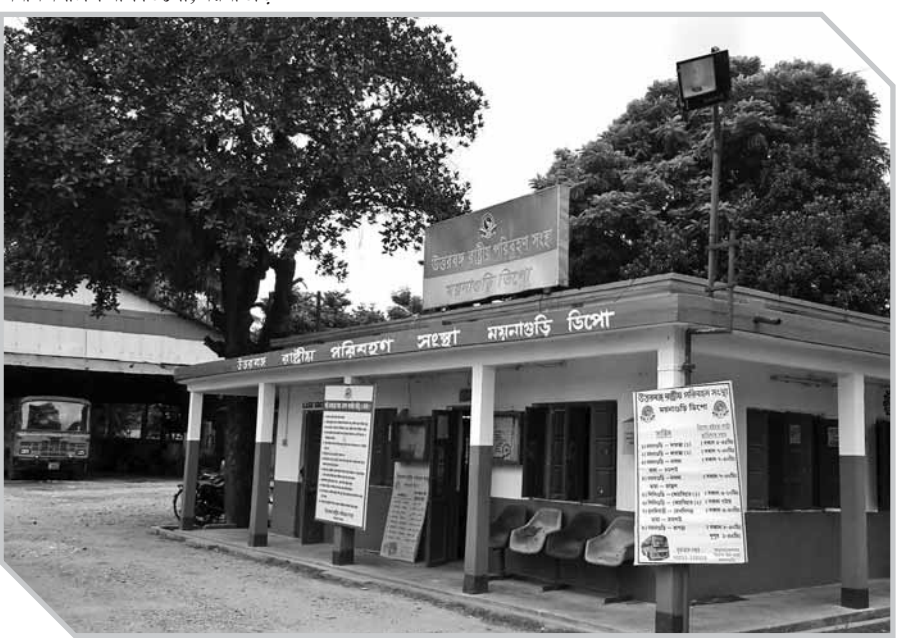

গ্রামীণ হাসপাতাল, ময়নাগুড়ি

সম্ভাবনা প্রবল সে আর বলে দিতে হয় না।

আবার ময়নাগুড়ি বা তার চারপাশের এই সব গ্রামগুলিতে আজ আর মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের অভাব নেই। গ্রামীণ সড়ক যোজনার দৌলতে আজ প্রায় বেশির ভাগ গ্রামের রাস্তাই ভাল। সেই সব রাস্তায় আজকাল তিন বা চার চাকার গাড়ি বেশ দৌড়চ্ছে। ছাত্রছাত্রীদেরও সবুজসাথি প্রকল্পের সৌজন্যে সাইকেলের অভাব নেই। গ্রামের প্রায় প্রতি বাড়িতেই একটি মোটরসাইকেল বিরাজমান। কিন্তু সমস্যা আছে অন্য জায়গায়। মাধ্যমিক পাস করবার পর যদিও বা কোন স্কুলে ঠেসেঠুসে একাদশ শ্রেণিতে জায়গা হয়ে যাচ্ছে, কলেজে ভর্তির সময়ই হচ্ছে যত সমস্যা। কারণ ময়নাগুড়িতে কলেজ কেবলমাত্র একটিই। কাছাকাছি কলেজ বলতে জলপাইগুড়ি-ধুপগুড়ি-মেখলিগঞ্জ-হলদিবাড়ি-মালবাজার-বীরপাড়া ইত্যাদি। দৈনিক যাতায়াতের খরচ বা মেসবাড়িতে থাকার খরচ বহন করা সবার সঙ্গতিতে নেই। স্থানীয় মানুষের মতে ময়নাগুড়িতে এই মুহূর্তে একটি মহিলা কলেজের দরকার। মেয়েরা সেখানে পড়লে বর্তমান কলেজটিতে সংকুলান হতে অনেক ছাত্রের।

স্বাস্থ্য বা শিক্ষা পরিষেবা কিংবা পরিকাঠামো উন্নত করার দাবিতে ময়নাগুড়ির নাগরিকদের মধ্যেও তেমন কোনও সংঘটিত আন্দোলন কোনওদিনই দানা বাঁধতে দেখা যায় নি। এই কারণেই এত পুরনো জনপদ হওয়ার সত্ত্বেও ময়নাগুড়ির স্টেশন নিউ ময়নাগুড়ি রেল বা সড়ক মানচিত্রে কোনও জায়গাই করে নিতে পারল না। সেই আদ্যিকাল থেকেই এখনও পর্যন্ত ময়নাগুড়িতে তিস্তাতোর্সা এক্সপ্রেস ও কামরূপ ছাড়া কলকাতা যাওয়ার আর কোন ট্রেনই দাঁড়ায় না। অথচ লাটাগুড়ির সবচেয়ে কাছে স্টেশন হল ময়নাগুড়িই। তাই পর্যটনের ক্ষেত্রে যা হতে পারতো এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, পর্যটকেরা সেখানে ট্রেন থেকে নামতেই পারেন না। তাদের নামতে হয় নিউ জলপাইগুড়ি। কেবল পর্যটকই নয় অসুস্থ রোগী বা বাইরে পড়তে যাওয়া ছেলেমেয়েদের জন্য আরও দু'-একটি ট্রেন থামানোর জন্য কোনও সংঘটিত দাবি নেই, জনপ্রতিনিধিরা নিশ্চুপ।

বাস যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা।

আজ অবধি ময়নাগুড়িতে থাকার কোনও ভালো হোটেলও গড়ে উঠল না। অন্তত পড়ে থাকা জমিকে কাজে লাগিয়ে 'পথসাথী'-র মতো একখানা সরাইখানা গড়ে তোলা যেত না কি? 'এক্সপিরিয়েন্স বেঙ্গল' নামে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের যে পুস্তিকা বিতরণ করা হয়ে থাকে আশ্চর্যজনক ভাবে তাতে সেখানে ডুয়ার্সের পাতায় জল্পেশ বা জটিলেশ্বর মন্দির কোনটিরই ছবি নেই।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের ডিপোটি যথেষ্ট পুরনো। অথচ গুটিকয়েক দূরপাল্লার রুটে চলাচলকারী বাস ছাড়া আর কোন বাসই ঢোকে না এই ডিপোতে। শিলিগুড়ি থেকে সারাদিন ডজন কয়েক বাস সার্ভিস রয়েছে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা এবং আসাম তথা উত্তরপূর্বের বিভিন্ন জায়গায়, তাদের বেশির ভাগই চলে বাইপাস দিয়ে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা রোদ-ঝড়-জলের মধ্যে বা রাত বিরেতে বাইপাসে গিয়ে বাস ধরার জন্য হয়রান হতে হয় মানুষকে, কিন্তু কোথাও কোনও প্রতিবাদের আঙ্গুল উঠতে দেখা যায় না। যে কটি বাস ভেতরে ঢোকে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নাগুড়ি বাজারের ওপর, ফলে চির পরিচিত যানজটের দৃশ্য আর বদলায় না। স্থানীয় মানুষের আক্ষেপ, ধুপগুড়ির নতুন বাস স্ট্যান্ডে ঢুকছে সব বাস, তাদের পুর প্রশাসন বাধ্য করেছে বলেই যাত্রীদের পরিষেবা মিলছে, অথচ ময়নাগুড়িতে এত বড় বাস টার্মিনাস ধুপগুড়ির অনেক আগে তৈরি হলেও সেখানে বাস ঢোকেই না প্রায়। তেমনই ময়নাগুড়ির মানুষ সরব হয় না বলেই যথেষ্ট ভালো রাস্তাঘাট হওয়ার পরেও সাপ্টিবাড়ি-জল্পেশ-রামশাই-কালামাটি-বার্ণিশ-দোমোহনির মত প্রত্যন্ত এলাকায় দিনে একটি দুটি বেসরকারি বাস বা ম্যাজিক গাড়ি ছাড়া আর কিছুই চলে না।

হারিয়ে গেছে সাবেক সংস্কৃতির ময়নাগুড়ি?

কত পুরাতন জনপদ এই ময়নাগুড়ি! সুপারি গাছের বাগান-কাঠের দোতলা বাড়ি-বড় বড় গাছ-ছায়াময় রাস্তা-গলিপথ সব মিলে একসময়ের অভিজাত জনপদ ময়নাগুড়ির আজ বড়ই দুর্দশা। সব জায়গার মতই এখানেও সান্ধ্য পানীয় আর লটারির সংস্কৃতির দাপটে বিলুপ্তি ঘটেছে বাংলার মূলধারার সংস্কৃতির, এমনকি রাজবংশী সনাতনি সংস্কৃতিও আজ বিপন্ন। পুরনো দিনের মানুষগুলির সঙ্গে কথা বলতে গেলেই নস্টালজিয়া গ্রাস করে তাদের বিষণ্ণ মনকে। অনেকেরই কষ্ট হয় ভাবতে যে আজ থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর আগের ময়নাগুড়িতে কালিকানাট্যম নামে নাটকের দলটি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে পথনাটক করত, রবিতীর্থ ভবনে তারা নিয়মিত রিহার্সাল করত, চলত আবৃত্তি শ্রুতিনাটক ক্যুইজ ইত্যাদিরও অনুষ্ঠান। রবিতীর্থ ভবনটি নতুন করে হয়েছে, অথচ পথনাটিকা চোখে পড়ে না। কেবলমাত্র ময়নাগুড়ি এথলেটিক ক্লাবেই

রাধিকা লাইব্রেরি

জরদা নদী

বছরে একবার যা নাটকের অনুষ্ঠান হয়। কালিকানাট্যমের একঝাঁক টগবগে তরুণের উচ্ছ্বাস আজ অতীত। পরবর্তী প্রজন্ম এসব থেকে অনেক দূরে।

যারা এক সময় জীবিকার তাগিদে ছেড়ে চলে গেছেন ময়নাগুড়ি তাদের সঙ্গে কথোপকথনে উঠে আসে সুখের অতীত— সে সময় ময়নাগুড়ির রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন সতী সেনগুপ্তের মত মানুষেরা যারা কোনও বাড়িতে গান আবৃত্তি চর্চার সন্ধান পেলেই নিজে থেকেই চলে যেতেন, কেউ লেখালেখি করছে কিনা খবর রাখতেন। তপন লাহিড়ী ছিলেন আবৃত্তিতে দিকপাল। তাঁর গমগমে গলার আবৃত্তি বাজতো পুজোর সময় মন্ডপে মন্ডপে। জানতে ইচ্ছে করে কোনও লিটল ম্যাগাজিন হয় কি এখন ময়নাগুড়ি থেকে? সারা ময়নাগুড়ি জুড়ে খেলাধুলার কি চর্চাই না ছিল একসময়। পাড়ায় পাড়ায় একমাসব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্টে গোটা জনমানসে সাড়া পড়ে যেতো। যদিও টুর্নামেন্টটি এখনও হয়, আগের মত কি জনমানসে সাড়া পড়ে? ফুটবল খেলার মাঠে প্রতিদিন বিকেলে উপস্থিত থাকতেন মনকা দে-র মত ডুয়ার্সের কিংবদন্তী ফুটবলার। ছোটবড় বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা তখন ফুটবল খেলার মাঠে নিয়ম করে বিকেলে জড়ো হয়ে যেত, হাটের দু'দিন বাদে প্রতিদিন প্র্যাকটিস। ১৫ই আগস্ট অনেক জায়গাতেই হত সারাদিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট। ময়নাগুড়ি বলতে তখন রাধিকা লাইব্রেরী-ময়নামাতা কালিবাড়ি-দশমীতে ফুটবল খেলার মাঠে মেলা-বকুলতলা-ভারতী সিনেমা হল-দুর্গাবাড়ি মোড়ে প্রণয়দার চায়ের দোকান, এসবই বোঝাত। পাড়ায় পাড়ায় রাতব্যাপী জলসা বসত। সেটাকে লোকে বলতো অর্কেস্ট্রা বা ফাংশান। পাড়ার মাসিমা কাকিমা জেঠিমারা তাদের মেয়ে বৌদের নিয়ে দেখতে আসতেন। পাড়ার ছেলেরাই তাদের ঠিকমতো বসিয়ে রাত হলে আবার বাড়ি পৌছে দিত। বেপাড়ার ছেলেরা বেচাল করলে তাদের কপালে জুটতো উত্তম মধ্যম।

কেন জর্দা কি করলার মত সেজে উঠতে পারে না?

সকল সভ্যতাই যে নদীমাতৃক তা ইতিহাস স্বীকৃত। তাই

আজ থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর আগের ময়নাগুড়িতে কালিকানাট্যম নামে নাটকের দলটি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে পথনাটক করত, রবিতীর্থ ভবনে তারা নিয়মিত রিহার্সাল করত, চলত আবৃত্তি শ্রুতিনাটক ক্যুইজ ইত্যাদিরও অনুষ্ঠান। কালিকানাট্যমের একঝাঁক টগবগে তরুণের উচ্ছ্বাস আজ অতীত। ময়নাগুড়ি বলতে তখন রাধিকা লাইব্রেরী-ময়নামাতা কালিবাড়ি-দশমীতে ফুটবল খেলার মাঠে মেলা-বকুলতলা-ভারতী সিনেমা হল-দুর্গাবাড়ি মোড়ে প্রণয়দার চায়ের দোকান, এসবই বোঝাত।

সভ্যতার প্রথম থেকেই সব জায়গাতেই শহর বা মফস্বল গড়ে ওঠে কোনও না কোনও নদীকে কেন্দ্র করে। ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই এর প্রমাণ মেলে। তেমনই ময়নাগুড়িরও গড়ে ওঠা ধরলা আর জর্দা নদীর তীরে তীরে। এই জর্দা নদী দিয়েই এককালে বাণিজ্য করে গেছেন বিভিন্ন মোগল বা ইংরেজ সওদাগরেরা তাদের বাণিজ্যতরী নিয়ে। তিব্বতের দিকে ভুটানিরা যাতায়াত করতেন এই পথেই। জর্দা নদীতে জল সারা বছর জল মরা খালের মতো বয়ে চললেও ডুয়ার্সের বাকি সকল নদীর মতোই বর্ষাকালে তা ফুলেফেঁপে ওঠে। বছরভর এই নদীর জল নিয়েই কৃষিকাজ চালান ময়নাগুড়ি এবং পার্শবর্তী গ্রামের কৃষকরা। সেই ইতিহাসের সূত্র ধরেই কেউ কেউ বলেন, যেভাবে দূষণ রোধ করতেই জলপাইগুড়িতে করলার সৌন্দর্যায়নের চেষ্টা চলছে, সেরকমই প্রচেষ্টা কি ময়নাগুড়িতে জর্দা নদীকে নিয়ে হতে পারত না?

পর্যটন ব্যবসায় কি মুনাফা কম? তাই কি এত অনীহা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের?

পর্যটনের ক্ষেত্রে ময়নাগুড়ি এমন একটি জায়গা যেখান থেকে গরুমারা-চাপড়ামারি বা জল্পেশ-জটিলেশ্বর মন্দির সবই প্রায় সমান দূরত্বে। ময়নাগুড়ি থেকেই জঙ্গল-মন্দির-সীমান্ত মিলিয়ে স্বল্প খরচের প্যাকেজ ট্যুর চালু হতে পারত। কিন্তু তা নিয়ে কোনও উদ্যোগকে স্বাগত জানায় নি স্থানীয় প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিরা। আজ অবধি ময়নাগুড়িতে থাকার কোনও ভালো হোটেলও গড়ে উঠল না। বেসরকারি স্তরে কোনও উদ্যোগ নেই, সরকারি স্তরেও নেই। অন্তত পড়ে থাকা জমিকে কাজে লাগিয়ে 'পথসাথী'-র মতো একখানা সরাইখানা গড়ে তোলা যেত না কি? ইয়ুথ হোস্টেল বা পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে গড়ে উঠতে পারত না পর্যটকদের থাকা খাবার সহজ মূল্যের জায়গা? এ প্রশ্ন ময়নাগুড়ির ভেতরের ও বাইরের মানুষের বহুকালের। তাঁদেরই কথায়, ময়নাগুড়ির 'পেটকাটি' বা 'বটেশ্বর' এইসব মন্দিরের কোথাও উল্লেখ হয় না, 'এক্সপিরিয়েন্স বেঙ্গল' নামে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের যে পুস্তিকা বিতরণ করা হয়ে থাকে আশ্চর্যজনক ভাবে তাতে সেখানে ডুয়ার্সের পাতায় জল্পেশ বা জটিলেশ্বর মন্দির কোনটিরই ছবি নেই।

যাবতীয় নিরাশা ব্যক্ত করে ময়নাগুড়ির বাসিন্দা পূর্ত দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার অশোক দত্ত বললেন, বাম আমলে ময়নাগুড়ির উন্নতি না হবার কারণ এখানকার রাজনৈতিক দলাদলি। সড়ক যোগাযোগ এই সরকারের আমলে যদিও উন্নত হয়েছে, কিন্তু ময়নাগুড়ির বাজার-হাট বা সংকীর্ণ রাস্তার কারণের জন্য তিনি এখানকার উন্নয়নে রাজনৈতিক নিস্পৃহতা এবং নাগরিকদের এগিয়ে না আসার মনোভাবকেই দায়ী করেন। শিক্ষক অভিজিত ঘটকও আলাপচারিতায় ময়নাগুড়ির সাংস্কৃতিক অবনমনের বিষয়ে খেদ ও হতাশা ব্যক্ত করলেন। জল্পেশের দেশ ময়নাগুড়ির কথা বলবার কেউ নেই আজও, যে অবহেলার অন্ধকারে ছিল এখনও প্রায় তাই রয়ে গেল।

সত্যম ভট্টাচার্য

কৃষিতে আগাগোড়া সমৃদ্ধ ময়নাগুড়ি আজ কি খানিক দিশাহীন ?

বছরে ধান উৎপাদন ১৪০ কোটি টাকার, শাক সব্জির বাজার ১০০ কোটি, ছোট চা চাষিদের উৎপাদন ৭০ কোটি টাকার। সব মিলিয়ে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি বাণিজ্য করে ময়নাগুড়ি ব্লক, যার পুরোটাই মাটিতে ফলে। গোটা রাজ্যের নিরিখে এই পারফরম্যান্সের অবস্থান ঠিক কোন খানে সেই পরিসংখ্যান হাতের কাছে নেই এই মুহূর্তে, তবে কৃষি অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ ময়নাগুড়ি যে বর্ধমান বা মেদিনীপুরের সমতুল কদর পায় না সে অভিযোগ তুলতে কারও কোনও পরিসংখ্যান প্রয়োজন হয় না। কৃষিতে সমৃদ্ধি ময়নাগুড়ির আগাগোড়াই, কিন্তু প্রাচীন কৃষ্টির মতই কৃষিও অনাদৃত সম্পদ, সরকারি নীতি বা প্রশাসনিক সদিচ্ছা থাকলেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত বা পথপ্রদর্শক নেই। ময়নাগুড়ির সুখদুঃখ নিয়ে যে হাতে গোনা মানুষগুলির নাগাল মেলে তাঁদের অভিমত সে রকমই।

একযুগ আগেও জলপাইগুড়ি, ধুপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, হলদিবাড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে কোথাও কোথাও একফসলি আবাদ হত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে চিত্র বদলে গেছে। কয়েকবছরে বদলে গেছে ধুপগুড়ি এবং ময়নাগুড়ি অঞ্চলের চাষাবাদের চিত্র। পরিবর্তন এসেছে জীবনযাত্রার মানেও। এখন জমিগুলোতে ধানের আবাদ ছাড়াও চা, তেজপাতা, তরমুজ, আখ, বাদাম, লঙ্কা, টমেটো, বেগুন, শিম, কড়লা, বরবটি সহ নানা প্রকারের শস্য চাষ করা হচ্ছে। বিকশিত হচ্ছে পোল্ট্রি শিল্প। উত্তরবঙ্গের শাকসবজি অন্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। স্থানীয় মানুষেরা পতিত জমিকে ডাংগি বলেন। এসব জমিতে কোনও চাষাবাদ করা সম্ভব নয় এরকম একটা ভুল ধারণা প্রচলন ছিল। ফলে গরু ছাগল চরানো ছাড়া কোন কাজেই আসত না এসব জমি এখন অধিকাংশ ডাঙ্গি জমি সবুজ চা বাগানে ভরে গেছে। প্রযুক্তির ব্যবহার আর সচেতনতার কারণে অনেক জমিতেই উৎপাদন করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফসল।

তবে সময়ে সময়ে পাইকার না মেলার ফলে পথে সবজি ফেলে দেয় চাষিরা। কারণ উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম না পাবার ফলে চাষীরা সেই ফসল বাড়িতেও নিয়ে যেতে চান না। আবার পাইকারদের হাতেও তুলে দিতে পারেন না অনেক সময়। নিয়ন্ত্রিত বাজার না খোলার ফলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় চাষিদের। কিছুদিন আগেই ধুপগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার এর অধীনে থাকা ময়নাগুড়ি উপনিয়ন্ত্রিত বাজারে ভিন রাজ্যের পাইকারদের দেখা না পাওয়ার ফলে ক্ষুব্ধ হতাশ চাষিরা ক্ষেতের সবজি কখনও রাস্তার মধ্যে ফেলে রেখে প্রতিবাদ জানায়। জানা যায়, দিল্লি এবং বিহারের পাইকারেরা এলেও তারা উপ নিয়ন্ত্রিত বাজারে না গিয়ে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া ময়নাগুড়ি রোড এলাকার হাট থেকে সবজি কেনা শুরু করে। চাষিরাও সেখানে ভিড় জমাতে বাধ্য হচ্ছে। হাটে জায়গা না থাকার ফলে রিক্সা ও ভ্যান বোঝাই সবজি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছে অনেকে। ফলে রাস্তায় যান চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সময়ে সময়ে। মঙ্গল এবং শুক্রবার উপনিয়ন্ত্রিত বাজার চত্বরে পাইকারি বাজার বসার কথা। কিন্তু হাট বন্ধ হওয়ার ফলে মাঝেমধ্যেই রোড এলাকার হাটে ভিড় জমছে। জাতীয় সড়ক সবজি বোঝাই রিক্সাভ্যানের দখলে চলে যাচ্ছে। উপনিয়ন্ত্রিত বাজার কেন বসছে না এই অভিযোগের উত্তরে অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসন। তাঁদের মতে সবজির পাইকারি বাজার উপনিয়ন্ত্রিত বাজার চত্বরেই বসবে কারণ সেখানে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রয়েছে। কোনও সমস্যা থাকলে সেটা প্রশাসনের সঙ্গে বসে মিটিয়ে নেওয়া যেতেই পারে। যদিও উপনিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সচিব সুব্রত দে জানিয়েছেন পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে, অবিলম্বে সমস্যা মিটে যাবে এবং বর্তমানে সমস্যার সমাধান হয়েছে।

শিবভূমি ডুয়ার্স

ময়নাগুড়ি

কেমন আছে?

চা চাষের বিস্তার কি কৃষিজীবীদের ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর ?

কৃষি অর্থনীতিতে ময়নাগুড়ি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ব্লক। কিন্তু অনেকেরই বক্তব্য নির্বিচারে কৃষিজমিতে চা বাগান বিস্তারের ফলে সংকটে পড়ছে ময়নাগুড়ির কৃষি অর্থনীতি। চা বাগান বাড়ছে, কৃষিজমি দখল করে নিচ্ছে চা বাগান। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ময়নাগুড়ি ব্লকের ৬৪ হাজার ৩৮৪ হেক্টর এলাকার মধ্যে প্রায় ৩৬ হাজার হেক্টর এলাকায় ছিল শস্য এবং সবজি চাষের মাঠ। তার মধ্যে ৫৩০০ হেক্টর জমির আয়তন কমে দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার হেক্টর। জমির খুব সামান্যই টিকে আছে। ২০০৫ সাল থেকে চা-বাগানের দখলে চলে গেছে প্রায় ছয় হাজার হেক্টর চাষের জমি। সেখানে দেড় হাজার হেক্টর জমিতে ছোট চা বাগান গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন কৃষি জমিতে চা বাগান তৈরির কাজ চলছে। কৃষি আধিকারিকদের আশঙ্কা চাষিদের দ্রুত বিকল্প লাভজনক চাষের দিকে টেনে আনা সম্ভব না হলে ব্লকের ২৪ হাজার ৭৫২ হেক্টর মাঝারি উঁচু ফসলের মাঠকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না এবং সবজি এবং শস্য উৎপাদন উদ্বেগজনকভাবে মার খাবে। তাই চায়ের আগ্রাসন থেকে কৃষিজমি রক্ষা করতে বিকল্প চাষের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলার কৃষি দপ্তর এবং ময়নাগুড়ি ব্লক কৃষি সহায়কেরা। ময়নাগুড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিক সঞ্জীব দাস বলেন, যারা অভিযোগ করছেন উৎপাদিত সবজির দাম মিলছে না, তারা চাষের জমিতে চা বাগান করছেন বলেই এইরকম বিকৃত তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সবজি এবং ধান চাষের জমিতে চা বাগান তৈরির প্রবণতা ঠেকাতে বরাবরই প্রচার চালিয়ে গেছে কৃষি দপ্তর।

জলপাইগুড়ি মহকুমার উদ্যান পালন দফতরের কর্তারাও গ্রামে গ্রামে ঘুরে সভা করে চাষিদেরকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু খুব একটা যে লাভ হয়নি তা পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট। সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে জলপাইগুড়ি মহকুমায় ৩০ শতাংশের বেশি সবজি চাষের এলাকা চা বাগানের দখলে চলে গেছে এক দশক আগে। মহকুমায় প্রায় ২৭ হাজার হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হত। সেটা এখন কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬ হাজার হেক্টর। বেশি সবজি চাষের এলাকা নষ্ট হয়েছে ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর এবং রাজগঞ্জ ব্লকে। জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির পরিসংখ্যান বলছে ২০০১ সালে মহকুমার ৮৭০০ একর জমিতে ১৮২৪ টি ছোট বাগান ছিল। বর্তমানে চা বাগানের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে কুড়ি হাজার। মহকুমা কৃষি আধিকারিকরা মানছেন শুধুমাত্র সবজি চাষের উঁচু জমি নয়, ধান চাষের এলাকাতেও নতুন করে চা বাগান গড়ে উঠছে। প্রচার করেও কোনও লাভ হচ্ছে না।

তবে মাঝেমধ্যেই কাঁচা চা পাতার দাম তলানিতে নেমে আসায় উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষীরা দিশাহারা হয়ে পড়ে। ময়নাগুড়িতে কারখানার সামনে রাস্তায় চা পাতা ফেলে শতাধিক চাষির বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনাও ঘটে মাঝেমাঝে। দাম না পাওয়ার ফলে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন বেশ কয়েকটা বাগানের ছেঁড়া পাতা পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলেও চাষীদের অভিযোগ। পরিস্থিতি বেসামাল দেখে বাগান বন্ধের হুমকিও মাঝে মাঝে দেয় চা চাষিদের সংগঠন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি। সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, কারখানার মালিকেরা চক্রান্ত করে পাতার দাম এতটাই নিচে নামায় যে উৎপাদন খরচ ওঠে না। চা পর্ষদের নজরদারির অভাবে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে বলেই অভিযোগের তির। চা পর্ষদকে বারবার জানিয়ে কোনও লাভ হচ্ছে না বলেও অভিযোগ বিজয়বাবুদের। যদিও পরিস্থিতি নিয়ে এখনই কিছু মন্তব্য করতে চাননি ভারতীয় চা পর্ষদের কর্তারা। সংস্থার সরকারি অধিকর্তা অমৃতা চক্রবর্তী বলেন, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য এবার এমনিতেই ছোট বাগানগুলির অবস্থা কাহিল। উৎপাদন এবং পরিবহণ খরচ না ওঠার ফলে শহর সংলগ্ন ছোট অনেক বাগানে কাঁচা পাতা পচে যাচ্ছে। অন্যদিকে বটলিফ কারখানার মালিকদের সংগঠনের কর্তারা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাদের পাল্টা দাবি পাতার উৎপাদন বেড়ে গেলেও গুণগত মান ঠিক রাখা হচ্ছে না। তাই পাতার দাম কমছে বাজারের স্বাভাবিক নিয়মেই।

পাশাপাশি বাস্তব পরিস্থিতি আবার কৃষি দপ্তরের প্রচারের কাজটাকেই সহজ করে দিয়েছে। ঠেলায় পড়ে চাষিরা এখন নিজেরাই চা চাষ থেকে মুখ ফেরাচ্ছে। তবে চা বাগান উপড়ে তুলে জমির পুরনো অবস্থায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন না কেউই, বরং আজ হোক বা কাল হোক ছোট চা বাগানের সুদিন আসবে বলেই বিশ্বাস ক্ষুদ্র চা চাষিদের। যেসব চাষিরা একসময় বাড়তি মুনাফার জন্য সবজি অথবা ধান চাষের জমিতে চা গাছ বুনেছিলেন তারাই এখন চা বাগানে তেজপাতা ফলাচ্ছেন। এই ইন্টার ক্রপিং বা বিকল্প চাষে চা-চাষের ঘাটতি পূরণ হচ্ছে। যেমন হুসলুরডাঙ্গার চাষি মনোজবাবু গত পাঁচ বছর ধরে চা চাষ করে তেমন দাম পাচ্ছিলেন না। একর প্রতি চাষে খরচ হচ্ছিল প্রায় এক লক্ষ টাকা। অথচ চা পাতা বিক্রি করে আয় হচ্ছিল ৮০ হাজার টাকা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যাচ্ছিল যে ১৪ জন শ্রমিকের মজুরিও মনোজ বাবু দিতে পারছিলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে মনোজ বাবু চা বাগানের ছায়াগাছ হিসেবে আড়াইশ তেজপাতা গাছ লাগিয়ে ছিলেন। এখন বছরে ৪৫ হাজার টাকার তেজপাতা বিক্রি করেছেন তিনি। দার্জিলিং-এর সিটং থেকে ৭০০ কমলা লেবুর চারা কিনে এনে তিনি বাগানে বুনেছেন। লেবু গাছও বেড়ে উঠছে এবং সেই লেবু থেকে ফলন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মনোজবাবুর মতে নিরুপায় হয়ে ঝুঁকি নিতে হয়েছে।

জেলার ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির কিছু কিছু কর্তাব্যক্তিও স্বীকার করেছেন এক কেজি পাতা উৎপাদন করতে যা খরচ পড়ে চা পাতা বিক্রি করে খুব বেশি লাভ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে চাষিরা বিকল্প চাষের কথা ভাবছেন। ইতিমধ্যেই ময়নাগুড়ির এক চাষি বিকল্প হিসেবে স্ট্রবেরি চাষ শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর সাফল্য প্রচারে এনে অন্য চাষিদেরকেও উৎসাহিত করার কাজে নেমেছেন কৃষিকর্তারা। স্ট্রবেরি চাষে সচেতনতা বাড়াতে আলোচনা চক্রেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য অত্যন্ত লাভজনক স্ট্রবেরি চাষকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বর্মনপাড়ার চাষি বিক্রম দাস এক বিঘা জমিতে স্ট্রবেরি চাষ করেছেন। গাছ বাড়তেই ফুল এসেছে। খবর পেয়ে শুরু হয়েছে পাইকারদের আনাগোনা। ওই চাষী জানান, কৃষি দফতরের কর্তাদের পরামর্শ নিয়ে চারা তৈরি করে গতবার ক্ষেতে বুনেছেন। লাভ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯০০০ টাকা। বিক্রমবাবু বলেন, সবজি এবং ধান চাষ করে চলছিল না। ভাবছিলাম চা বাগান করব। এমন সময় খবরের কাগজে স্ট্রবেরি চাষ নিয়ে লেখাটা পড়ে কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা উৎসাহ দিলে আর অপেক্ষা করিনি।

বর্ষায় গা ঘিনঘিন হট্টবাজার জতুগৃহ, ব্যবসায়ীদের ঐক্যমত বা উত্তাপ নেই

ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলাম ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজারে। স্থানীয়দের মুখে প্রথমেই যে অভিযোগ উচ্চারিত হতে শুনলাম তা হল একটু বৃষ্টি হলেই ময়নাগুড়ি বাজার এলাকা ভেসে যায় বাজারের নিকাশি নালা প্রায় বুঁজে যাওয়ার ফলে। মাছ বাজার এবং সবজি বাজারের অবস্থা সব থেকে খারাপ। ক্রেতা-বিক্রেতা দুইয়েরই অসুবিধা সীমাহীন। বাজারের পাশে ময়নাগুড়ি গার্লস হাই স্কুল। ফলের বাজার এর আবর্জনা এবং নোংরা জল এসে জমছে স্কুলের রাস্তাতেও। সেটা পেরিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে হচ্ছে ছাত্রীদেরকে। ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সুমিত সাহা বললেন বাজারের দীর্ঘদিনের এই সমস্যা প্রশাসনকে বারবার বলেও মেটানো যায় নি। বাজারটি পুরোপুরি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে, লোক বেড়েছে দোকান বেড়েছে, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ করবার কথা

জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির পরিসংখ্যান বলছে২০০১ সালে মহকুমার ৮৭০০ একর জমিতে ১৮২৪ টি ছোট বাগান ছিল। বর্তমানে চা বাগানের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে কুড়ি হাজার। মহকুমা কৃষি আধিকারিকরা মানছেন শুধুমাত্র সবজি চাষের উঁচু জমি নয়, ধান চাষের এলাকাতেও নতুন করে চা বাগান গড়ে উঠছে।

ভাবা হয় নি সে সময়, সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করা যায় যায় নি। অবিলম্বে বাজারের হাল ফেরাতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার একবাক্যে মানলেন ব্যবসায়ীরা। সামান্য বৃষ্টিতেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ভারি বর্ষণে বৃহত্তর ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। বাজারে নিকাশি ব্যবস্থা সঠিক না থাকার সমস্যার কথা বারবার জেলা পরিষদকে জানিয়েও কোন সমস্যার সমাধান হয়নি, পরিস্থিতির উন্নতি না হলে ব্যবসায়ীরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলে জানালেন ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে স্বপন দত্ত। সবার মুখে আন্দোলন বা প্রতিবাদের কথা শুনলেও উত্তাপ নেই, প্রত্যয়ের অভাব স্পষ্ট।

জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারের মতই জতুগৃহ হয়ে আছে ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজার। উদ্বিগ্ন ময়নাগুড়ি দমকলের প্রাথমিক সমীক্ষায় জানা গেছে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত ১০০ বছরের পুরনো এই বাজারে নানা দাহ্য বস্তুর গুদাম রয়েছে। কাঠ এবং টিনের তৈরি জীর্ণ স্টলগুলিতে প্রকাশ্যে চলছে কেরোসিন তেল এবং আতশবাজি বিক্রির কারবার। বিপজ্জনকভাবে জ্বলছে মিষ্টির দোকানের উনুন। নেই পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা। রাস্তা দখল করে দোকান বেড়ে যাওয়ার ফলে চলাফেরার জন্য জায়গা নেই ক্রেতাদের। পেট্রোল পাম্প রয়েছে বাজারের পাশেই। দমকল আধিকারিকদের আশঙ্কা কোনও কারণে দিনবাজারের মতো অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সহজে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভবপর হবে না। বাজার এবং সংলগ্ন এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। দমকলের ইঞ্জিন বাজারের ভেতরে যে ঢুকবে তার কোনও রাস্তা নেই। দোকান ভাঙচুর করে ইঞ্জিন ঢোকানো গেলেও জল পাওয়া যাবে না। অভিযোগ মিলল, ব্যবসায়ীদের একাংশ ইচ্ছামত রাস্তা দখল করে দোকানের সামগ্রী সাজানোর ফলে বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ময়নাগুড়ি দমকল আধিকারিকরা বলেন উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে পুরাতন বাজার। সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। বাজারে মিনি গ্যাস গুদামের হদিসও মিলেছে। আতশবাজির দোকানগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার, কেরোসিন, প্লাস্টিক কী নেই বাজারে। সতর্ক করা হলেও ব্যবসায়ীরা কর্ণপাত করছে কোথায়?

ব্যবসায়ী সূত্রেই জানা গেল বাজারে জেলা পরিষদের টিনশেডের তলায় প্রায় ৫০০ দোকান আছে। এর বাইরে আরও প্রায় দেড় হাজার দোকান গড়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন বাজারে চলাচলের রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে গেছে, অন্যদিকে তেমনি রাস্তা ঘিঞ্জি হয়ে বিপদজনক চেহারা নিয়েছে। তাই ব্যবসায়ীদের একাংশের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে কেন সময় থাকতে থাকতে বাজারের পুরনো পরিকাঠামো ভেঙ্গে আধুনিক করা হচ্ছে না? কিন্তু জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেল, পুরনো পরিকাঠামো ভেঙে পাকা স্টল তৈরি করার জন্য কয়েক বছর আগে উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোন লাভ হয়নি। আলোচনার স্তরে থাকাকালীনই তা ভেস্তে যায়। অতএব ব্যবসায়ীরা সহমত হয়ে কোনো প্রস্তাবনা না পাঠানো পর্যন্ত নতুন করে উৎসাহ দেখাতে রাজি নয় জেলা পরিষদ।

প্রশাসনকে সোজাসুজি দায়ী করলেও ময়নাগুড়ির ব্যবসায়ীরা কিন্তু নিজেদের সুরক্ষা বা ভবিষ্যত নিয়ে নির্বিকার নিরুত্তাপ বলেই মনে হল। মুখে আন্দোলনের কথা বললেও প্রতিবাদটা করবেন কার বিরুদ্ধে? সবাই-ই তো শাসক দলের সমর্থক সমিতি বা ইউনিয়নের সভ্য! সেকালেও যা ছিল একালেও ঠিক তাই। প্রশাসনের কাছে যাওয়ার আগে নিজেদের যে ঐক্যমত প্রয়োজন তাও তো নেই! স্বভাবতই ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় উঠে আসে হতাশা, ওসব আন্দোলন প্রতিবাদ করে যে কিছু হবে না তা আগেই বুঝতে পারেন তাঁরা। আর নির্বাচিত স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের বিষয়ে কোনও কথাই বলতে চাইলেন না কেউ। অনেকে ঘুরিয়ে বললেন, আসলে এখানকার মানুষ জলহাওয়ার দোষেই প্রতিবাদী হতে পারে না, এ আমাদের কপাল! খাওয়া পরার অভাব সেভাবে না থাকায় প্রতিবাদের অনীহা আরও বাড়ে। কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও এই সাবেক ডুয়ার্স দিশাহীন, ফোকাসহীন হয়েই থেকে যায়।

গৌতম চক্রবর্তী

মাটির মিঠে সুরে মজে থাকেন ময়নাগুড়ির লোকশিল্পীরা

শিবভূমি ডুয়ার্স

ময়নাগুড়ি

কেমন আছে?

মঙ্গলাকান্ত রায়

ময়নাগুড়ি একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই অঞ্চলের শোভা বাড়িয়েছে। কৃষিকাজ এই এলাকাকে আর্থিকভাবেও স্বাবলম্বী করেছে। উর্বর মৃত্তিকা, পর্যাপ্ত বারিধারা, নদী-প্রাপ্ত জলসেচ কৃষি সহায়ক। একারণে কৃষিকাজ তুলনায় কম পরিশ্রমের। মূলত কৃষিজীবি মানুষের বাস ময়নাগুড়িতে। তাই জমি-মাটি-জল-জঙ্গলকে ঘিরে জীবনচর্চা ও আচার অনুষ্ঠান। সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খেতে পৌঁছানো। পথে যাবার পথে গান, চাষ করতে করতে গান। এ গান তো শ্রমকে লাঘব করে দেয়। উর্বর জমি হলেও তো ফসল ফলাতে হাড় ভাঙা খাটুনি উদয়াস্ত। জলে রোদে যে লড়াইটা করতে হয় তাকে নরম করে সংগীত। প্রাণের আরাম জোগায়। গান গেয়ে ওঠেন সেই মানুষটাও, যিনি পশু নিয়ে চলেন। কাজের শেষে সন্ধের সহস্যময় আলো-আঁধারিতে বিনোদনের সঙ্গী গান। তাই গড়ে উঠেছে কত ধরনের সংগীত! আচার-সংগীত, শ্রম-সংগীত, বিনোদন-সংগীত। সবসময়ে সঙ্গী সে। আনন্দ-বিষাদে, মনের সব অবস্থায় তাকে বয়ে চলেন ময়নাগুড়ির গান পাগলেরা। তাঁরা যে কখন শিল্পী হয়ে ওঠেন, নিজেরাও বুঝে উঠতে পারেন না। মনের আনন্দে গান গাইতে থাকেন।

কত যে শিল্পী আছেন ময়নাগুড়িতে! অধিকাংশ শিল্পীর সংগীত জ্ঞান গভীর এবং দর্শনের ধারণা খুব স্বচ্ছ। দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান আমাদের মুগ্ধ করে। ভাওয়াইয়া, বাউল, কৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদি বিভিন্ন সংগীত চর্চা ময়নাগুড়িতে। কেউ ভাল গান তো কেউ বিস্ময়াবিষ্ট করেন। অনেক শিল্পী এমন আছেন যাঁদের দোতরা, সারিন্দার বাজনা, তার সুরে মুগ্ধ আমাদের কানে যেন পাই সুধার স্পর্শ। আর সে সংগীতের সুর-সাধনা বয়ে চলেছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। সকল শিল্পীরা কথা আমাদের এই রচনায় এঁটে যাবে তার সাধ্য কী? স্বল্প পরিসর এ লেখার। ময়নাগুড়ির সমস্ত শিল্পী বা শুধুমাত্র প্রতিভার শিল্পীদের জীবনের কাজের খতিয়ান একত্রে গাঁথা যায় তবে তা একটি সম্পূর্ণ পুস্তক হয়ে উঠবে। তাই এ রচনায় গুটিকয় আমার ভাললাগার শিল্পীর কথা বলব।

মঙ্গলাকান্ত রায়

মঙ্গলাকান্ত রায় ওরফে মঙ্গলা-দাকে চেনেন না, এমন বিরল মানুষ এ তল্লাটে কম আছে। সমগ্র ডুয়ার্স, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের সংগীততৃষিত মানুষ বঙ্গরত্ন মঙ্গলাকান্ত রায়ের সারিন্দা (বা সারিঙ্গা)-র সুরে ডুব দিয়েছেন। তাঁর সারিন্দা যেমন অসাধারণ গীতসুধা সৃষ্টি করে তেমনই হরেকরকম বোল উচ্চারণ করে 'হরবোলা' হয়ে উঠেছে।

অত্যন্ত দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান মঙ্গলা গোসাঁই-এর বাস ময়নাগুড়ির চারের বাড়ি। ছেলেবেলায় পিতৃবিয়োগ তাঁর জীবনের লড়াইকে কঠিন করে।

এরপর মা বেশ কিছুকাল পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। মঙ্গলাকান্ত পালাটিয়া দলের নৃত্যশিল্পী রূপে যাত্রা শুরু করেন সাত বছর বয়সে। দ্বিতীয় পিতা এ কাজ পছন্দ করতেন না। ভেঙে দেন খমক, খঞ্জনী, দোতারা। শিল্পীর মন কষ্ট পেতে শেখে। গুমরে মরে সে। কিন্তু সে আবার জীবন ফিরে পায় গুরু টলমল গোসাঁই-এর ডেরায়। তাঁর থেকেই পাঁচ টাকার বিনিময়ে কিনেছিলেন সারিন্দা। আড়ালে, পিতার নজর ও কান এড়িয়ে গুরুর কাছে তালিম নেন। হয়ে উঠলেন সারিন্দায় সিদ্ধ। ছড়িয়ে পড়ল খ্যাতি। শিল্পী জীবন শুরু করেছিলেন মাত্র সাত বছর বয়সে। একশত সাত বছর বয়সে তিনি সমান তৎপর। সারিন্দা হাতে ঘুরেছেন সম্পূর্ণ দেশ। প্রায় সব জনপদ। তিনি শৈবও বটেন। নিজ বাসভূমিতে শিবমন্দির স্থাপনা করে আশ্রমে রূপান্তরিত করেছেন। সংগীতে-ঈশ্বরে মজে আছেন।

কামেশ্বর রায়

ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমহনী জনপদের কাছে সিঙ্গিমারি গ্রামের বাসিন্দা কামেশ্বর রায়। গায়েন ও সংগীত রচয়িতা এই শিল্পীর সংগীত জীবনের যাত্রা শুরু পিতা মোহিনী মোহন রায়ের সাহচর্যে। মোহিনী মোহন সারা বছর সংকীর্তন, কুশান যাত্রা, ঝুমুর যাত্রা, চোর-চুন্নী পালাগানের দল নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। বাজাতে পারতেন সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র। সংগীত শিক্ষা দিতেন পাঁচ পুত্র সন্তানকে। পিতার কোলে বসে গান শিখেছেন ছোট্টবেলা থেকে। পরে চোদ্দ বছর বয়সকাল থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নিয়েছেন ময়নাগুড়ির বাসিন্দা অশোক রায়ের তত্ত্বাবধানে।

কামেশ্বর রায় ভাওয়াইয়া গানের পসরা নিয়ে মুগ্ধ করেছেন পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অসংখ্য শ্রোতাদের। তাঁর রচিত পদ জনপ্রিয় হয়েছে। সুরারোপিত পদ গেয়েছেন আয়েষা সরকার, দীপ্তি রায়, নগেন শীলশর্মা, জিতেন রায়, অঞ্জলি ডাকুয়া, রোশনারা ইসলাম-সহ আরও অনেকে।

সংগীতচর্চার পাশাপাশি কবিতা রচনা করেন কামেশ্বর। সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ লিখেছেন অনেক। তাঁর আর একটি প্রিয় বিষয় রবীন্দ্র সংগীত। সভায় গান না কখনও, গাইতে খুব ভাল লাগে। হাত দিয়েছেন রবীন্দ্র সংগীতকে রাজবংশী অনুবাদের রচনায়। কুড়িটি গান ইতিমধ্যে রূপান্তরিত করেছেন। আরও করবেন। তিনটি গান প্রকাশিত হয়েছে ছাপার অক্ষরে একটি পত্রিকায়। নিজেও 'বিলে' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'মুক্তচিন্তা সাহিত্য অনুশীলন কেন্দ্র' স্থাপনা করেছেন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে। লক্ষ্মীর হাটে। প্রেরণা শচীমোহন বর্মন।

দীপ্তি রায়

দোতরা, সারিন্দা বাজিয়ে ভাওয়াই, তুক্ষা গান পরিবেশন করেন এমন মহিলা সংগীত শিল্পী বিরল। দীপ্তি রায় তেমনই বিরল প্রতিভাধর একজন। যিনি ফিরিয়ে এনেছেন হারিয়ে যাওয়া অনেক গান। তিনি নৃত্যপটিয়সীও বটেন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচারভিত্তিক গান, বিনোদনমূলক গান সংগ্রহ করেছেন। গাইতে শিখেছেন, পরিবেশনের দল গড়েছেন। সংগীত, নৃত্য সহযোগে উপস্থাপনা করেছেন রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে। মুগ্ধ হয়েছেন অসংখ্য শ্রোতা। শিক্ষা দিয়েছেন অসংখ্য শিল্পীকে। গড়ে তুলেছেন মাতৃস্নেহে। তাঁর তত্ত্বাবধানে ভারত সরকারের সংস্কৃতি

দীপ্তি রায়

মন্ত্রক প্রদত্ত জাতীয় বৃত্তি পেয়েছেন অনেক শিল্পী। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অনেকেই রাজ্য সরকার প্রদত্ত আব্বাসউদ্দীন মেধাবৃত্তির প্রাপক হয়েছেন। হয়েছেন রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী।

দীপ্তির জন্ম জলপাইগুড়ির মাদারীহাট ব্লকের (অধুনা আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্গত) রাঙালিবাজনায়। লোক সংস্কৃতি গবেষক 'বঙ্গরত্ন' দীনেশ রায়ের সঙ্গে বিবাহসূত্রে বর্তমানে বাস ময়নাগুড়ির রঙ্গীত কলোনীতে। দীপ্তি নিজেকে ঋদ্ধ করেছেন অনেক প্রথিতযশা গুরুর সান্নিধ্যে। তিনি সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন শ্যামাপদ রায়, গোপালচন্দ্র সূত্রধর, ধনেশ্বর রায়, গঙ্গাচরণ বিশ্বাস, বিষ্ণুপদ দাস প্রমুখ গুরুদের কাছে। তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিয়েছেন অশোক রায়ের কাছে। এখনও তিনি খুঁজে খুঁজে ফেরেন স্বামী দিনেশ রায়ের সঙ্গে বিলুপ্ত প্রায় আচার-অনুষ্ঠান, গান, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। উদ্ধার করে আনেন হারিয়ে যাওয়া অনেক সম্পদ। যা আমাদের সংস্কৃতির শেকড়ে ফিরতে সাহায্য করে।

চৈতন্যদেব রায়

দোতরা যেন তাঁর হাতের ছোঁয়ায় মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁর অসাধারণ দোতরা বাদনে মুগ্ধ হয়েছেন অগণিত শ্রোতা। গোষ্ঠ গোপাল দাস, পূর্ণদাস বাউল, সণজিৎ মন্ডল, ভক্তদাস বাউল, পরীক্ষিত বালা, প্রতিমা বড়ুয়া, তন্ময় বোস এমন আরও অনেক গুণী প্রথিত যশা শিল্পীদের সঙ্গে বাজিয়েছেন দোতরা। ঘুরেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁর কণ্ঠসুধায় মোহিত হয়েছেন সকলে।

অভাব-অনটনকে সাথী করে ছেলেবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি গভীর টান চৈতন্য দেব রায়ের। শিক্ষা শুরু হরগোবিন্দ রায়ের কাছে। নব্বইয়ের দশকে চৈতন্য-র দোতরা বাদন ও কণ্ঠসংগীত শুনে বাউল শিল্পী গোষ্ঠ গোপাল দাস তাঁকে নিয়ে যান কলকাতায়। তৎপরবর্তী শিক্ষা সেখানেই। ময়নাগুড়ির পেটকাটি গ্রামের এক বালকরে জন্য তা ছিল স্বপ্নসম উড়ান। দীর্ঘ আট বছর নিবিড় তালিম নিয়েছেন সেখানে।

শিক্ষান্তে ফিরে এসেছেন আপনার গাঁয়ে। শিল্পীদের অভাব অভিযোগ সমাধানের উদ্দেশে গড়ে তুলেছেন শিল্পীদের সংগঠন। শিক্ষা দিয়ে চলেছেন পরের প্রজন্মকে। গড়ে তুলেছেন অনেক শিল্পী। তাঁর তত্ত্বাবধানে নতুন নতুন ছেলেমেয়ে জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছেন। সংগীত রচনা চৈতন্যদেবের ভাললাগার আরও একটি কাজ।

কামেশ্বর রায়

চৈতন্যদেব রায়

সংগীতকে পেশা রূপে গ্রহণ করা শিল্পীদের কাছে স্বপ্ন। তা পূরণ করা বড় সহজ নয়। এর জন্য স্বীকার করতে হয়েছে অনেক কষ্ট-ত্যাগ-নিরন্ন দিন। আজও যে তাঁরা আর্থিকভাবে খুব ভাল আছেন তা নয়। ময়নাগুড়ি তো একটি ছোট জনপদ। কিন্তু তার মাটি-জল-বায়ু শিল্পীর প্রাণ সিক্ত করে, উর্বর করে। নতুন শিল্পীর জন্ম দেয় সে।

পারেন আমাদের এই রচনায় আলোচিত শিল্পীরা সবাই।

সংগীতকে পেশা রূপে গ্রহণ করা শিল্পীদের কাছে স্বপ্ন। তা পূরণ করা বড় সহজ নয়। এই শিল্পীগণ প্রত্যেকেই অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আজ তাঁরা প্রত্যেকেই পেশাগত সংগীত শিল্পী। এ কাজ আপন গতিতে হয়েছে তা নয়। এর জন্য স্বীকার করতে হয়েছে অনেক কষ্ট-ত্যাগ-নিরন্ন দিন। আজও যে তাঁরা আর্থিকভাবে খুব ভাল আছেন তা নয়। ময়নাগুড়ি তো একটি ছোট জনপদ। কিন্তু তার মাটি-জল-বায়ু শিল্পীর প্রাণ সিক্ত করে, উর্বর করে। নতুন শিল্পীর জন্ম দেয় সে।

এই মাটির আরও এক বিশেষত্ব— শিল্পীরা বেতারে দূরদর্শনে এ গ্রেড, বি-হাই গ্রেড শিল্পী। প্রকাশিত হয়েছে অনেক ক্যাসেট, অ্যালবাম। কিন্তু তাঁরা সাধনায় ডুবে আছেন। রত্ন আকর সন্ধানে ব্যাপৃত জীবনভর। এখানে আবারও উল্লেখ করি, এ আলোচনায় যাঁদের কথা বললাম এর বাইরেও আরও অনেক গুণী শিল্পী আছেন যাঁরা প্রথিতযশা এবং উল্লেখনীয়। এখানে দেখলাম হিমশৈলের চূড়ামাত্র।

ঋণ ঃ শচীমোহন বর্মন, চ্যাংরাবান্ধা, কোচবিহার। প্রদীপ রায়, চারের বাড়ি, ময়নাগুড়ি।

সব্যসাচী দত্ত

অঞ্জলি রায় ডাকুয়া

সে বহু বছর আগের কথা। ক্যাসেটে শুনেছিলাম অঞ্জলি ডাকুয়ার গান। সে শোনা ভাওয়াইকে ভালবাসতে শেখায়। আগ্রহী করে তোলে তাকে গভীরভাবে জানবার। জন্মগত সহজাত সংগীত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন ময়নাগুড়ির মাধবডাঙার ডাকুয়া পাড়ার এক কৃষক পরিবারে। দাদু গান গাইতেন। তাঁর কাছেই সংগীত শিক্ষার শুরু। পরে শিখেছেন আরও অনেকের কাছে। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন আরও এক লোকসংস্কৃতি প্রেমী নিতিন সেনগুপ্ত।

অঞ্জলির বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এক ভাওয়াইয়া পরিবারে। স্বামী পাইলা রায় সংগীত শিল্পী ও ভাওয়াইয়া সংগীতের প্রসারে নিবেদিত প্রাণ। হেলাপাকড়ির কাছে খয়েরখাল গ্রামের এই সংগীত পরিবার অঞ্জলিকে শিল্পী রূপে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

যতন রায়

ছেলেবেলাতেই বাঁশীর সুর টানত তাঁর মন। হারিয়ে যেতেন সুদূর পানে। বাঁশীর এই অমোঘ আকর্ষণেই বারো বছর বয়সে মুরগির দু'টি ডিম আট আনায় বিক্রি করে জল্পেশ মেলা থেকে চার আনা দিয়ে কিনে আনেন বাঁশী। শুরু হল চর্চা। একাই, স্ব-উদ্যোগে। শুনে শুনে, সুর মনে রেখে বাজানো আরম্ভ করলেন তিনি। সেই বাঁশীর সঙ্গেই তাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ল সারা রাজ্যে, রাজ্যের বাইরেও।

প্রথমে স্ব-শিক্ষিত হলেও পরে তিনি তালিম নিয়েছেন ধওলাবাড়ির বাসিন্দা কিশোর কুমার রায়ের কাছে। এই গ্রামটি যতনের বাসস্থান ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগারা গ্রামের পার্শ্ববর্তী। গুরুর কাছে শিখে নিয়েছেন বাঁশী তৈরির কূৎ কৌশলও।

সন্তোষ কুমার বর্মন

আর এক অনন্য গুণের অধিকারী শিল্পীর কথা না বলে এ রচনা শেষ করা যায় না। ময়নাগুড়ি পুটিমারি গ্রামের

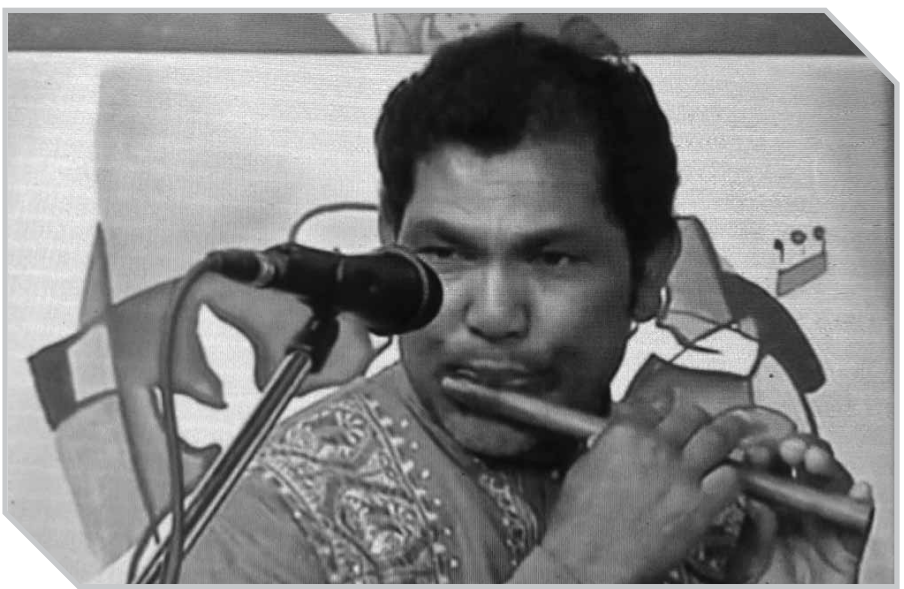

যতন রায়

বাসিন্দা সংগীত শিল্পী সন্তোষ কুমার বর্মন। পিতা শ্যামচন্দ্র বর্মন ছিলেন বৈঠককারী ও নামকারী কীর্তনের নামী শিল্পী। পিতার তত্ত্বাবধানেই ছোট্ট বয়স থেকে সংগীত শিক্ষার শুরু। এরপর আরও শিক্ষা গ্রহণ করেছেন দেওয়ান গঞ্জের বিভূতিভূষণ মোদক এবং ময়নাগুড়ি নিবাসী সংগীত শিল্পী দীপ্তি রায়-এর কাছে।

তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে শিল্পী জীবনে প্রবেশ করেছেন অনেক শিষ্যা-শিষ্য। তাঁরা পেয়েছেন আব্বাসউদ্দীন মেধাবৃত্তি, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক প্রদত্ত মেধাবৃত্তি। তিনি নিজেও পেয়েছেন এই সম্মানগুলি। সংগীতের পরিবেশে বড় হয়েছেন। ঘর করছেন তার সঙ্গেই। ঘরণী নমিতা রায় বর্মনও তার মতই ভাওয়াইয়া শিল্পী। দোতরা শিখেছেন প্রখ্যাত দোতরাবাদক আজিমুদ্দিন মিঞার কাছে।

সন্তোষ বাজাতে পারেন সব ধরনের বাদ্য। যেমন

অতীত ডুয়ার্সের নানান সময়কে ধরে রাখা ময়নাগুড়ির নানান গ্রামের নামে

ডুয়ার্সের ১৮টি দুয়ারের মধ্যে অন্যতম ময়নাগুড়ি দুয়ার তিস্তা নদীর পূর্বাংশে অবস্থিত। ময়নাগুড়ি দুয়ারের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত আছে প্রাচীন প্রাগ-জ্যোতিষপুর-কামরূপের ইতিহাস এবং ভুটানের ইতিহাস। অর্থাৎ ময়নাগুড়ির স্থান-নাম, মঠ-মন্দির নদীর নাম এবং জনবিন্যাস নিহিত আছে এতদাঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং সামাজিক ইতিহাসের পরম্পরায়। ধর্মীয় সংস্কৃতির আবহে এই অঞ্চলে ছিল বৌদ্ধ প্রভাব। পরবর্তীকালের বৌদ্ধতন্ত্রের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মঠ, মন্দির এবং লৌকিক দেবদেবীর ঐতিহ্য আজও লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ক্রমশ বাংলার উত্তরাংশে বৈষ্ণব ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতিতে তাই উঠে এসেছে শঙ্করীয়-বৈষ্ণব ঐতিহ্য এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ঐতিহ্য। এই জনপদের যে কিংবদন্তিগুলো খুঁজে পাওয়া যায় তা মূলত ইতিহাস ও জনশ্রুতির মিশ্রণ। ময়নাগুড়ি জনপদের স্থান-নাম চর্চার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের জাতি-জনজাতির ইতিহাস ও তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের লুপ্তপ্রায় উপাদানগুলিকে উদ্ধার করে আমাদের ঐতিহ্যের বুনিয়াদের সন্ধান দেওয়া যেতে পারে। এই স্থান-নামকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলের ভূগোল, ইতিহাস, নৃ-তত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, লোকসাহিত্য এবং ভাষা তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয়।

রামশাই

ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত ময়নাগুড়ি থেকে ২০ কিমি উত্তরে জলঢাকা নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চল।
সবুজ-বন-জঙ্গলে ঘেরা মূলত রাজবংশী জনগোষ্ঠীরই বসবাস। চা-বাগান ও বনাঞ্চল হওয়ার সুবাদে রাঁচি ছোটনাগপুরের অঞ্চলের স্থানান্তরিত আদিবাসী যেমন— মালপাহাড়ি, ওঁরাও, মদেশিয়া প্রভৃতি লোকের সংখ্যাও কম নয়। জনশ্রুতি— একদা (‘আমশা’) রাম শা নামক বিহার থেকে আগত সুরী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এই অঞ্চলে সপরিবারে বসবাস শুরু করে। সুরা প্রস্তুত ও বিক্রয় তার পেশা ও একমাত্র জীবিকা ছিল। তার নামানুসারেই ধীরে ধীরে এই অঞ্চল রামশাই নামে পরিচিতি লাভ করে। রাম ব্যক্তি নাম। ‘শা’ বা ‘শাহ’ পদবী।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রামশাই অঞ্চল বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়েজ-এর আওতায় আসে এবং সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রেল ব্যবস্থা চালু ছিল। রামশাই চা-বাগান ময়নাগুড়ি থানার সবচেয়ে প্রাচীন বাগান। এছাড়াও ভোলানাথ চা-বাগান, কালীপুর চা-বাগানও বেশ প্রাচীন। ঘন সবুজ বনজ-সম্পদে ভরপুর জলঢাকা নদীর উপকূলে অবস্থিত রামশাইয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও বেশ মনোরম। প্রতিবছর শীতের মরসুমে সৌন্দর্য পিয়াসীরা জলঢাকা নদীর উপকূলে চড়ুইভাতি উৎসবে মেতে ওঠে। বন্য প্রাণ দপ্তর ও পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে রামশাইয়ে একটি ইকো পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

শিবভূমি ডুয়ার্স

ময়নাগুড়ি

কেমন আছে?

চাপগড়

ময়নাগুড়ি থানার ৮ কিমি উত্তরে আমগুড়ি অঞ্চলের একটি মৌজা বর্তমানে চাপগড় নামে একটি গ্রাম হিসাবে পরিচিত। অতীতে এটি বৃহত্তর চাপগড় অঞ্চলের অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে বিভক্ত হয়ে বর্তমান চাপগড়ের রূপ নেয়। কোচবিহারের রাজবংশের ও চাপগড় রাজবংশের ইতিহাস ঘাঁটলে অতীতের পাতা থেকে মুছে যাওয়া চাপগড়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘চাপগড়’ অর্থাৎ ‘চাপা’ বা ‘লুকানো’ গড় বা গোপন ডেরা। কোচবিহারের রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ (১৮৩৯-১৮৪৭) চাপগড়ের রাজবংশের ষষ্ঠ পুরুষ বজ্রধর কাজীর অন্যতমা কন্যা কামেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। সুতরাং বৈবাহিক সূত্রে চাপগড় রাজার সঙ্গে কোচবিহার রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অতীতের বৃহত্তর চাপগড়ের রাজবংশের লুকানো গড়টি ছিল বর্তমান আমগুড়ি থেকে ২ কিমি উত্তর-পশ্চিমে। কিছুদিন আগেও সেখানে গড়টির কিছু অংশ রাজবংশের গড়ের শেষ নিদর্শনটুকু দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর গড়টি কেটে সমান করে লাগান হয়েছে চা-গাছ। খনন কালে কিছু কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেলেও তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি ঐতিহাসিক-গবেষকদের দৃষ্টির অগোচরে থাকার দরুণ।

ভোটপট্টি

ময়নাগুড়ির ১২ কিমি দক্ষিণে এই স্থানটি একসময়ে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। দোমহনি-চ্যাংরাবান্ধা রেলপথ ভোটপট্টিকে ছুঁয়ে গেছে।
এতদঅঞ্চল একদা ভূটানের অধীনে ছিল। ভোটপট্টি বয়ন শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে রাজবংশী রমনীদের পরিধেয় বস্ত্র ‘ফতা’, যেমন— ঘুনি ফতা, মালদৈ ফতা, সইস্যাফুলি ফতা, ঢালা ফতা ইত্যাদি তৈরি হত। ময়নাগুড়ি এলাকার মধ্যে গুনে ও মানে ভোটপট্টির ‘ফতা’ ছিল বিখ্যাত।

দোমহনি

পরিতোষ দত্ত বলেছেন— ভোটবর্মী শব্দ ‘দৈ-মা-নী’ থেকে দোমহনী শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু ডি.এইচ.ই. সুন্দর-এর রিপোর্টে উল্লেখ আছে— দো মোহনি অর্থাৎ দুই নদীর মুখ বা মোহনা থেকেই নামের উৎপত্তি। চেল নদী এসে তিস্তার সঙ্গে মিশেছে এই তালুকেই। বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের দোমহনি স্টেশন আর দোমহনি বাজার এই তালুকেই পড়ে। বালুকা মিশ্রিত মাটি হওয়ায় এখানকার কৃষকরা যাঁরা প্রধানত রাজবংশী তাঁরা ভাল রকমের শস্য উৎপাদন করতে পারেন।

বেংকান্দি

ময়নাগুড়ি থানার প্রায় এক কিমি উত্তরে এই গ্রাম অবস্থিত। একদা এতদঅঞ্চলে নীচু জলাভূমি ছিল এবং জলাশয়ে বর্ষাকালে অজস্র ব্যাঙ ‘ডাকতো’ বা ‘কাঁদতো’। সে কারণে এই স্থানের নাম হয়েছে ‘বেংকান্দি’। ডি.এইচ.ই. সুন্দর-এর রিপোর্টে সেই রকম ব্যাখ্যাই মেলে।

এই বেংকান্দি গ্রামেই তন্ত্র-সাধনার নিদর্শন ‘পেটকাটি’ মূর্তি বর্তমান। এই পেটকাটি মূর্তিটি আবিষ্কারকালে উপস্থিত ছিলেন এমন প্রত্যক্ষদর্শী ললিত মোহন রায়ের (পূর্ব বড়গিলা, আমগুড়ি) সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে ‘পেটকাটি’ মূর্তি উদ্ধারের কাহিনি সম্পর্কে বলেন— ‘১৯৪৮-১৯৪৯ সালে ময়নাগুড়ি হাইস্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক, যিনি ছিলেন তান্ত্রিক মতে বিশ্বাসী, তাঁর নির্দেশে কতিপয় বিদ্যালয় ছাত্র ও কয়েকজন গ্রামবাসী মিলে শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ মত বেংকান্দির নীচু জলা জঙ্গলে খনন করা হয় এবং উদ্ধার করা হয় ‘পেটকাটি’ মূর্তিটি। খননের সময় কোদালের আঘাতে মূর্তির ডান দিকের হাতের অংশ ভেঙে যায়। পরে সাবধানে মূর্তিটি উদ্ধার করে স্থাপন করা হয়। মূর্তিটির পেটের অংশ কোটরে ঢুকে গেছে বলে ‘পেটকাটি’ নাম হয়েছে।’

বলা বাহুল্য, মূর্তিটির আবিষ্কার কাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় ও তাঁর ‘দ্য রাজবংশী অফ নর্থ বেঙ্গল’-এ সন তারিখের উল্লেখ করেননি এবং ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়ের ‘উত্তরবঙ্গ রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ’-এ পেটকাটি মূর্তি আবিষ্কার কালের সময়কালের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

পখি নাগার বাড়ি

স্থানীয় ভাষায় পখি মানে পাখি আর নাগা মানে যে স্থানে গাছে পাখি বাসা বাঁধে। খাগড়াবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে তেকাঠুলি বা টেকাটুলি থেকে ১ কিমি দক্ষিণে শান্তারাম দাসের বাড়ীটিই 'পখিনাগার বাড়ি' বলে পরিচিত। শান্তারাম দাশ (রাজবংশী) ছিলেন জোতদার। কালীর হাট, ভাঙামালী, নীরেন্দ্রপুর,

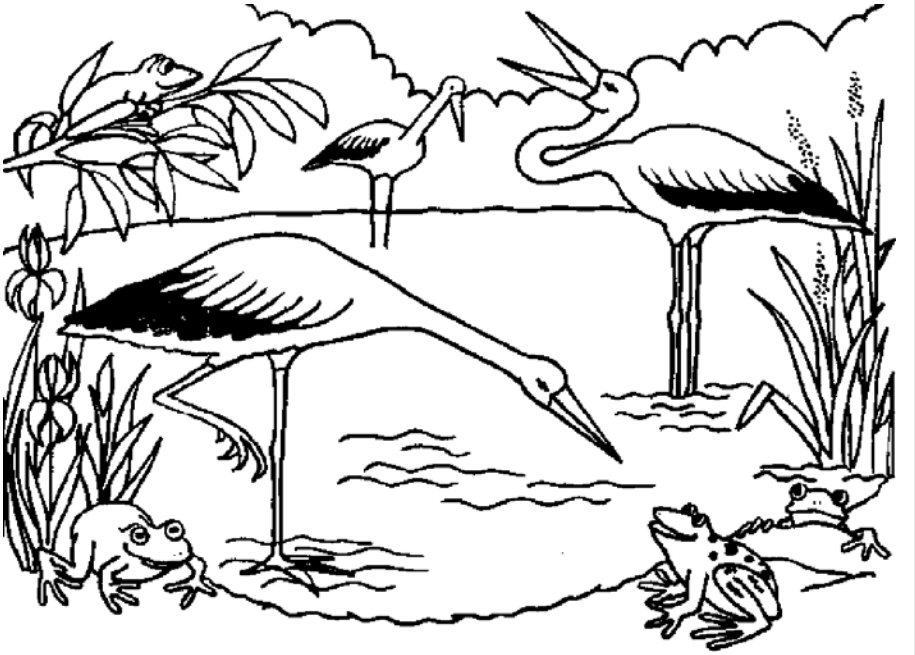

তালুকগুলি তাঁর জোতের আওতায় ছিল। শান্তারামের পুত্র মহীকান্ত দাশ, মহীকান্তের পুত্র সর্বানন্দ দাশ, সকলেই প্রয়াত। সর্বানন্দের পুত্র ক্ষিরোদ রায় ও তার ছোট ভাইয়ের বর্ণনার সূত্র থেকে পাওয়া 'পখিনাগা'-র প্রকৃত তথ্য।

ক্ষিরোদের বর্তমান বাড়ির পূর্বদিকে এক বিশালকায় নাকাড়ি গাছ (পাকুড় জাতীয়) ও অন্যান্য আম কাঁঠালের বড় বড় গাছ ছিল। একদা হঠাৎ নাকাড়ি গাছে এক ঝাঁক কদ্‌মা (সারস প্রজাতির) পাখি এসে আশ্রয় নেয় এবং বাসা বাঁধে। মহীকান্তরা লক্ষ্য করেন পাখিদের মধ্যে প্রথমে এক জোড়া পাখি চৈত্র সংক্রান্তিতে আসত এবং কয়েকদিন থেকে উড়ে চলে যেত। তারপর হঠাৎ এক ঝাঁক প্রায় ১০০-১৫০ পাখি উড়ে এসে গাছে বাসা বাঁধত। সারাদিন এরা জলাশয়ের পোকামাকড় মাছ ধরে খেত, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসত। এখানেই ডিম পাড়ত। ডিম থেকে বাচ্চা হত আর বাচ্চা বড় হলে শীত পড়ার আগেই এরা ফিরে যেত গন্তব্যস্থলে। শান্তারামের জোতে পাখি মারায় নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। সেই আমলে কোর্ট থেকে সে একটি অর্ডার বার করেছিল— যে তাঁর জোতে কেউ পাখি শিকার করতে পারবে না। আমগুড়ির বাংরু কোনও এক সময় হাতির পিঠে এসে শান্তারামের জোতে কয়েকটি পাখি শিকার করে। অনেক বাগ-বিতন্ডার পর বাংরুকে ছেড়ে দেওয়া হলেও পরবর্তীকালে এক পাখি শিকারি জোতের পাখি মারলে জলপাইগুড়ি কোর্টে মামলা হয়। শুনানির সময় জজসাহেব শান্তারামকে শিকারির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণ করতে আদেশ দিলে শান্তারাম শুনানির নির্দ্ধারিত দিন আদালতে হাজির হয়। আর সমস্ত পাখিগুলিও শান্তরামের পিছে পিছে আদলত চত্বরে গিয়ে হাজির হয়। সৃষ্টি হয় এক অদ্ভুত পরিস্থিতির। জজ সাহেব উদ্ভুত পরিস্থিতি লক্ষ্য করে অভিভূত হয়ে যান এবং শান্তারামের পক্ষে রায় দেন এবং সেদিনকার মত আদালতের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হন। তখন থেকেই পক্ষীপ্রেমিক শান্তারামের বাড়ী ও সংলগ্ন গ্রামটি 'পখি নাগার বাড়ি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

অতীতে ময়নাগুড়ি ছিল প্রাগ-জ্যোতিষপুর

এক পাখি শিকারি জোতের পাখি মারলে জলপাইগুড়ি কোর্টে মামলা হয়। শুনানির সময় জজসাহেব শান্তারামকে শিকারির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণ করতে আদেশ দিলে শান্তারাম শুনানির নির্দ্ধারিত দিন আদালতে হাজির হয়। আর সমস্ত পাখিগুলিও শান্তরামের পিছে পিছে আদলত চত্বরে গিয়ে হাজির হয়।

কামরূপের অন্তর্গত। পরে ময়নাগুড়ির অন্তর্গত বৃহত্তর পরগনা কোচবিহারের শাসনাধীনে আসে। সেসময় ভুটিয়ারা কোচবিহার ও বৈকুণ্ঠপুরে বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ চালাত। তাছাড়া এই সমস্ত অঞ্চলে ভুটিয়ারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঘাঁটি গাড়ত। শীতের মরশুমে পশমের চাদর ও নানা শীতবস্ত্র নিয়ে আসত ব্যবসার জন্য। যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকায় মূলত এরা ঘোড়ায় চেপে আসত। যেমন— ভোটপট্টিতে ভুটিয়ারা দলবেঁধে আস্তানা গাড়ত। অতীতে এই সমস্ত অঞ্চলে অস্ট্রীক ও মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর লোকের আগমন ঘটেছিল। তবে মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর প্রভাবই বেশি ছিল। যেমন— গুড়ি, গিলা, ডাবরি প্রভৃতি শব্দ মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর ভাষায় প্রচলিত। একেকটি স্থান মানে অতীত ডুয়ার্সের একেকটি সময়কে ধরে রাখা আছে তার নামের আস্তিনে।

দিলীপ বর্মা

শিবরাত্রির জল্পেশকে ছাপিয়ে যায় এখন শ্রাবণী মেলার ভিড়

শিবভূমি ডুয়ার্স

ময়নাগুড়ি

কেমন আছে?

শিব ঠাকুরের এই আপন দেশে তাঁর নানা রূপে নানা বেশে, নানা নাম নানা ধামকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে চলছে আরাধনা। এই 'শিব ক্ষেত্র'গুলিকে কেন্দ্র করে সেই সময় থেকেই প্রচলিত ও জমজমাট নানান মেলা আবহমান কালের মানবের যাপন সংস্কৃতির প্রতীক চিহ্ন হয়ে আছে। উত্তর বাংলার এমন বিখ্যাত মেলাগুলির অন্যতম জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ মেলা, কোচবিহারের রাস মেলা, মালদহের জহুরা কালির মেলা, আলিপুরদুয়ারের হ্যামিল্টনগঞ্জের কালির মেলা প্রভৃতি। মেলা নিছক মিলন ক্ষেত্র নয়, বা স্রেফ ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্রিক জমায়েতও নয়, মেলা সমাজের অন্তর্কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মেলা প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ জীবনের উৎসব, এই উৎসবগুলিতে অন্তঃশীল হয়ে আছে একধরণের সমন্বয়ী সংস্কৃতি, যা লোকায়ত জীবনচর্যার শাশ্বত চেহারাও বটে। মেলাগুলি বহন করছে ধর্মীয়তা ও লোকাচারের উর্ধ্বে চিত্রায়িত এক জীবন ভাষ্য। মেলা বা উৎসবের মধ্যে সেই অঞ্চলের মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সংস্কার, মূল্যবোধ, ধর্মবিশ্বাস ও আচার-বিচার অনুষ্ঠানের স্থানীয় ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়, এর পাশাপাশি সম-সময়ের ও বিগত সময়ের আর্থসামাজিক চালচিত্র ও মেলাগুলির সঠিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব। উত্তরের জনসমাজের নির্মাণে ও গঠনে যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তারও প্রতিফলন এই মেলা ও উৎসবের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আমরা এমনই প্রতিফলন দেখতে পাই আমাদের তিস্তাবঙ্গের অন্যতম প্রধান মেলা 'জল্পেশ মেলা'কে কেন্দ্র করে সহস্র মানুষের সম্মিলনের মধ্যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

জল্পেশ ধামকে কেন্দ্র করে বছরে তিনবার মেলা বসে, এর মধ্যে দু'টি মেলা প্রবল জন উচ্ছ্বাসে প্লাবিত করে মন্দির ও সংলগ্ন এলাকাকে। একটি শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারের শ্রাবণ মেলা, অন্যটি ফাল্গুন মাসের শিব চতুর্দশীর মেলা। আগে শিব চতুর্দশীর মেলাটাই মুখ্য ছিল, যার দেশ বিদেশে পরিচিতি 'জল্পেশের মেলা' নামে। প্রাচীনত্বে এই মেলা যেমন অন্য মেলা থেকে এগিয়ে, তেমনি পূণ্যার্থী সমাগমেও এর তুলনা মেলা যায় না। ১৯৫১-র ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ারে যে সব মেলার উল্লেখ আছে তার অন্যতম এই জল্পেশ মেলা, এখানে সেই সময়ই লক্ষাধিক মানুষের সমাগমের কথা বলা হয়েছে। এই মেলার প্রাচীনত্বকে জানতে হলে এই মন্দির ঘিরে এবং এর প্রতিষ্ঠা ঘিরে যে সব কাহিনী রয়েছে সেগুলিকে অনুধাবন করা দরকার। অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'কামাখ্যা মহাপীঠে শ্রী শ্রী উমানন্দ ভৈরব, বৈদ্যনাথ ধামের শ্রীশ্রী বৈদ্যনাথ ইত্যাদি যেমন অনাদিলিঙ্গের প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, জলপাইগুড়ির জল্পেশও তদ্রুপ। স্থানটি ভারতের একান্নপীঠের একটি বিধায়'।

কালিকা পুরাণে সাতাত্তর অধ্যায়ে এই মহাপীঠের কিঞ্চিৎ উল্লেখ দেখা যায় ঃ

"জামদগ্ন্য ভায়াতভীতাঃ ক্ষত্রিয় পূর্বমেভ থে।
ম্লেচ্ছছদ্মানুপাদায় জল্পীং শরাবাংগতা"।
শিবশতনাম স্তোত্রেও উল্লেখ আছে ঃ —'অহং কোচ বধূপুরে জল্পেশ্বর ইতি স্থিতঃ'।

শিব ঠাকুরের নানা রূপে নানা দেবতার মন্দির রেয়েছে গোটা উত্তর বাংলা জুড়ে, এবং একে ঘিরে

লোকপ্রবাদ অনুযায়ী জলপাইগুড়িকে তিন ঈশ্বরের দেশ বলা হয়, জল্পেশ্বর, জটীলেশ্বর ও বটেশ্বর। এই তিন 'ঈশ্বর' শিবের তিন নাম। এবং এই তিন শিবের মন্দিরই রয়েছে ময়নাগুড়িতে। এর মধ্যে অন্যতম 'জল্পেশ'এর মন্দির, এর পেছনে রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাসাশ্রয়ী মিথ।

মেলা ও উৎসবের সংখ্যাও অগণিত। এই আলোচনায় প্রারম্ভে উল্লেখ করতে হয় ৪নং দামোদর লিপির কথা, এর উল্লেখ অনুযায়ী পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গের এক দুর্গম প্রান্তে লিঙ্গ রূপী শিবের পূজা প্রবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ড গিরিজা শঙ্কর রায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মুখ্যতম দেবতা হলেন শিব। এই অঞ্চলের শৈব ধর্মই পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের অন্যত্র পরিব্যাপ্ত হয়'। পরবর্তীতে বিভিন্ন শতকজুড়েও এই শৈব ধর্মের ব্যাপক বিস্তারের উদাহরণ এই জেলায় ছড়িয়ে আছে। ময়নাগুড়ি তার এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রভূমি। লোকপ্রবাদ অনুযায়ী জলপাইগুড়িকে তিন ঈশ্বরের দেশ বলা হয়, জল্পেশ্বর, জটীলেশ্বর ও বটেশ্বর। এই তিন 'ঈশ্বর' শিবের তিন নাম। এবং এই তিন শিবের মন্দিরই রয়েছে ময়নাগুড়িতে। এর মধ্যে অন্যতম 'জল্পেশ'এর মন্দির, এর পেছনে রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাসাশ্রয়ী মিথ। জল্পেশ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অনতিক্রম্য।

ময়নাগুড়ির থেকে দক্ষিণে রাজ্য সড়কের দক্ষিণ দিকে মেখলিগঞ্জগামী সড়কের তিন কিলোমিটার গেলেই দেখা যাবে শুভ্র মন্দিরটিকে, সিংহদ্বার ও দুই বিরাট হস্তি মূর্তির উপর বৃষারোহী শিবমূর্তিতে এর প্রবেশ পথ সাজানো। গ্রামের নাম গড়তলি। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে ভিন্ন মত আছে গবেষকদের মধ্যে। তবে এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সবাই একমত। এই শিব লিঙ্গটি নিছক পাথরের নয়, এটি 'স্বয়ম্ভু ও অনাদি'। ১৪৯৭, ১৫৪৮, ১৫৯৬, ১৬৬৩, ১৭৩৭, ১৮৯৭ ও ১৯৫০-এ এই অঞ্চলের ভয়ানক ভূমিকম্পের ক্রমাগত আক্রমণে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হয়েছে মন্দিরটি। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে মন্দিরটি সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। আধিকাংশ গবেষকের অনুমান কোচবিহার রাজা প্রাণনারায়ন (১৬৩২-১৬৫০) এই মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন। ১৮৯৭ সালে মন্দিরটির উপরের অংশের ৫২ ফুট ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায় যা পরবর্তিতে সংস্কার করা হয়। ভূটান অধিকারের সময় এই মন্দিরের পূজা দেখভালের জন্য ভূটানরাজ নরেশ তেওয়ারী নামে এক ব্রাহ্মণকে 'বড় দেউরি' নিযুক্ত করেন। ১৮৯১তে ব্রিটিশ সরকার জল্পেশ মন্দিরের সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি খাস করে নেয়। পরবর্তীতে 'টেম্পল কমিটি' এর পরিচালনার ভার পায়। দিনে তিনবার এর নিত্য পূজার বন্দোবস্ত হয়। এই মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে জটদা নদী, এই নদীর নানা নাম পুরনো দস্তাবেজে দেখা যায়। জটোদ্ভবা, জটর্দা, জটোদা, জড়দা নানা নামে পরিচিত এই নদী।

পূণ্যার্থীরা এই জটদা নদীতে স্নান করে শিব লিঙ্গের পূজা করেন বা জল ঢালেন। এই উপলক্ষে বহু দূর থেকে আজও মানুষের ঢল নামে। একসময় তাই এই জল্পেশ মেলা ঘিরেই ঘটত বিশাল বাণিজ্য, যাতে যুক্ত থাকত নেপাল ভুটান সহ আসাম বিহার এলাকার বিপণন সামগ্রী নিয়ে হাজির হওয়া ব্যাপারীরা। অতীতের সেই স্মৃতিচারণে দেখা যায় যে, এখানে দূরদূরান্ত থেকে আসা ব্যাপারীরা এই এক পক্ষকাল থাকতেন কেবল তাই নয়, দূর দূরান্ত থেকে পূণ্যার্থীরাও ৩-৪ দিন এখানে রাত্রিবাসের আয়োজন নিয়েই হাজির হতেন। তখন যাতায়াতের মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ি বা মোষের গাড়ি। সেসময় গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ বাড়ি ছিলো যৌথ পরিবারের বন্ধনে বাধা, তাদের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই থাকত মোষের বা গরুর গাড়ি। আজ যেখানে সাইকেল বা মোটর সাইকেল সেই স্থান পূর্ণ করেছে, কিন্তু পরিবার ভেঙ্গে গেছে। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও প্রাবন্ধিক হরিপদ রায়ের স্মৃতি কথা থেকে জানতে পারা যায় সেই সময়ের কথা। সে সময় জোতদার ও আধিয়ারের সম্পর্কটা ছিল অনেক কাছাকাছি, গ্রাম ধরে জোতদারের সঙ্গে অন্যান্য মানুষেরাও চলতেন জল্পেশের মেলা দেখতে। ২০-২৫টা গরুর গাড়ি একসঙ্গে মিছিলের মত লাইন করে চলত, গাড়িতে বাধা ঘুঙুরের টুং টাং শব্দ। দুই-তিন দিনের ব্যাপার, তাই সঙ্গে থাকত চাল ডাল চিড়া মুড়ি সহ বাসন কোসন, গাড়িগুলির বাঁশের ছই সাজানো হত, থাকত হাতি ঘোড়া প্রভৃতির নানা শিল্পরূপ। মেলার

কাছাকাছি তাঁবু টানানো হত, চলত রান্না বান্না, আর মেলা দেখা। মন্দিরে পুজা অর্চনার পর তাদের মেলা দর্শন। বিকিকিনির পাশাপাশি বিনোদন, সেদিনের মতো আজও মুখ্য বিষয়। শুধু সময়ের সাথে সাথে পাল্টেছে বিনোদনের চরিত্র। সেসময় সারা রাত ধরে চলত পালাটিয়া গান, কুষাণ, বিষহরা ছাড়াও ভাওয়াইয়া গানের আসর। অংশ নিতেন পল্লী বাংলার মানুষজন, কলাকুশলি, শিল্পীরা সারা বছর মুখিয়ে থাকতেন এখানে তাদের শিল্প প্রদর্শনের জন্য। এর পর ক্রমশ পাল্টাতে থাকল বিনোদনের মাধ্যম ও চাহিদা। তাঁবু খাটিয়ে আয়োজন করা হত সিনেমা দেখানোর। পুরনো মেলার আর এক আকর্ষণ ছিলো বিড়ি কোম্পানির বিজ্ঞাপন। অতীতের মেলায় বিকিকিনির প্রধান আয়োজন থাকত ঘর গেরস্থালির জিনিষপত্র, আর মণিহারি দোকান। আর পাহাড় থেকে আসা বাণিজ্য করতে আসা মানুষেরা আনতেন গরম বস্ত্র, মসলাপাতি প্রভৃতি। সেকালে জল্পেশ মেলার ঘোড়ার বিকিকিনি ছিল বিখ্যাত।

এই ছবিটা ক্রমশ পাল্টেছে সরকার এই মেলা আয়োজনের দায়িত্ব নেওয়ার পর। পূণ্যার্থীদের চলাচলের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধার দিকগুলি তদারকি করা হয়। মেলার মাঠে বিশাল মঞ্চ তৈরি করে সারা রাত ধরে আয়োজন হয় উত্তর বাংলার নানা প্রান্তের ভাওয়াইয়া শিল্পীদের অনুষ্ঠান, পালা নাটক। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জনহিতকর প্রচার ও সরকারি কর্মসূচী ও প্রকল্পের প্রচার চালানো হয়। সংবাদ মাধ্যমে দৈনন্দিন মেলার খবর মানুষকে প্রভাবিত করছে। এখন মেলা উপলক্ষে সরকারি আয়োজনে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়াও পার্শ্ববর্তী দেশ ও রাজ্য থেকে অনেক গাড়ি আসে এখানে।

তবে বদলেছে অনেক কিছুই, মানুষের মতই তাদের অভ্যেসও। যে বর্ণময় জল্পেশ মেলার কথা বলছিলাম সেই আয়োজন মূলত শিবরাত্রির সময় আয়োজিত পক্ষকাল ব্যাপী মেলার জন্য। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীত থেকে শ্রাবণের প্রতি সোমবার শিবলিঙ্গে জল ঢালার জন্য পূণ্যার্থী আগমনের ঢল নামছে। এই অঞ্চলে শিবের মন্দির বা পূজার সঙ্গে শুভ্র সাদা রঙের যে সম্পর্ক ছিল, আজ তা গেরুয়া হয়ে যায় এই শ্রাবণে। অনেকেরই অভিমত যে আশির দশকের শুরুর দিকে বাংলা ছায়াছবি 'জয় বাবা তারকনাথ' এর অভাবনীয় জনপ্রিয়তার ফলস্বরূপ শ্রাবণ মাসে এই বাঁকে করে জল নিয়ে শিবলিঙ্গে ঢালার একটা হুজুগে জোয়ার এসেছে। সারা রাত দূর দুরান্ত থেকে পূণ্যার্থীরা বাঁকে করে জল নিয়ে আসে। মুখে ধ্বনি থাকে 'বোলে ব্যোম'। ক্রমশ এই ভিড় বাড়ছে। পূণ্যার্থীরা তিস্তা নদীতে স্নান করে এই পথটুকু হেঁটে যান। অনেকে সেই পুরনো জটদা নদীতেই স্নান করেন। তার পরদিন ফিরে যান। পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল, ভুটান থেকে হাজার হাজার মানুষ আসেন এই সোমবার গুলিতে। আসাম সহ বাংলার নান জায়গা থেকেও আসেন। দেওঘরের বাবাধামে যেমন এই সময় পূণ্যার্থীদের ঢল নামে, তেমনি এখানেও। তিস্তা সেতু থেকে ময়নাগুড়ি পর্যন্ত পথের দুদিকে প্লাস্টিকের ঘট সহ ধুতরো, বেল ফুল প্রভৃতির পসরা নিয়ে ব্যাপারীরা বসেন এই দিনগুলিতে। ঘোর বর্ষাতেও জেগে ওঠে তিস্তা বাংলার এই প্রাচীন জনপদ, দুই কুল উপচে যাওয়া স্রোতের মতই জল্পেশে শ্রাবণের ভক্তসমাগমে এখন ছাপিয়ে যায় শিবরাত্রির ঐতিহ্যমন্ডিত মেলার ভিড় ও পুরনো আমেজ, সম্ভবত দুইই।

গৌতম গুহ রায়

ডুয়ার্সের উপকথা-লোককথা

জল্পেশ নাম কী ভাবে হল

অনেক দিন আগেকার কথা। কামরূপের এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল জল্প। রাজা জল্পের সোনার রাজত্ব। রাজার সম্পদ, প্রজার সুখ— কোনো কিছুর অভাব নেই। রানী কল্যানী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আর জল্পের পাঁচপুত্র যেন পাঁচ দেবপুত্র। ভায়ে ভায়ে মিল দেখার মত। অনেক অনেক বছর রাজত্ব করার পর একদিন জল্প ভাবলেন, আর নয়। এবার বাণপ্রস্থে যেতে হবে। তখন তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য পাঁচ ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে রানী কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন বাণপ্রস্থে। ভাবলেন, পাঁচ ভাই এক ঠাঁই হয়ে সুখেশান্তিতে প্রজাপালন করবে।

কিন্তু হায়! মানুষ ভাবে এক হয় আরেক। পাঁচ ভাই-এর একজনের নাম বিক্রান্ত। বিক্রান্তকে ধরল শনি। মহামাত্য আর সহসেনাপতির কুপরামর্শে বিক্রান্ত হয়ে গেল নরাধম। চারভাইকে হত্যা করিয়ে সে দখল করে নিল গোটা সাম্রাজ্য। জল্পের কামরূপে নেমে এলো ঘোরতর অশুভ ছায়া। বিক্রান্ত সেই অন্ধকারে কেবল হারিয়েই যেতে লাগল। প্রতিদিন ভরতে লাগল তাঁর পাপের কলসি।

সব কিছুরই সীমা আছে। একদিন বিক্রান্ত তাঁর পাপের সীমা ছাড়িয়ে গেল। পাপের কলসি ভর্তি হয়ে গেল তাঁর। অনন্তনগরের মহাপরাক্রমশালী রাজা মহীশ্বরের রাজত্ব গ্রাস করতে গিয়ে সর্বস্ব হারাল বিক্রান্ত। মহারাজ জল্পের মহান রাজ্যপাট মিলিয়ে গেল শূন্যে। রাজদেউরির রক্ষী ও রাজপুরোহিত দু-জন কোনোমতে রাজা জল্পের কাছে পৌঁছে সেই দুঃসংবাদ জানালেন। সব শুনে মূর্ছা গেলেন জল্প আর কল্যাণী। তখন ঋষি বশিষ্ঠ তাঁদের সুস্থ করে তুলে বললেন, ভয় নেই জল্প! যাও! দেবাদিদেব মহাদেবের রাজ্যে গিয়ে তাঁর উপাসনা করে তাঁকে তুষ্ট কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বশিষ্ঠের পরামর্শ মেনে কল্যাণীকে নিয়ে জল্প যাত্রা করলেন। বহু দুর্গম পথ পেরিয়ে তিনি অবশেষে হিমালয়ের দক্ষিণে জটোদ্ভবা নদীর তীরে এলেন। নদীর ওপাড়ে ভয়ঙ্কর মহাকাল অরণ্য। সেই অরণ্য একটি স্থান বেছে নিয়ে জল্প এবং কল্যাণী শুরু করলেন শিবের স্তব। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়— একদিন মহাদেব সাড়া দিলেন। জল্প আর কল্যাণীর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'আমি সন্তুষ্ট। বলো! কী বর চাও?'

'হে মহাযোগী!' জল্প জোড়হাতে বললেন। 'যারা তোমার ভক্ত তাঁদের যেন পুত্রশোক, ধনহানী, রাজভয়, দস্যুভয়, গ্রহভয়, রোগভয় গ্রাস করতে না পারে। তাঁদের যেন সদা মঙ্গল হয়। তাঁরা যেন সবতীর্থ দর্শনের পূণ্য অর্জন করতে পারেন!'

'তথাস্তু।' শিব সহাস্যে বর দিলেন। 'আর কিছু? নিজের জন্য কিছু চাইবি না?'

'তবে একটা দামি বর দাও প্রভু!' জল্প প্রার্থনা করলেন। 'তুমি আজ হতে আমার নামে পরিচিত হও। তোমার নতুন একটা নাম হক জল্পের ঈশ্বর বা জল্পেশ্বর!'

'তাই হবে।'

সেদিন থেকেই সর্বপাপনাশকারী, অনাদি লিঙ্গ শিব ত্রিলোকে জল্পেশ্বর নামে পরিচিত হলেন। জল্পেশ্বর থেকেই জল্পেশ।

বৈকুণ্ঠ মল্লিক

স্কেচ হিমি মিত্র রায়

মন্দিরময় ময়নামতীর দেশে

ইকো পর্যটনের খনি সন্ধানে আসুন

পশ্চিম ডুয়ার্সের সেরা জনপদ মন্দিরময় ময়নাগুড়ি। অনেকে মন্দির নগরী বলেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। একদা বিস্তর ময়না গাছের সমারোহে সমৃদ্ধ ছিল ময়নাগুড়ি। ময়না পাখিরা বাসা বেঁধে পরম নিশ্চিন্তে বাস করত। জলপাইগুড়ির চেয়ে ময়নাগুড়ি অনেক বেশি পুরনো। পুরনো দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটাঘাঁটি করে ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, পরিব্রাজক নানা তত্ত্ব তথ্যের সন্নিবেশ করেছেন। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, কিংবদন্তী লোকসংস্কৃতির মোড়কে ময়নাগুড়ি যেমন আকর্ষণীয় তেমনই মোহময়ী। এক সময় ময়নাগুড়ি জনপদটিকে বলা হত রত্নপীঠ, মহাদেবের আবাসস্থল। উত্তরবঙ্গে শিবঠাকুরের আধিপত্য, মহিমা আর কোথাও এত নাই তার প্রমাণ জল্পেশ ধাম। ভক্তজনের ভিড় সারা বছর। ভিড় উপচে পড়ে শিবচতুর্দশী, শ্রাবণে। ভোলেবোম, হর হর মহাদেব। নগ্নপদ, গেরুয়া বস্ত্রে, তিস্তার জল ঘটে ভরে পত্র-পুষ্পে নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে ভক্ত, পর্যটকরা দিনে রাতে জল্পেশ মন্দিরে যান। সারারাত ভক্তের ঢল। বারাণসী, রামেশ্বর, বৈদ্যনাথ ধাম, বদ্রীনাথ, কেদারনাথের মতই জল্পেশ ধাম। মন্দির প্রসঙ্গ নিয়ে পরে আলোচনায় আসছি।

ময়নাগুড়িকে ঘিরে পর্যটন, লোকসংস্কৃতি, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে অনেকে আলোকপাত করেছেন। কেউ কেউ ক্ষেত্র সমীক্ষা করে চলেছেন। গুরু গম্ভীর নিবন্ধ, পুঁথি পুস্তক রচনা করলেও সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনা আমার মনে হয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সম্রাট চক্রবর্তীর বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য তাৎপর্যপূর্ণ। প্রভূত খোঁজ খবর সংগ্রহ এবং ঘুরে বেড়িয়ে গভীর পাঠঅনুসন্ধিৎসা মননের ভিতর দিয়ে চমৎকার আলোকপাত করেছেন। ময়নাগুড়ির সামগ্রিক চিত্র সত্যিই বিস্ময়কর। ময়নাগুড়ি আসলে কিরাতভূমি। এখানকার ভূমিপুত্ররাই মহাভারতের কিরাত। মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত মানুষ। আরও আগে এখানে রাজত্ব করেছে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষেরা। ভৌগোলিক দিক থেকে কামরূপ রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল। ওই এলাকাকে ঘিরে প্রাগৈতিহাসিক কালে বিকশিত হয়েছে উন্নত সভ্যতা যার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমাদের বিস্মিত করে। এখানে পেয়ে যাবেন সেই সিল্করুট বা রেশম পথ যেখান দিয়ে চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং কামরূপে যান। প্রকৃতপক্ষে ময়নাগুড়ি ইজ এ গেটওয়ে অব ডুয়ার্স ল্যান্ড অব মিউজিক ন্যাচারাল বিউটি অ্যান্ড হেরিটেজ।

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় ১৭৬৫ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত ময়নাগুড়ি ডুয়ার্স রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর ইংরেজদের অধিকারে চলে আসে। ১৮৬৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইংরেজদের অধীনস্থ হিসেবে পশ্চিম ডুয়ার্সের সদর দপ্তর হিসেবে ময়নাগুড়ি মান্যতা লাভ করে। সেই সময় মিস্টার এফ. এ. ডোনাফ ছিলেন অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার, পরবর্তীকালে মিস্টার জে. টুইডি মহাশয়। ১৮৮৩

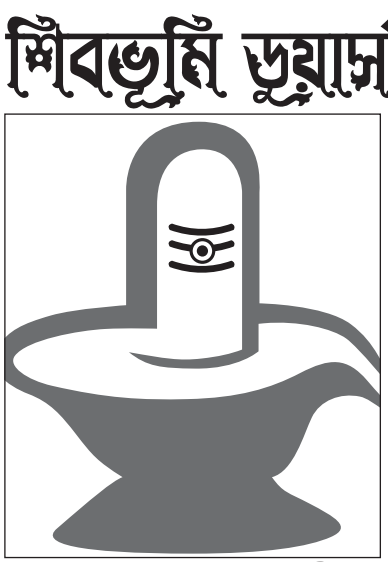

সালের ১ সেপ্টেম্বর ময়নাগুড়ি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। জলপাইগুড়ি জেলার প্রাচীনতম থানা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরনো ময়নাগুড়িকে উল্লেখ করা হয়েছে রত্নপীঠ যার অর্থ জল্পেশ, জটিলেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, বটেশ্বর, সোদরখই, এখানে ওখানে নমঃশিবায়। শান্ত সমাহিত শিবঠাকুরের বরাভয় রূপ সেই সঙ্গে দুর্লভ অসাধারণ কষ্ঠিপাথরে নির্মিত পেটকাটি মা। যত দেখবেন মনে হবে চোখ মেলে থাকি সারাক্ষণ। ময়নাগুড়িতে কোথাও না গেলেও ব্যাংকান্দি গ্রামে গিয়ে পেটকাটি মাকে প্রণাম করে আসি।

ময়নাগুড়ির পুরাতন ইতিবৃত্ত সুবিস্তৃতভাবে কেউ লিখে যান নি। শতবর্ষেরও বেশি প্রাচীন ময়নাগুড়ির পুরাতনী কথা স্মৃতির পাতায় মেলে ধরেছেন কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালের জলপাইগুড়ি শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তখন লিখেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার স্মৃতি চিত্রন যা এখন পাঠ করলে রোমাঞ্চ জাগে, কালীপদ লিখেছেন— "১৯৬৫ সালের আগে ময়নাগুড়ি ছিল বৈকুণ্ঠপুর জমিদারীর অন্তর্গত রংপুর জেলার অংশ। এখানে একটি কাছারী বাড়ী ছিল। ছোটো খাটো মামলা মোকদ্দমা হতো। টুইডি নামে এক ইংরেজ সাহেব এখানে অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার হয়ে আসেন। তখন ময়নাগুড়ি ছোট্ট জায়গা। সামান্য কয়েকটি বাড়ী ঘর। চারিদিকে ময়না গাছের জঙ্গল, জনবিরল। ম্যালেরিয়া, বন্য জন্তুর ভয়ে সন্ধ্যার পর বের হওয়া ছিল বিপদজনক। ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হলে টুইডি সাহেব আমার পিতাকে নিয়ে জলপাইগুড়ি আসেন। আমার পিতৃদেব ঢাকায় কালেকটারিতে কাজ করতেন। এখানে হলেন ডুয়ার্সের রেভিনিউ অফিসার। তখন রেল ছিল না। নৌকা, পাল্কি, ঘোড়ার গাড়ীতে তিস্তা পারাপার করতে হোত।"

ময়নাগুড়িতে সে সময় জমি ছিল অনেক অথচ লোক কম। অল্প কয়েকজন রাজবংশী জমি চাষ করত। অনেকে জোতদারে পরিণত হয়। ইংরেজ অনুগ্রহে এদের প্রতিপত্তি বাড়ে। জেলা বোর্ড একটি ডাক্তারখানা খুললেন। ওই একজন ডাক্তারই ভরসা। ধীরে ধীরে ময়নাগুড়ি ভুটান যাবার বা গিরিসংকট পর্যন্ত প্রশস্ত হয়। জরদা নদীর উপরে সেতু তৈরি হল। আর ময়নাগুড়ি নামকরণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ বলেন এক সময় এতদ অঞ্চলে প্রচুর ময়নাগাছ, মহুয়া গাছও ছিল। আবার পণ্ডিত বিদগ্ধ লেখকদের বক্তব্য এখানে রাজত্ব করেছেন ময়নামতী। ময়নামতী উপাখ্যানে তা উল্লেখ আছে। আমার অবিশ্যি দেখা কিম্বা পড়ার সুযোগ ঘটেনি। সুধী গবেষক পর্যটক যদি প্রামাণ্য নথিপত্র সহ আলোকপাত করতে পারেন তো চিরকৃতজ্ঞ থাকব। বলা হয়েছে একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি ভবানী দাসের ময়নামতী পুঁথির কিছু বিচিত্র তথ্যাদির সন্নিবিষ্ট আছে। ময়নামতীর স্বামী মানিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর নিজ পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র কার্যভার সামলান। গোবিন্দনগর কি তাঁরই সাক্ষ্য বহন করছে? হতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন গোপী চাঁদের প্রতিভূস্বরূপ রাজ্যশাসন করতে থাকেন। ময়নামতীর রাজধানী নাকি ত্রিস্রোতা নদীর তীরে ছিল।

ঐতিহাসিক সত্যতা নাকি গালগল্পের জটাজাল? কিংবদন্তীর আলখাল্লা যুক্তিতর্কের গোলক ধাঁধায় খেই হারিয়ে ফেলি। ময়নাগুড়ি আছে ময়নাগুড়িতে। আধুনিক নগর সভ্যতা, প্রযুক্তি বিদ্যার যুগে প্রাচীনত্বকে অন্বেষণ করা কঠিন। ময়নাগুড়ি প্রকৃতপক্ষে মন্দির নগরী তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। পর্যটনের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র বিন্দু।

মন্দির নগরী ময়নাগুড়ির অন্যতম দ্রষ্টব্য বা আকর্ষণ জল্পেশ মন্দির। দক্ষিণে রামেশ্বর, উত্তরে বারানসী, উত্তরাখণ্ডের কেদারবদ্রীর মতনই জল্পেশের মাহাত্ম্য সারা দেশে। প্রতিদিনই ভক্তবৃন্দের আনাগোনার বিরাম নেই। শ্রাবণী পূর্ণিমা, গুরুপূর্ণিমা, শিবচতুর্দশী-র দিনগুলিতে ভক্তদের যেন ঢল নামে। শ্রাবণ মাসে ভোলেবোম। গেরুয়া কাপড় পরিধান করে বাঁকে, কাঁধে পূণ্যতোয়া তিস্তার জল ঘটিতে ভরে খালিপায়ে অনেকে জল্পেশ মন্দিরে যাত্রা করেন। সারারাত্রি ভক্তবৃন্দের কোলাহল, হরহর মহাদেব। জয় জল্পেশ বাবা। আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। মন্দির প্রাঙ্গণে তিলধারণের

জায়গা থাকে না। নানা ধরনের মালা, জল্পেশ মন্দিরের ছবি, মণ্ডামেঠাই, প্যাঁড়া, বুন্দিয়ার পাহাড়। হুলুস্থুলু ব্যাপার। ধনাঢ্যশালা ব্যক্তি গরীব দুঃখীর জন্য খাদ্যবস্তু, বস্ত্র দান করে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। শত শত ভিখারি, পকেটমার, পর্যটকদের সমাগমে জল্পেশ সত্যি জমজমাট হয়ে ওঠে।

এবারে জল্পেশ মন্দির নির্মাণ গঠনের বিষয়ে দু'-চার কথা নিবেদন করছি। জল্পেশ মন্দির নিয়ে নানারকম কথাবার্তা শোনা যায়। জল্পেশ মন্দির সম্পর্কে প্রথম পাঠ শ্রী উপেন্দ্রনাথ বর্মণ মহাশয়ের লেখা একখানি ছোট গ্রন্থ তাতে অনেক তথ্যাদির সন্নিবেশ আছে। অনেক ভ্রামণিকের লেখাপত্রে জল্পেশ মন্দির সম্পর্কে

নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে। স্কন্দপুরাণ, কালিকাপুরাণ, যোগিনীতন্ত্রে আবার বলা হয়েছে তৃতীয় আহোম রাজা এই মন্দিরটি তৈরি করেছেন। কেউ কেউ বলেন কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ স্বপ্নাদেশ পেয়ে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দির নির্মাণকর্ম সমাপ্তি হয় প্রাণনারায়ণের সময়। মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্য অলংকরণ প্রশংসনীয়। মন্দির এলাকায় ভ্রামরীদেবী গণেশের প্রাচীনমূর্তি এবং ধর্মপালের সমাধি রয়েছে। গর্ভগৃহে স্বয়ং মহাদেব বিরাজিত। মন্দিরের উচ্চতা ১২৭ ফুট। বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মন্দিরের উপর দিয়ে গেলেও শিবঠাকুর অটল অবিচল। মহিমা অপার। মন্দির নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে না গিয়ে জল্পেশে জলপান চক্ষুপটে জ্বলজ্বল করছে। কম করে বছর চল্লিশ আগের স্মৃতি। মন্দির সংলগ্ন একটি ঘরে দেখি শীতল মেঝেতে চাটাই পেতে অনেকে খাচ্ছেন। উঁকি দিতেই একজন বললেন— 'আইসেন, বইসেন'। চমৎকার ব্যবস্থা। থালায় ভিজা চিড়া, টক দই, একদলা গুড়, ভুইত্যা কলা (আটিয়া কলা) দলা পাকিয়ে অনেকে খাচ্ছেন। আমিও পাত পেড়ে বসে পড়ি। আহা সে এক পরমানন্দ খাওয়া কোনওদিন ভুলতে পারব না।

সম্প্রতি জল্পেশ মন্দিরে গিয়ে দেখি রীতিমতন ভোল পাল্টে গেছে। সরকারি সাহায্যে, প্রশাসনিক তৎপরতায় মন্দির প্রাঙ্গণ, ভিতর বাহির যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন। ভক্তদের লাইনে দাঁড়ানোর জন্য সুবন্দোবস্ত, অতিথিশালাও তৈরি হয়েছে। যদি কোনও পর্যটক, ভক্ত মনে করেন মন্দিরে রাত কাটাবেন অবশ্যই থাকতে পারেন অনুমতি সাপেক্ষে। ময়নাগুড়ি থেকে জল্পেশ যেতে প্রায় ৪ কিমি দূরে বহু বছর অযত্ন অবহেলায় পড়েছিল বটেশ্বর বাবা। উদোম মাঠের চারিদিকে বাঁশঝাড়, ঝোপজঙ্গল। বহু মূল্যবান প্রস্তররাজি নানাবিধ অলংকরণে উৎকীর্ণ ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো। মন্দির ধুলিসাৎ। কে রাখে খবর তার। সাপখোপ ব্যাঙাচির বাসা। পচা জলে ভরতি। বটেশ্বর নিয়ে সে রকম প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা আজও হয় নাই। কয়েক বছর হল বটেশ্বরের কপাল ফিরেছে। চারিদিকে প্রাচীর। প্রবেশ পথে গেট। একজন পূজারী গোছগাছ করে ধুপধুনো নৈবেদ্য দিয়ে বটেশ্বরের পুজো করছেন। ভোলানাথ অল্পেতেই তুষ্ট থাকেন। বটেশ্বরের কথা সার্জেন ডেভিড ফিল্ড রেনীর স্টোরি অফ ভুটান ডুয়ার্স ওয়ারে উল্লেখ আছে। ইংরেজ সেনারা মন্দিরটিকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়, তাদের ধারণা ছিল মাটির নিচে ধনরত্ন রয়েছে। একদা এখানে ভুটানিদের আধিপত্য ছিল।

পর্যটনের প্রেক্ষাপটে ময়নাগুড়ির অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে রামসাই মেদলার দূরত্ব মাত্র ২৩ কিমি। কাছেই বাদুরবাগান। দিনের বেলায় দেখবেন অসংখ্য বাদুড় ঝুলে আছে। মেদলার নজরমিনার থেকে অনেকে গন্ডার, হাতি, বাইসন, পাখি দেখতে যান। মেদলা বড় সুন্দর জায়গা। অপরূপ সৌন্দর্য খনি। কাছেই কালীপুর গরুমারার একাংশ। আর কালামাটি, চটোয়া, বুধুয়া হয়ে অনায়াসে অরণ্য পথে পৌঁছে যাবেন গরুমারা জাতীয় উদ্যানের প্রাণকেন্দ্র লাটাগুড়ি। লাটাগুড়ি থেকে ক্রান্তি, কাঠামবাড়ি, গজলডোবা, আপালচাঁদ জঙ্গল, পশ্চিম ডামডিমের সদ্য গড়ে ওঠা বেড়ানোর নতুন ঠিকানা। আর কাঠামবাড়ির কাছে মাগুরমারি আদিবাসীদের পরিচালনায় সুন্দর ভিলেজ টুরিজম গড়ে উঠেছে।

শিবঠাকুরের যে কত নাম কেউ জানে না। কোথাও তিনি বানেশ্বর, জল্পেশ্বর, কোথাও অনাথনাথ, আবার হিরণ্যগর্ভ জটিলেশ্বর। অনেক ভক্ত প্রথমে জটিলেশ্বরে পুজো পাঠ সেরে জল্পেশে পুজো দিতে যান। জল্পেশ থেকে সরাসরি জটিলেশ্বরে যাবার আলাদা রাস্তা রয়েছে কিন্তু মোটেও মসৃণ নয়। চারচাকা, দু' চাকা, ভ্যান রিক্সা, টোটো, অটোতে যাওয়া যায়। আমার বেশি পছন্দ হুসলুডাঙা মল্লিকের হাট হয়ে। প্রথম দর্শন মনে পড়ে। গ্রীষ্মের দাবদাহে হুসলুডাঙা নেমে সারি সারি কাঁঠাল গাছের মাঝখান দিয়ে পথ। গোড়া থেকে আগা কাঁচাপাকা কাঁঠাল। মনোরম পথ ভোলার নয়। পদ্মদীঘির পাশে জটিলেশ্বর মন্দির। অনেকে পূর্ব ডহর বলে থাকেন। যার অর্থ পূর্ব অর্থাৎ প্রথম এবং ডহর মানে উপাসনা। কথিত আছে শিবের অনুচর নন্দী এখানে সিদ্ধিলাভ করেন। জটিলেশ্বর মন্দির নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কারুর মতে কোচরাজা, কেউ বলছেন ভোটান রাজা আবার অনেকের মতে যিনি জল্পেশ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাঁরই কৃতিত্ব। আর কিংবদন্তী বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মাই এই মন্দির তৈরি করেছিলেন।

বহু বছর জটিলেশ্বর এক প্রকার অরক্ষিত, লোকচক্ষুর অন্তরালে, অনাদরে অবহেলায় প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। জটিলেশ্বর মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্য বিষয়ে কিছু বলা যাক। পদ্মপুকুরের পাশ দিয়ে মন্দির চত্বরে ঢুকলে দেখতে পাবেন প্রস্তর খোদিত দ্বার পালের মূর্তি। নানান দেবদেবীর মূর্তি। নৃত্যরতা নারী মূর্তি প্রস্তরে অলংকৃত পরম বিস্ময় জাগায়। মন্দির সংলগ্ন পদ্মপুকুরে খনন করে প্রচুর দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে এবং সুরক্ষিত আছে রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালায়। পণ্ডিত, গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা মন্দিরের কারুকার্য ও গঠনশৈলী গুপ্ত আমলের। মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ। ভক্তবৃন্দ সেখানে ফুল, বেলপাতা, দুধ, নকুলদানা, বাতাসা এইসব দিয়ে পুজো করেন। পুরোহিতমশাই নিষ্ঠাভরে পুজোপাঠ করেন। একদা গর্ভগৃহের কুলুঙ্গিতে অনেক দেবদেবীর মূর্তি ছিল। স্থানীয় লোকজনের ধারণা মন্দিরে সর্পকুলেরা নির্ভয়ে বসবাস করছে। শুরুতে মন্দিরের পুজোপাঠ করতেন এক ব্রহ্মচারী। তিনি কোথা থেকে, কীভাবে এসেছিলেন তা আজও রহস্যময়। ব্রহ্মচারী একাকী থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর পর মন্দির তল্লাটে আগাছায় ভরে যায়। লোকজন কদাচিৎ যাওয়া আসা করত। অনেক পরে উৎকলবাসী একজন পুরোহিত পুজোপাঠ শুরু করেন। জটিলেশ্বরের পুজো খুব সহজ সরল— দই, কলা এবং পাঁচটি রঙিন নিশানা নিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণ্য রীতিমতে নৈবেদ্য সাজিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। বর্তমানে জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত স্থানীয় মানুষজনের আন্তরিক চেষ্টায় জটিলেশ্বরের চাকচিক্য সহস্রগুণে বেড়েছে। মন্দিরে প্রবেশের জন্য টিকিট কাটতে হয়। বসার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন কমবেশি ভক্ত, পর্যটক, পথিকরা পুজো মানত করে যান। বট পাকুড়ের গায়ে রঙিন সুতো বেঁধে যান যাতে মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

জল্পেশ জটিলেশ্বরের থেকেও আরও যেন রহস্যময় অপরূপা সুন্দর পেটকাটি মা। ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া হাসপাতালপাড়া হয়ে কিছুটা গেলে মরাখাওয়া নদী পার হয়ে থেলথেলা ব্যাংকান্দি গাঁয়ে পেটকাটি মায়ের অবস্থান। গেটওয়ে অব ডুয়ার্স নামক গ্রন্থে সম্রাট চক্রবর্তী লিখেছেন— পেটকাটি মা কয়েকশো বছর আগের বজ্রতন্ত্র সাধনার প্রতীক। বুদ্ধদেবের মুখের আদলে মূর্তিটির অস্থিচর্মসার। কাটা পেটে একটি বৃশ্চিক বসে আছে। উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট দৈর্ঘ্য ২ ফুট ৭ ইঞ্চি চওড়া।

হাতে রয়েছে হাতিকঙ্কাল, ঘণ্টা, ডমরু। মাথার উপরে হাতি। পায়ের তলায় একজন নারী। একদিকে শেয়াল, প্যাঁচা, মাথায় সাপের মুকুট। এছাড়া সাপ ছড়িয়ে আছে অঙ্গ জুড়ে। পেটকাটি মায়ের মন্দিরের গঠন কারুকার্য তেমন কিছু নেই। প্রথম দর্শনের স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল। প্রায় উন্মুক্ত মাঠে ছোট টিনের চালা বাড়িতে পেটকাটি অবস্থান করছেন। দুর্লভ কষ্টিপাথরে নির্মিত মূর্তিটি এক প্রকার অরক্ষিত অনাদরে পড়েছিল। তবে গ্রামবাসীরাই রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বড়ই জাগ্রতাদেবী। পেটকাটির কাছেই সোদরখই মন্দির। যথাযথ দেখভালের অভাবে বটেশ্বরের মতন সোদরখইয়ের বড় দুরবস্থা। স্থানীয় মানুষজন খুবই উদাসীন। সোদরখইয়ে এখন কিছু প্রস্তরখণ্ড ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। একদা সোদরখই মন্দিরে ছিল কুলুঙ্গী সুড়ঙ্গ। অনেকে বলে থাকেন এখানে জল ঢাললে জল্পেশে শিবঠাকুরের মাথায় গিয়ে পড়ত। এখানে মস্ত বড় চ্যাপ্টা পাথর ছিল। বলা হত ধোপার পাট।

মন্দিরনগরী ময়নাগুড়ির অনবদ্য মন্দির ধুমবাবা। স্থানীয় লোকেরা বলেন ভদ্রেশ্বর বাবা। সবুজে শ্যামলে চন্দ্রাতপের ছায়ায়, মেঠোপথে, দু'পাশে ধানখেত, আম, কাঁঠাল, সুপারি, তেজপাতা গাছ। মন্দিরের গাছে ছাতিম, মহুয়া, বট পাকুর। শান্ত নির্জন। একেবারে নিরিবিলি পরিবেশ। পাশেই নিউ দোমোহনি রেল স্টেশন। গাঁয়ের চাষাভুষো লোক, গোবর কুড়ানিরা বসে আছে। পাখির কলরবে মুখর। ময়নাগুড়ি গেলেই দু' দন্ড ভদ্রেশ্বরে কাটিয়ে আসি। ময়নাগুড়ি শহর থেকে বার্নেশ বাকালি যেতে দেখতে পাবেন গ্রামীণ পরিবেশে মল্লিকদের প্রযত্নে ভাগুানীদেবীর মন্দির। দুর্গা পুজো শেষ হলেই ভাগুানী মায়ের পুজো শুরু হয়। তিস্তা পাড়ের রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্যতম আরাধ্য, ভাগুারীদেবী। কৃষিভিত্তিক রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতিকে জানতে হলে ভাগুানী দর্শন জরুরি। মন্দির খুবই সাদামাটা। উৎসবে দূর দূরান্তর থেকে ভক্তের আনাগোনা শুরু হয়। বিরাট মেলা বসে। বাকালি গাঁয়ে দেখবেন পুরাতন মসজিদ। ১৮৮৩ সালে এই মসজিদে আসতেন পল্লীগীতি গায়ক আব্বাসউদ্দিন, নজরুল গানের গায়িকা ফিরোজা বেগম বাকালির গাঁয়ের গৃহবধূ।

সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে ময়নাগুড়ি হেলাফেলার নয়। ময়নাগুড়ির সঙ্গে আমার প্রথম যোগসূত্র সত্তরের দশকে স্থানীয় পত্রিকা পাবকের মাধ্যমে। সম্পাদক সতী সেনগুপ্ত। উনি থাকতেন ময়নাগুড়ির কাছে সরকারি কৃষিখামার বাড়ির কাছে। পেশায় শিক্ষক কিন্তু নেশায় ছিল লেখালেখি। লিটল ম্যাগাজিন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকা। অভাব, দারিদ্রের সংসারেও হাসিখুশি, প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন। তাঁরই ডাকে বারবার ময়নাগুড়িতে ছুটে যাওয়া। সতীবাবুরই ছাত্র আজকের স্বনামধন্য লেখক সমরেশ মজুমদার। সতীবাবুই ছিলেন তাঁর লেখালেখির উৎসাহদাতা। সতীদার পাশাপাশি পরিচয় হয় শিল্পী, কবি, রাখাল রায় চৌধুরী। উত্তর সৈকতের প্রিয় কুসুম। হাতুরী পত্রিকার দিলীপ, দোমোহনির নীতীন সেনগুপ্ত। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত 'আলতারাফ'। আজ সবই বন্ধ। সকলেই ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন। জানা নেই ময়নাগুড়ি থেকে এখন লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় কিনা।

পর্যটনের প্রেক্ষাপটে ময়নাগুড়ির অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে রামসাই মেদলার দূরত্ব মাত্র ২৩ কিমি। কাছেই বাদুরবাগান। দিনের বেলায় দেখবেন অসংখ্য বাদুড় ঝুলে আছে। মেদলার নজরমিনার থেকে অনেকে গন্ডার, হাতি, বাইসন, পাখি দেখতে যান।

মেদলা বড় সুন্দর জায়গা। অপরূপ সৌন্দর্য খনি। কাছেই কালীপুর গরুমারার একাংশ। আর কালামাটি, চটোয়া, বুধুয়া হয়ে অনায়াসে অরণ্য পথে পৌঁছে যাবেন গরুমারা জাতীয় উদ্যানের প্রাণকেন্দ্র লাটাগুড়ি। একদা লাটাগুড়ি রেল স্টেশন থেকে রামসাই পর্যন্ত গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে রেলগাড়ি যাতায়াত করত। লাটাগুড়ি থেকে ক্রান্তি, কাঠামবাড়ি, গজলডোবা, আপালচাঁদ জঙ্গল, পশ্চিম ডামডিমের সদ্য গড়ে ওঠা বেড়ানোর নতুন ঠিকানা। আর কাঠামবাড়ির কাছে মাগুরমারি আদিবাসীদের পরিচালনায় সুন্দর ভিলেজ টুরিজম গড়ে উঠেছে। পাশেই আনন্দপুর, কৈলাসপুর চা-বাগান।

ময়নাগুড়ি দুর্গাবাড়ি থেকে মাত্র তিন কিমি দূরে মোয়ামারি। গ্রামীণ সৌন্দর্য, বাঁশের তৈরি অনিন্দ্যসুন্দর কটেজ। বিবিধ শিল্পকলা দেখে আপনার মন আনন্দে ভরে উঠবে। উত্তরবঙ্গ কেন দক্ষিণবঙ্গেও কোথাও চোখে পড়ে না শুধুমাত্র বাঁশ দিয়ে যাবতীয় সৃষ্টি খাট, ড্রেসিং টেবিল, সোফা, বেড়া সব। আলাভোলা শিল্পী রঞ্জু রায় একনিবষ্ট মনে কাজ করে চলেছে। চোখ জুড়ানো সুন্দর সুন্দর কাটুম কুটুম। দুর্গা বাড়ি থেকে মোয়ামারির পথটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দু'পাশে ধান, পাটখেত। ঘন বাঁশবন। সারি সারি তেজপাতা গাছের ভিতর দিয়ে, পুকুরের পাশ দিয়ে গেলে টিলার উপরে কয়েকটি কটেজ যেন ছবির মতন সেঁটে আছে। সাদামাটা আহার। গোয়াল ভরা গরু, পুকুরে বড়শি, জাল ফেলে মাছ ধরা। রুই, কাতলা, চিতল, কই নানারকমের মাছ পাওয়া যায়। খেতের চাল, অনাবিল শান্তি। জানালা, উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখবেন রেলগাড়ি ছুটে চলেছে সত্যি। স্বর্গপুরী।

মোয়ামারিতে অন্তত দুটি দিন অতিবাহিত করুন। প্রাণ ভরে দেখুন, উপলব্ধি করুন রাজবংশী সমাজ, সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা অর্জন করুন তিস্তাবুড়ির গান। বৈরাতি নাচ, বিষহরি, চোরচুন্নি মেচিয়া গান, সবার উপরে ভাওয়াইয়া গান। উত্তরবঙ্গের প্রাণের সম্পদ। দেখবেন শুনবেন দোতারা, বাঁশি, সারিন্দার মুর্চ্ছনা। চেখে দেখুন লাফা শাকের প্যালকা, ছ্যাকা, সিদলের নানাবিধ পদ। বেড়াতে এসে স্থানীয় মানুষজনের প্রাণখোলা হাসি, ব্যবহার, খাদ্য পানীয়র সঙ্গে পরিচয় না করলে বেড়ানো সত্যি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ময়নাগুড়ি থেকে হাঁটা পথ কিম্বা টোটো অটো না হলে চারচাকায় চেপে চলুন দেখে আসি খুকশিয়া পুষ্প উদ্যান। প্রায় ৩২ বিঘা জমির উপরে খুকশিয়া উদ্যানটিকে বনদপ্তরের পার্কস অ্যান্ড গার্ডেনস চমৎকার সাজিয়ে গুছিয়ে অনুপম সৌন্দর্য নিকেতন গড়ে তুলেছে। কত গাছ যে এখানে রয়েছে তার হিসেব নেই। দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, বটলব্রাস, জ্যাকারান্ডা, শাল, সেগুন, গামহার, বোগেনভিলা, মুসান্ডা রঙ্গন, হার্ডঞ্জিয়া, নানা রকমের জবা। মধ্যিখানে নরম সবুজ ঘাস যেন জাজিম পাতা। সবার সেরা টলটলে সরোবর। সন্ধ্যায় রঙিন ফোয়ারা, শব্দ ঝঙ্কার, বোটিং। মনে হবে স্বপ্নপুরী। রয়েছে চমৎকার রেস্তোরাঁ। আমাদের দুর্ভাগ্য দেখভালের অভাবে খুকশিয়া হতশ্রী বাঞ্ছারামের বাগানে পরিণত। জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত এ ব্যাপারে কি উদাসীন? একটু জিরিয়ে নিন। চা, জলযোগ করুন। ইচ্ছে করলে রাত্রি যাপন করতে পারেন। সরস্বতী পুজোর সময় খুকশিয়াতে বিশাল মেলা বসে। খুকশিয়া শব্দের অর্থ ঘোড়ার পিঠে রাজকুমার। দেখবেন তখন ভাপা পিঠে খাওয়ার ধুম।

ময়নাগুড়ি থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার সফর তিনবিঘা করিডর। জামালদহ সৎসঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে একটু উঁকিঝুঁকি দিলেন চ্যাংরাবান্ধা থেকে বাংলাদেশের বুড়িমারী, লালমণিহাট, রংপুর। বাংলাদেশের হৃদয় নিঙরানো চিত্রপট। চ্যাংরাবান্ধা থেকে মেখলিগঞ্জ হয়ে তিনবিঘা করিডর। দহগ্রাম ও পাট গ্রামের বাংলাদেশীরা ভারত ভুখণ্ডের ভিতর দিয়ে আসাযাওয়া করেন। এপারে বিসএফ ওপারে বিডিআর। দু' দেশের পতাকা উড়ছে। অনেকেই দেখতে যান, যদিও কাঁটাতারের বেড়া তিনবিঘা থেকে কুচলিবাড়ি হয়ে ধাপরা। আগামী দিনে ওয়াঘার মতন আরও সুন্দর করে সাজানো গোছানো হবে। আসলে দেখার শেষ নেই। মন্দিরময় ময়নাগুড়ি বেড়ানোর পরিকল্পনা করে ফেলুন। সবিস্তারে জানতে হলে ভ্রমণ সাথী পেতে হলে যাবতীয় খোঁজ খবরের জন্য যোগাযোগ করুন উজ্জ্বল শীলের সঙ্গে। বহু বছর ধরে ময়নাগুড়ি বেড়ানোর জন্য পর্যটকদের সাহায্য করে চলেছে। খুবই অমায়িক, প্রকৃত বেড়ানোর সাথী। চলভাষ ৯৪৩৪৪১২৫১৭।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ডুয়ার্সের হেথা হোথা

মালেশ্বর

কয়েকবার গ্রামগ্রামান্তরে চক্কর কাটার পর মনে হল একটু শহরে যাই। অমনি মনে পড়ল মালের কথা, মানে মালবাজারের কথা। এই শহরের ভৌগোলিক অবস্থান খুবই চমৎকার। পরিমল মিত্র নামাঙ্কিত কলেজ পেরিয়ে, নদী টপকে 'রায় এন্ড কাজিন'— চমৎকার পেট্রোলপাম্প-ক্যাফেটেরিয়া ছুঁয়ে দক্ষিণ বরাবর চলা। তারপর হনুমান মন্দিরের কাছাকাছি একটা নব্বই ডিগ্রি পশ্চিমমুখো টার্ন। শুরু হয়ে গেল আসল মালবাজার। ক্যালটেক্স মোড় থেকে সুপরিচিত মালবাজার পার্ক পর্যন্ত রাস্তার দক্ষিণ দিকটাই মালবাজারের মূল জনবসতি। উত্তরদিক জুড়ে কেবল সৌন্দর্য আর সৌন্দর্য। তবে দোকান-বাড়িতে ঢাকা পড়ার কারণে সে সৌন্দর্য দেখতে হলে আপনাকে শহরে ছাড়িয়ে ওদলাবাড়ির দিকে হাঁটা দিতে হবে।

কারণে-অকারণে মালবাজার অনেকবার গেছি। শেষবার রাত কাটান কয়েক বছর আগে পার্কের কাছাকাছি এক হোটেলে। কাক ভোরে হোটেল থেকে হাঁটতে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম নিউ মাল জংশন। সেপ্টেম্বরের ভোর বেলায় কমবেশি দেড় কিলোমিটার রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে সেদিন মনে হয়েছিল, একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে পারলে মালবাজারে ছুটি কাটাতে ছুটে আসা লোকের অভাব হবে না। সত্যি বলতে কি, মালবাজারের পথঘাট বহুকাল পর্যন্ত ছিল বেশ বেদনাদায়ক। সন্ধের পর খানিকটা ভুতুড়ে। এর কারণটা ছিল পথবাতির অভাব। কিন্তু সে সব দিন এখন অতীত। সম্প্রতি যাঁরা মালবাজার ঘুরে এসেছেন, তাঁরা বলছিলেন মালবাজারে নাকি দারুণ কাজ হচ্ছে। পুরসভা নাকি ঝাঁ চকচকে করে ফেলেছে শহরটাকে।

চকচকে যে হয়েছে তা দিনের আলো নেভার পর মালবাজারে ঢুকলে বেশি নজরে পড়বে। আলো ঝলমলে পথ দিয়ে শহরে ঢুকতে ঢুকতেই বোঝা যাবে রাস্তার চেহারাই পাল্টে গেছে। একদা দক্ষিণ কলোনির গর্তবহুল রাস্তাগুলি এক এক করে উধাও। পর্যাপ্ত পথবাতি। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু হয়ে গেছে, তবে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নিয়ে নাকি সমস্যা পুরোপুরি কাটে নি। নদীর কাছাকাছি একটা জায়গা বাছা হয়েছে কিন্তু সেটা নদী থেকে আইনসম্মত ভাবে দূরত্বে কি না তা নিয়ে বিতর্ক ওঠার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে শুনলাম।

শহরে ঢুকে কোনও এক জায়গায় চা খেতে খেতে পুরসভার গুণমুগ্ধদের প্রশংসা বাক্য শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কোথাও কোনও অভিযোগ নেই? অভিযোগ নেই কথাটা সত্যি নয়। পুরসভায় বিরোধী কাউন্সিলার

আছেন। তাঁদের যে সব কিছু পছন্দের, তা-ও নয়। কিন্তু তাঁরা মুখ খোলেন না। কেন খোলেন না— সে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে মনে হল, কেউ একটু অন্য সুরে গাইতে হয়ত ভয় পায় পাছে সে অপছন্দের লোক হয়ে দাঁড়ায়! আবার মনে হল, এ নির্ঘাৎ বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা। মালবাজার কি আগে এমন আলোঝলমলে, ঝকঝকে-তকতকে ছিল?

তখনই নজরে এল একটা শিবমূর্তি। বেশ কয়েক ফুট লম্বা। পদ্মাসনে বেদির ওপরে বসে আছেন। তাম্রবর্ণ শিবের চারদিকে রকমারি আলো। রাস্তার পাশে খানিকটা জায়গা বেশ ঝলমল করছে সে আলোয়। জল্পেশ্বর-জটিলেশ্বর-বানেশ্বরের দেশে ইনি কি মালেশ্বররূপেন সংস্থিত?

এই শিবকে তো আগে দেখি নি? কে বসাল? নিশ্চই কোনও ব্যবসায়ী সমিতি বা ক্লাব? নাকি মালবাজারের মানুষ চাঁদা তুলে শিবমূর্তি বসিয়েছেন? পাশের লোকটিকে জিগ্যেস করলাম, 'মূর্তিটা কোথাকার?'

'ত্রিপুরার শিল্পী বানিয়েছেন। ছ-সাত লাখ টাকা দাম।'

'কারা বসিয়েছেন? বেশি দিন হয় নি নিশ্চয়ই?'

'এই তো সপ্তাহ কয়েক হবে। কাগজে পড়েন নি? পুরসভা বসিয়েছে।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ও আচ্ছা।' মনে মনে ভাবলাম, লোকটা কিস্যু জানে না। পুরসভা কেন শিবের মূর্তি বসাবে? এটা মোটেই পুরসভার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। ভারতবর্ষের কোনও পুরসভা দেবতার মূর্তি স্থাপন করেছে বলে আমার জানা নেই।

মিনিট কয়েক বাদে আরেকজনের সঙ্গে নতুন মালবাজার নিয়ে কথা শুরু করতেই তিনি বললেন, 'শিবের মূর্তিটা দেখলেন?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। একজন আবার বললেন সেটা নাকি পুরসভার কাজ!'

'তাই তো!' তিনি মুচকি হেসে বললেন। 'পুরসভাই তো বসিয়েছে।'

'বলেন কী? আপনারা বলেন নি কিছু?'

'কে বলতে যাবে?' তিনি কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়ে যান। 'আলো আর রাস্তা দেখে লোকাল পাব্লিক সব ভুলে গেছে। এই শিব নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির চাপ আছে!'

বলেই তিনি কোথায় জানি চলে গেলেন। আমি হতভম্ব হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

হতভম্ব হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। পুরসভার আওতায় থাকা কোনও পুরনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে পুরসভা সুন্দরভাবে সাজাতেই পারেন। কিন্তু সরকারের এমন কোনও প্রকল্প বোধ হয় নেই, যার টাকায় পুরসভায় শিব ঠাকুরের মূর্তি কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে বসান যায়। জনগণের পুরকরের টাকা দিয়েও এটা করা যায় না।

তা হলে মালবাজার পুরসভা এটা কী করল?

ধন্ধ কাটাবার জন্য ফোন করলাম এক সিনিয়রকে। তিনি দশ বছর অন্য এক পুরসভার উপপৌরপতির পদ সামলেছিলেন এবং ২৫ বছর ধরে কাউন্সিলার। পুর আইন বিষয়ে তাঁর রীতিমত জানকারি। ফোনের ওপার থেকে তিনি সহাস্যে জানালেন, 'কোনও ভাবেই পারে না। এটা দেশের সংবিধানের পরিপন্থী। আরটিআই করে জানা দরকার যে মালবাজারের পুরপ্রধান কোন খাতের টাকা এখানে লাগিয়েছেন। বাকি কাউন্সিলারেরা কেউ প্রতিবাদ করেন নি?'

সত্যিই তো! ফোন কেটে আমি ভাবতে লাগলাম। রবি ঠাকুরের মূর্তি হলে ঠিক ছিল। কিন্তু শিবঠাকুর কী ভাবে? আচ্ছা! মালবাজারে রবি ঠাকুরের মূর্তি নেই? একজন জানালেন, 'আছে তো। একটি বালিকা বিদ্যালয়ের আড়ালে ধুলি-ধুসরিত অবস্থায় চূড়ান্ত অপমানে বেগুনি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে শিবঠাকুরের জায়গায় এনে বসান যেত না? মোকদ্দমা কেউ ঠুকল বলে'!

জানা গেল যে একটি অডিটোরিয়াম হচ্ছে। সেখানেই হয়ত সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হবেন রবি ঠাকুর। কয়েক দিন আগেই রিমোট কনট্রোল পদ্ধতি ব্যবহার করে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন বাস টার্মিনাসের। সেটাও বেশ চমৎকার দেখতে। তবে এসব নির্মাণ দেখা ভাল উদ্বোধনের এক বছর পর। কারণ আমাদের রাজ্যে নির্মাণ হয়, দেখভাল হয় না। আমরা যত্ন নিতে শিখিনি।

মালবাজারের চারপাশে হাজারো দর্শনীয় স্থান। কিন্তু মালবাজারের দুর্ভাগ্য হল পর্যটকদের অধিকাংশ এই শহর ছুঁয়ে অন্য কোথাও চলে যান। থাকেন কম।

এই শহরকে কেন্দ্র করে অনায়াসে চলে যাওয়া যায় লাটাগুড়ি-সেবক-গাজলডোবা-বিন্দু। এখানে পর্যটককে রেখে ঘুরিয়ে আনার ব্যাপারে কেউ কিছু ভেবেছে এখনও? পুর এলাকায় কর্মসংস্থানের যে বিরাট সুযোগ, পর্যটনকে কেন্দ্র করে, এখানে মনে হল ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাতে হবে।

এই শহরকে কেন্দ্র করে অনায়াসে চলে যাওয়া যায় লাটাগুড়ি-সেবক-গাজলডোবা-বিন্দু। এখানে পর্যটককে রেখে ঘুরিয়ে আনার ব্যাপারে কেউ কিছু ভেবেছে এখনও? রাস্তাঘাট-আলোকসজ্জা এখন আর উন্নয়ন নয়, স্বাভাবিক চাহিদা। পুর এলাকায় কর্মসংস্থানের যে বিরাট সুযোগ, পর্যটনকে কেন্দ্র করে, এখানে মনে হল ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাতে হবে। বিগবেন টাওয়ার ভাল, আরও ভাল সুলভ শৌচালয়।

সেদিন রথযাত্রা। মেলার মাঠ থেকে ঘুরে এসেছি। খেয়েছি চমৎকার জিলিপি। রাতের অন্ধকারে ফিরে যাচ্ছি লাটাগুড়ি-রাজাডাঙ্গা রোড ধরে। এ রাস্তা বহু পুরনো। সুগভীর অরণ্যের মাঝখান দিয়ে একদা এই রাস্তা ধরে পথিক যাওয়া আসা করত মালবাজার থেকে লাটাগুড়ি। সেকাল চলে গিয়েছে চিরকালের জন্য। অরণ্য এই রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে। কিঞ্চিৎ উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ায় গাড়িতে যেতে যেতে ভাবছিলাম নতুন শিবঠাকুরের কথা।

ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ বলতে সরকার কোনও ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাবে না। প্রতিটি পুরসভা একটি লোকাল গভর্নমেন্ট। তার কোনও এক্তিয়ার নেই এলাকায় শিব বা বিশেষ ধর্মের বিশেষ কোনও চিহ্ন স্থাপন করা। যদি সত্যিই মালবাজার পুরসভা কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে তাম্রবর্ণের শিবমূর্তি স্থাপন করে থাকেন, তবে তা নিয়ে মালবাজারে কোনও প্রতিবাদ সমালোচনার ঝড় ওঠেনি কেন?

পুরসভা কোনও ব্যাখ্যা দেবেন কি? কারা যেন শুনলাম কলমে শান দিয়ে ড্রাফট লিখছে।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

ডুয়ার্সের হাটে মুদির দোকানগুলিকে বলে গালামালের দোকান। শালগুড়ি গ্রামের হাটে সব চাইতে বড়ো গালামালের দোকানের মালিক রাধাকান্ত বর্মন বউশাসিত, ছেলেমুগ্ধ নিরীহ মানুষ। ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে বাজারে চক্কর মারেন। দুনিয়ার খবর জানার চেষ্টা করেন। বাড়ির গোডাউন থেকে দোকানে মালপত্র আনার দায়িত্বে থাকা কর্মচারিটির মৃতদেহ একদিন ভেসে উঠল বাড়ির খানিকটা পেছন দিয়ে বয়ে যাওয়া জর্দা নদীতে। বিমর্ষ রাধাকান্তবাবু ঠিক করলেন কর্মচারির পরিবারটিকে কিছু টাকা দেবেন। কিন্তু সে ছেলেটি কোথায়? বাজারে খোঁজখবর করতে করতে রাধাকান্তবাবু অজান্তে এসে দাঁড়ালেন এক রহস্যপুরির দরজায়। কিন্তু তিনি তো গোয়েন্দা নন। কোনও রকমে মোবাইল থেকে ফোন করতে পারেন মাত্র। তা হলে? তা হলে পড়তে হবে

লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর

অরণ্য মিত্রের নতুন রহস্য কাহিনী। সেপ্টেম্বর থেকে ধারাবাহিক ভাবে।

বংকুলুং কুলেনবাড়ি

সঙ্গে আরও কিছু

অ্যাডভেঞ্চার চেখে দেখতে যাঁরা পাহাড়ে যান, ইকো পর্যটনের প্রসারে যাঁরা ফাইভ স্টারের ব্যাঙ্কোয়েটে ঘাম ঝরান, তাঁরা 'কুলেনবাড়ি' নামটা শুনেছেন কেউ কখনও? না শোনারই কথা। আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে, আমাদের পর্যটনের প্রাণকেন্দ্র সবুজ ডুয়ার্সের গা ঘেঁষে, আমাদের হিমালয়ের কোলেই রয়েছে এই কুলেনবাড়ি। ভোটের মানচিত্রে অবশ্য এর কোনও অস্তিত্ব নেই। এই 'অস্তিত্বহীন' হ্যামলেটটির জীবন কাহিনি অবাস্তবতায় ভরা। শুনে মনে হতে পারে গালগল্প পাড়ছি।

মানুষ যখন ভোটের অধিকার পায় না তখন রাষ্ট্রের কাছে সে অস্তিত্বহীন। ফলে তাদের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া নিয়ে তারই দেশ তথা তারই জন্মভূমির কোনও মাথা ব্যথা নেই; এও সম্ভব। হয়ত জনসংখ্যা বেশি হলে ভাবা গেলেও যেতে পারত, কিন্তু মাত্র ঊনিশটা পরিবার, তাতে ছোটবড় মিলে মোটামুটি সত্তর জন মানুষ, তাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানেই হয় না। থাকলেই কী আর গেলেই বা কী! সম্প্রতি বংকুলুং বেড়াতে গিয়ে 'জঙ্গল ক্যাম্প' এ নাইট স্টে করে পরদিন সক্কালবেলা লাগোয়া পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোনালি রোদ্দুর গায়ে মাখতে মাখতে অশ্বিনীবাবু আর কল্যাণবাবুর কাছে এই গ্রামের গল্প শুনছিলাম। সুখী সুখী জীবনযাপন করে অভ্যস্ত আমরা ধারণাও করতে পারব না কী কঠিন একটা জীবন অতিবাহিত করে চলেছে এই প্রাণগুলি।

বর্ষা যখন উত্তাল হয়, শিল্পী-সাহিত্যিকরা মেতে ওঠেন সৃষ্টিশীলতায়, কত বন্যা ত্রাণের খবর ফলাও করে ছাপা হতে থাকে খবরের কাগজের পাতায় পাতায় তখন এই কুলেনবাড়ি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি দ্বীপে পরিণত হয়ে যায়; যার খবর আমরা কেউ রাখি না। ঊনিশটা পরিবার বুড়ো বাচ্চা মহিলাসহ একলা হয়ে যায় গোটা পৃথিবী থেকে।

কুলেনবাড়ি থেকে অনেকটা গেলে বালাসন নদী। তার ওপর কেবল টিমটিমে একটা ব্রিজ যেটা 'দুধে'র (দুধিয়া) সঙ্গে জুড়ে রেখেছে কুলেনবাড়িকে। বর্ষা যখন উত্তাল হয়, শিল্পী-সাহিত্যিকরা মেতে ওঠেন সৃষ্টিশীলতায়, কত বন্যা ত্রাণের খবর ফলাও করে ছাপা হতে থাকে খবরের কাগজের পাতায় পাতায় তখন এই কুলেনবাড়ি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি দ্বীপে পরিণত হয়ে যায়; যার খবর আমরা কেউ রাখি না। ঊনিশটা পরিবার বুড়ো বাচ্চা মহিলাসহ একলা হয়ে যায় গোটা পৃথিবী থেকে। ওই একটি মাত্র ব্রিজ তলিয়ে যায় বালাসনের অনেক নীচে। একমাত্র কার্শিয়াং থেকে নীচু পথে পায়ে হেঁটে চলতে থাকলে তিন ঘণ্টা পর পৌঁছনো যায় এই গ্রামে। ভাববেন যে, তাহলে তো হয়েই গেল। বিশেষ সমস্যার তো কিছু নেই, ওখান দিয়েই যাতায়াত করবে। কিন্তু না। একেবারেই না। এই পথ আমাদের দেখা কোনও রাস্তার মত নয়। যাঁদের ট্রেকিংয়ের অভিজ্ঞতা বা অভ্যেস আছে তাঁরা বুঝবেন হয়ত কিছুটা। এই রাস্তা প্রকৃত অর্থে কোনও রাস্তাই নয়। ফলে যানবাহনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। শুধুমাত্র পদযাত্রা। তাই সারা বছরের খাওয়া পরার জন্য ওই ব্রিজটার ওপর দিয়ে অনেকটা দূরের 'দুধে' (দুধিয়া) ওদের বেঁচে থাকার একমাত্র রসদ জোগানদার। বর্ষায় সেটুকখানিও মুছে

বংকুলুং থেকে মিরিক যাওয়ার রাস্তা

বংকুলুং-এ জঙ্গল ক্যাম্প

বালাসন নদী বংকুলুং ক্যাম্প থেকে

যায়। ব্যস্। সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে হয় প্রায় চারটে মাস।

একদৃষ্টে গ্রামটাকে দেখতে দেখতে ঝরঝর করে কৌতূহলী প্রশ্ন বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে। তাহলে ছোটরা লেখাপড়া করে কীভাবে? উত্তরটা শুনলে আমার মত আপনারাও চমকে উঠবেন। ওদের পড়াশুনো করতে হলে একমাত্র উপায় কার্শিয়াংয়ের কেরাবাড়ি যাওয়া। ওটাই ওদের সবচেয়ে কাছের প্রাইমারি স্কুল। দুধিয়া তো বছরে প্রায় মাস চারেক বন্ধই হয়ে যায়। কিন্তু কেরাবাড়ি যাবে কীভাবে? পায়ে হেঁটে ছাড়া তো কিচ্ছু নেই! তাও আবার তিন ঘণ্টার পথ। ছোট ছোট শিশুরা তাই পড়াশুনো শেখে না। আট-দশ বছর বয়সে যখন তারা একলা হেঁটে চলার উপযুক্ত হয় তখন বাপমায়ের কেউ কেউ কার্শিয়াংয়ে পাঠায়, ক্লাস ওয়ানে ভরতি হয় ওই বয়সেই। কিন্তু বেশিরভাগের পক্ষেই বেশিদিন টানা সম্ভব হয় না কারণ আদপে যাওয়া আসাটাই হয়, পড়াশুনো হয় না। তিন ঘণ্টা পায়ে দলে যাওয়া আবার তিন ঘণ্টা ফেরা। ক্ষান্ত দেওয়াই

লিম্বু উপজাতিদের প্রার্থনা স্থল

ভাল নয় কি?

আজব দেশের আজব কাহিনি। তবে হ্যাঁ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে দরবার টরবার করায় নাকি ওখানে একটা প্রাইমারি স্কুল করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে একজন টিচারও নাকি রিক্রুট করা হয়েছিল। কিন্তু ওটা কিছুটা ওইরকম, তোমাকে খেলায় নিয়েছি ঠিকই কিন্তু তোমায় বুঝতে দেব না যে আসলে তুমি 'দুদুভাতু'। কোন টিচারের ঘাড়ে ভূত চেপেছে যে সে তিন তিন ছ'ঘণ্টা পায়ে হেঁটে এসে শিক্ষার ফুল ফোটাবে? তাই অচিরেই তিনি নমস্কার জানিয়েছেন।

এখানকার শিশুরা ফুল হয়ে ফুটুক আর নাই ফুটুক তাদের দেশে সবসময়ই বসন্ত। আরও একটু শোনাই। দ্বিতীয় এবং সবচাইতে ভয়ানক যে প্রশ্নটা মাথায় এল সেটা হল, অসুস্থ হলে? কোথায় চিকিৎসা? উত্তরটা নিশ্চয়ই এবার আর অবাক করবে না! নেই। কোনও চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। অসুখ যদি নিজে সারে তো ভাল, না সারলে কোনও যানবাহন নেই যা করে রোগীকে অন্তত দুধে পর্যন্ত আনা যায়। ফলে মরে গেলে মরে যাবে। এদের না আছে কোনও ভোটার কার্ড, না আছে কোনও আধার কার্ড, অর্থাৎ অস্তিত্বহীন। তাই ভোট উৎসবও হয় না এখানে। সত্তরটা মানুষের মধ্যে হয়ত গোটা পঞ্চাশ-ষাটজন ভোট দেবার মত; তাদের জন্য আবার বুথ? পাগল কুকুরে কামড়েছে নাকি আমাদের সরকারকে? পড়ে থাক এভাবেই। যা খুশি হোক গে, নিজেরা বাঁচলে বাঁচুক মরলে মরুক গে। ঊনিশটা পরিবার তো মাত্র।

শিলিগুড়ি থেকে মিরিকের রাস্তা ধরে দুধিয়া পর্যন্ত গিয়ে বাঁ দিকে উঠে যেতে হয় বংকুলুং এ যেতে হলে। কী ভয়ঙ্কর যে সেই রাস্তা। কেউ যে এইসব এলাকার দিকে তাকিয়েও দেখে না খুব স্পষ্টভাবে তা বোধগম্য হয়। পাহাড় নিয়ে 'রাজনীতি রাজনীতি' খেলা দেখলে এদের জন্য বড় কষ্ট হয়। আমরা নিজেদের ছোট গাড়িতে চলছি আর ওশানকে বকাবকি করছি। ওশান লেপচা আমাদের ছোট ভাইয়ের মত ভারি মিষ্টি একটা ছেলে। ও-ই প্রত্যন্ত নানানা জায়গার হদিশ দেয় আমাদের। তাই ঝালটাও ওকেই খেতে হয় আর কি। বংকুলুং-এ পৌঁছে খুঁজেই পাচ্ছিলাম না ক্যাম্প, যেখানে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত। অবশেষে পেলাম। সত্যিই জঙ্গলের

লিম্বু ট্রাইবদের গ্রাম এটি। আমাদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করা ছিল জাঙ্গল ক্যাম্প-এ। চারজন পার্টনার মিলে এই গ্রামের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে তৈরি করেছেন ক্যাম্পের আদলে নাইট স্টে। দুটো কটেজ রয়েছে কিন্তু সেগুলোও পর্দা ঘেরা।

ভেতরে একটা পথ নেমে গেছে যা টেন্ট পর্যন্ত চলে গেছে। মোবাইলের কার্যকারিতা সত্যই স্বীকার করতেই হয়।

বংকুলুং এ আমরা পৌঁছলাম দুপুর দেড়টা নাগাদ। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০০ ফুট ওপরে। লিম্বু ট্রাইবদের গ্রাম এটি। আমাদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করা ছিল জাঙ্গল ক্যাম্প-এ। চারজন পার্টনার মিলে এই গ্রামের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে তৈরি করেছেন ক্যাম্পের আদলে নাইট স্টে। দুটো কটেজ রয়েছে কিন্তু সেগুলোও পর্দা ঘেরা। সামান্য সিমেন্ট সামান্য কাঠ আর ভেতরে অনেকটাই শুধু পর্দা। মাঠে দুটো নর্মাল টেন্ট খাটানো। আশপাশের বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েদের এখানে নিয়ে আসা হয় প্রকৃতি চেনানোর জন্য। এই চারজন অশ্বিনী তামাং, কল্যাণ রাই, সত্যেন বরদেওয়া আর সঞ্জীব থাপা নিজেদের উদ্যোগে আয়োজন করেন এই ক্যাম্পগুলোর। ওঁরা নিজেরা থাকেন মিরিকে। বুকিং থাকলে এখানেই থাকেন। আমাদের সঙ্গেও থাকলেন। যেখানে ক্যাম্পটা করা হয়েছে সেখানে পাহাড়ের একটা অংশ ক্রমশ ধস নেমে নেমে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। আর দু'একবার ঘটলে গোটা গ্রামটাই পড়ে যাবে। গাছ লাগিয়ে লাগিয়ে ওই এলাকা বাঁচানোর এক বড়সড় প্রক্রিয়ায় হাত লাগিয়েছেন এঁরা। তাতে কয়েক বছর হল ধসের প্রকোপ অনেকটা কম।

খুব সুন্দর একটা ট্রেক রুট নেমে গেছে বালাসন নদীর তীরে। দু'পাশে ঘন জঙ্গলের মত শুধু গাছ আর নীচে নদী ফুঁসছে গর্জন করে। আদপে বংকুলুং একটা ঝুলন্ত উপত্যকা। শিলিগুড়ি থেকে ৩১ কিমি, কার্শিয়াং থেকে ২০ কিমি আর মিরিক থেকে ২১ কিমি দূরত্বে এই লুকনো গ্রাম। পর্যটকদের ভিড়ে ক্লান্ত হয়নি এখনও।

এখানে একটা এক্সক্লুসিভ চা ফ্যাক্টরি দেখার সৌভাগ্য হল। 'ইয়াংকি টি'। মালকিনের নাম 'ইয়াংকু রাই', তাঁর নামেই ফ্যাক্টরির নাম। ১৫০ জন কৃষক তাদের নিজস্ব জমি থেকে চা পাতা তুলে নিয়ে আসে এই ফ্যাক্টরিতে। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে (সঙ্গে শুধু ছ'টা ছেলে আছে লেবার হিসেবে) গড়ে পড়তায় ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি চা তৈরি করেন। আমাদের খাওয়ালেন সেই চা। ঠিক এরকম চা মালবাজারের কোনও একটা নামী দোকানে খেয়েছি মনে পড়ল। নিয়ে এলাম খানিকটা। অপূর্ব গন্ধ তার। ইয়াংকুর হাসব্যান্ড ফুবি রাই-এর আর এক শখ দেখে তো আমরা থ। কাঠ কেটে কেটে কী দারুণ যে সব জন্তু-জানোয়ার বানিয়েছেন! বিকেলবেলা ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেলে এই তাঁর বিনোদন।

কাছেই আছে লিম্বুদের প্রার্থনাস্থল। সামনে বিরাট মাঠ। ওখানে এখন পুজোআচ্চা অনেকটাই কমে গেছে। পুরোহিতরা আর বংশপরম্পরায় এই কাজ করছেন না। নতুন প্রজন্ম লেখাপড়া করে অন্যান্য চাকরি খুঁজে নিচ্ছে। তবু বয়স্ক যিনি আছেন তিনি এখনও আসেন। সকাল-সন্ধে প্রদীপ জ্বালান হয়।

এক রাত বংকুলুং এ থেকে পরদিন লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম মিরিকের দিকে। সি অফ-এর সময়টা খুব মন খারাপ হয়ে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা থাকলেও ওরা এমনভাবে আগলে রাখলেন এই পুরো সময়টা যে মনে হল অনেক দিনের বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হচ্ছে। হোম স্টেগুলোর মজা এখানেই। আত্মীয় বাড়িতে থাকার অনুভূতি তৈরি করে দেয়।

আপনারাও যান একবার বংকুলুং-এ ঘুরে আসুন। জাঙ্গল ক্যাম্পে থাকতে হলে— কল্যাণ রাই ৯৭৪৯০৫৯৬৮১, কিংবা ওশান লেপচা ৯৯৩২৩৮৫৪৯৪। ফেরার পথে ওশানকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছি মনে মনে।

শ্বেতা সরখেল। ছবি অতনু সরখেল

বিডিও-র কলমে ময়নাগুড়ি

নারীরাই ডুয়ার্সের বরাবরের চালিকা শক্তি। মাঠে জঙ্গলে চা-বাগানে, প্রশাসনে উন্নয়নে, সর্বত্র তাঁদের হাতেই পল্লবিত হয় সুন্দরী ডুয়ার্স। তেমনই এক কৃতী ডুয়ার্সকন্যা শুনিয়েছেন নিজের মাটির জন্য কাজ করবার আনন্দ কাহিনি। যা পড়লে নিশ্চিত অনুপ্রাণিত হবে পিছিয়ে পড়া এই বঙ্গভূমির আগামী প্রজন্মের শ্রীমতি ডুয়ার্স।

আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে ২০১৪ সালে বীরভূমের রামপুরহাট ১নং ব্লক থেকে ময়নাগুড়ি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পদে আমার যোগ দেওয়া। চাকুরিসূত্রে এটি আমার দ্বিতীয় ব্লক। বীরভূমের লাল মাটির দেশ থেকে সোজা ডুয়ার্সে এসে আমার অভিজ্ঞতা অনন্য। কৌতুহল অনেকেরই ছিল হঠাৎ দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে আসা কেন? এখনও কোনও অজ্ঞাত কারণবশত বেশিরভাগ মানুষের কাছেই উত্তরবঙ্গে বদলি শাস্তিরই সামিল। যাই হোক, সকলকে একই উত্তর দিয়েছি, ভাল লাগা ও ভালবাসা থেকেই এখানে আসা। ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) চাকুরিতে এসে কজনই বা সুযোগ পায় যেখানে বড় হয়ে ওঠা সেখানকার মানুষদের পরিষেবা দেওয়ার? হ্যাঁ ঠিকই আন্দাজ করেছেন জলপাইগুড়ি আমার জন্মস্থান। উত্তরবঙ্গ থেকে এখনও হাতে গোনা কিছু ছাত্রছাত্রীই প্রশাসনিক চাকুরিতে আসেন। এই চাকুরিতে আসার অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছি আমার বাবার কাছ থেকে। ১৯৭৮ সালে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা দিয়ে আমার বাবা শ্রী গৌতম ঘোষ এই চাকুরিতে যোগদান করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে বাবাকে ছোটবেলা থেকে দেখেছি। ২০১১ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার প্রবেশনারি অফিসার পদে যোগ দিয়েও মাত্র এক বছর পরেই সে চাকুরি ছেড়ে বর্তমান চাকুরিতে যোগ দিই। এই চাকুরিতে কাজের সুযোগ, পরিধি, সম্মান ও বৈচিত্র্যের কথা ছোটবেলা থেকেই জানা। কাজের ক্ষেত্রেও নতুন কিছু শেখার ইচ্ছা ও চেষ্টা রয়েছে অনবরত। কাজের ক্ষেত্রে প্যাশন থাকাটা সবচেয়ে জরুরি বলে মনে হয় আমার।

এবার আসি ময়নাগুড়ির গত চার বছরের অভিজ্ঞতার কথায়। পদাধিকার বলে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক হলেন পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক। ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে ময়নাগুড়ি ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি। বৈচিত্র্যের দিক থেকে ময়নাগুড়ি এক কথায় অনন্য। তিস্তা ও জলঢাকার মাঝখানে অবস্থিত এই ব্লকের আয়তন ৬৩১.০১ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩২৯০৩২। একদিকে রামশাই এলাকার জঙ্গল বনছায়া যেমন রয়েছে, অন্যদিকে আছে জনকোলাহলপূর্ণ ময়নাগুড়ি শহর। আন্তর্জাতিক বর্ডার তিনবিঘা ও চ্যাংরাবান্ধা ২০ কিমি দূরে। ভৌগলিক ও জনমানব বৈচিত্র্য থেকেই অনুধাবন করা যায় বিডিও-র কাজটি খুব সোজা নয়। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন চাহিদা, প্রত্যাশা ও পরিষেবার ধরণ আলাদা। বিডিও-র কাজের পরিধি স্বল্প কথায় বলা সম্ভব নয়। মিশন নির্মল বাংলায় শৌচাগার তৈরি থেকে শুরু করে গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন, কখনও বা বন্যা ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়া, আবার কখনও অসহায় বৃদ্ধ, বিধবা মহিলাদের ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া— এই সবই রয়েছে কাজের তালিকায়।

ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক হিসেবে বিগত কয়েক বছর ধরে আমি বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের অংশীদার। বলা জেতে পারে ফালি কলমের সমস্ত কাজ আমারই। কোনও কাজ যাতে সরকারি লাল ফিতের বাঁধনে যাতে আটকে না থাকে সেদিকে নজর দিয়েছি সর্বদা। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ৪৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি। সমস্ত কাজে তাঁদের সহযোগিতা অনস্বীকার্য। বিগত কয়েক বছরে যেসব পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে ও উন্নয়নের কাজকর্ম হয়েছে তার কিছু খন্ডচিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

গ্রাম বাংলায় পরিকাঠামোর সমস্যা সবচেয়ে গুরুতর। ব্রিজ-রাস্তা-স্কুল-হাসপাতাল সবেতেই রয়েছে কিছু না কিছু খামতি। গত কয়েক বছরে এই পঞ্চায়েত সমিতি প্রায় ১৬টি ব্রিজ এবং ১০০টিরও বেশি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণ করেছে। ময়নাগুড়ির প্রত্যন্ততম জায়গাতেও কাঁচা রাস্তা চোখে পড়বে না আজ কারুরই। ময়নাগুড়িতে রয়েছে একটি গ্রামীণ হাসপাতাল, ৪৬টি হেলথ সাবসেন্টার, ৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র— পরিকাঠামোর দিক থেকে এরা অনেকটাই উন্নত। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে (ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি) ময়নাগুড়ি ব্লক জলপাইগুড়িতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৯৯.০২ শতাংশ।

ময়নাগুড়িতেই রয়েছে এই জেলার একমাত্র পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র (নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার)। এইখানে বেশির ভাগ দরিদ্র চা বলয়ের সদ্যোজাত ও ছোট শিশুরা আসে। সঙ্গে আসে মায়েরাও যারা অপুষ্টির শিকার। ১০ শয্যা বিশিষ্ট এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে এই সব শিশু ও তাদের মায়েদের খাদ্য ও পথ্য দিয়ে সুস্থ করে তোলা হয়। ময়নাগুড়ির এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে আসে মাল মেটেলি নাগরাকাটা ধুপগুড়ি প্রভৃতি এলাকার চা শ্রমিকের পরিবার ও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারি মানুষেরা।

ময়নাগুড়িতে ছোট বড় সব মিলিয়ে ৩৯৮টি স্কুলে মিড ডে মিল চলে। এদের নিয়মিত খরচের হিসেব দিতে হয় ব্লক অফিসকে। চালের যোগান নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। খাবারের গুণগত মান দেখতে রেগুলার মনিটরিং চলে।

ব্লকের তদারকিতেই চলে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারি পরিবারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। কন্যাশ্রী-রূপশ্রী-সমব্যথী-বিধবা ভাতা-বার্ধক্য ভাতা-প্রতিবন্ধী ভাতা প্রভৃতি সব মিলিয়ে রয়েছে পনের হাজারের বেশি উপভোক্তা। পেনশন প্রাপকদের প্রতিমাসে ব্যাংক মারফত সময়মত টাকা প্রদান ও এই সমস্ত টাকার হিসেব রাখা বিডিও-র কাজের মধ্যেই পড়ে।

ময়নাগুড়ি ব্লকে রয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলিকে তদারকি করার জন্য রয়েছে ১৬টি সংঘ এবং একটি মহাসংঘ। দলের মহিলারা আজকাল ধান, চাল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদির ব্যবসা ছাড়াও এগিয়ে আসছেন কম্পিউটার ট্রেনিংয়ে, কেউ বা বিউটিশিয়ান কোর্স করে খুলছেন বিউটি পার্লার। সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার ক্ষেত্রেও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পিছিয়ে নেই। তাদের সামনে খুলছে বিভিন্ন রোজগারের পথ। ময়নাগুড়ি মহাসংঘ তৈরি করছে 'তিস্তা লিকুইড হ্যান্ডওয়াশ', গুণমানের নিরিখে এটি বাজার চলতি যে কোনও হ্যান্ডওয়াশকে টেক্কা দিতে পারে। শুধু দরকার ঝাঁ চকচকে মোড়কের। মিড ডে মিল খাওয়ার পর বাচ্চাদের হাত ধোওয়ার অভ্যেস তৈরি করতে উদ্যোগী জেলা প্রশাসন। সেই সুবাদেই বরাত পায় ময়নাগুড়ি ব্লক মহিলা মহাসংঘ। তাঁরাই এখন সারা জেলায় সব স্কুলে হাত ধোওয়ার সাবান সরবরাহ করছেন। আর্থিক সঙ্গতিও ফিরছে গ্রামের মেয়ে বউদের। এই সবের পাশাপাশি মাশরুমের পরীক্ষামূলক চাষও শুরু হয়েছে ময়নাগুড়িতে। তাতেও সাফল্য চোখে পড়বার মত।

আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারবর্গের রুজি রোজগারের অন্যতম সংস্থান হল একশ দিনের কাজ, যার পোশাকি নাম মহাত্মাগান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প। এই প্রকল্পে বিগত অর্থবর্ষে ৪৯২৬২টি পরিবারকে কাজ দেওয়া হয়েছে গড়ে ৬৩ দিন করে। শহরাঞ্চলে অনেকেরই ধারণা ১০০ দিনের কাজ মানে নিস্ফল মাটি কাটা। সেই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে এই প্রকল্পের ফলে ময়নাগুড়িতে গড়ে উঠেছে নানা ফলের বাগান, নার্সারি, চা বাগান, ১০টি আইসিডিএস কেন্দ্র, পাকা রাস্তা, কালভার্ট, শৌচাগার ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ। 'স্থায়ী সম্পদ গড়ে তার থেকে আয় করা'— এই নীতির ওপর চলে ময়নাগুড়ির মানুষের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটেছে বলাই বাহুল্য।

খেলাধুলায় ময়নাগুড়ির মানুষের উৎসাহ প্রবল, এখানকার বড় ফুটবল মাঠটি নানা দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় সেজে উঠেছে নতুন রূপে। ব্লক প্রশাসনের নিরবিচ্ছিন্ন তদারকিতে সেখানে তৈরি হয়েছে শৌচাগার, ফেন্সিং ও চেঞ্জিং রুম।

৪১৫টি আইসিডিএস কেন্দ্র চালু রয়েছে ময়নাগুড়িতে। সদ্যোজাত শিশু থেকে ছয় বছরের বাচ্চা এবং প্রসূতি মায়েদের খাবার দেওয়া হয় নিয়মিত। তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করা, টিকাকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হয় নিয়মিত।

মহিলারা আজকাল ধান, চাল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদির ব্যবসা ছাড়াও এগিয়ে আসছেন কম্পিউটার ট্রেনিংয়ে, কেউ বা বিউটিশিয়ান কোর্স করে খুলছেন বিউটি পার্লার। সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার ক্ষেত্রেও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পিছিয়ে নেই। তাদের সামনে খুলছে বিভিন্ন রোজগারের পথ। ময়নাগুড়ি মহাসংঘ তৈরি করছে 'তিস্তা লিকুইড হ্যান্ডওয়াশ', গুণমানের নিরিখে এটি বাজার চলতি যে কোনও হ্যান্ডওয়াশকে টেক্কা দিতে পারে। শুধু দরকার ঝাঁ চকচকে মোড়কের।

ব্লকের কাজের আওতায় রয়েছে বিভিন্ন গৃহ নির্মাণ প্রকল্প, ইন্দিরা আবাস যোজনা, গীতাঞ্জলি গৃহ নির্মাণ প্রকল্প, সংখ্যালঘু আবাস, রাজবংশী আবাস ইত্যাদি প্রকল্পে গত চার বছরে প্রায় ৪০০০ গৃহহীন উপভোক্তা মাথার উপরে ছাদ পেয়েছেন। গীতাঞ্জলি আবাস প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেনঅক্ষম অন্ধ বা এইডস আক্রান্ত মানুষ, যাদের এই মাথার উপরে ছাদ থাকাই হয়ত জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাওনা।

ময়নাগুড়ি হল শৈব তীর্থক্ষেত্র। জল্পেশ, জটিলেশ্বর, বটেশ্বর, পেটকাটি এইসব মন্দিরের ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন। অনেকেরই হয়ত অজানা, শতবর্ষের পুরনো জটিলেশ্বর মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাঁধে। মন্দির পরিচালনায় আমার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তবে হলফ করে বলতে পারি, আজ থেকে পাঁচ বছর আগে যারা জটিলেশ্বর দেখেছেন তারা যদি আজকের দিনে মন্দিরে আসেন তারা হয়ত অবাক হবেন, কেউ কেউ হয়ত চিনতেই পারবেন না। সম্পূর্ণ মন্দির চত্বর পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে পর্যটন দপ্তরের সহায়তায়। টিকিট কাউন্টার, মন্দির প্রাঙ্গণে সৌন্দর্যায়ন ও বৃক্ষরোপণ এসবই নতুন করে করা হয়েছে। মন্দিরের প্রাত্যহিক পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে স্থানীয় একটি দলকে। এই দলটি খুবই দায়বদ্ধ ও নিষ্ঠাবান। মন্দির চত্বরে গাছে জল দেওয়া থেকে শুরু করে মন্দির প্রাঙ্গনে পড়ে থাকা শুকনো পাতা কুড়িয়ে রাখা সবেতেই নজর। তবে স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতা না থাকলে এত সুষ্ঠুভাবে হয়ত মন্দির পরিচালনা করা সম্ভবপর হত না। মন্দিরটির পাশেই রয়েছে যে পুকুরটি, সেটিও মাছ চাষের ইজারা দেওয়া। ভবিষ্যতে এই বিশাল পুকুরটিতে বোটিং চালু করবার পরিকল্পনা রয়েছে।

ময়নাগুড়ির পর্যটনের দিকটি দেখেছি ভীষণভাবে উপেক্ষিত। ময়নাগুড়ির সৌন্দর্য্য কোনওভাবেই লাটাগুড়ি বা ডুয়ার্সের অন্যান্য জনপ্রিয় জায়গাগুলির চেয়ে কম নয়। খাগড়াবাড়িতে রয়েছে মনোরম খুকশিয়া উদ্যান, দোমহনিতে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা, রামশাইতে মেদলা নজর মিনার, প্রজাপতি পার্ক ও রাইনো ক্যাম্পে নৌবিহার, কালিপুরে হাতি সাফারি— এর সবকটা প্রচারের আলোয় সেভাবে আসে নি, তাই হয়ত জায়গাগুলি এখনও নিরিবিলি, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর সমাহিত।

ময়নাগুড়িকে তার ভৌগলিক অবস্থানের জন্যই বলা হয় গেটওয়ে অব ডুয়ার্স। ন্যাশনাল ও এশিয়ান হাইওয়ের কাজে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কাটা পড়ছে বহু গাছ। পরিবেশের এই অপূরণীয় ক্ষতিতে মন খারাপ লাগা তৈরি হয় সবার মতই আমারও। সম্প্রতি ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সহায়তায় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে লাগানো হয়েছে চার হাজার চারাগাছ, প্রায় ১৬ কিমি রাস্তা জুড়ে। শাল সেগুন মেহগনি চিকরাশি ইত্যাদি নানা প্রজাতির বাগান করা হয়, গবাদি পশুর হাত থেকে বাঁচাতে বাঁশের খাঁচা সমেত। এর অর্ধেক গাছও যদি বেঁচে যায় তবে ময়নাগুড়ির পরিবেশে সদর্থক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে নিশ্চিত।

এইসব নানা কাজকর্ম দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় চার বছর। রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে ময়নাগুড়ির সাধারণ মানুষ, সমাজসেবী সবাইকে পাশে পেয়েছি সবসময়। কাজের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি হলে নিজগুণে ক্ষমা করেছেন তাঁরা, পেয়েছি সবার ভালবাসা ও সম্মান। আর শেষ করবার আগে একটি কথা না বললেই নয়। চার দশক আগে আমার বাবার প্রথম পোস্টিং হয়েছিল এই ময়নাগুড়িতেই। আমারও কিনা রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকের মধ্যে পোস্টিং হল সেইখানেই! একে কাকতালীয় নাকি অন্য কিছু আখ্যা দেব বলুন তো? বহু বয়স্ক মানুষ যাঁরা সেই আমলে বিভিন্ন আধিকারিক পদে ছিলেন এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন, দুটো কথা বলেন, মেয়ে বলে সম্বোধন করেন, আশির্ব্বাদ করেন। একটা আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল সকলের সঙ্গে।

কিন্তু এবার যাওয়ার পালা, বদলির চাকুরি চলে তার নিজের নিয়মে। সব গুছিয়ে যেতে হবে অন্য কোনওখানে অন্য মানুষদের কাছে। নিজের হাতে তৈরি করা জিনিস ফেলে রেখে চলে যেতে হবে অন্য ঠিকানায়। এ অভিজ্ঞতা যদিও নতুন কিছু নয়, বাবার কাজের সূত্রে বদলি হতে হয়েছে ন'বার, স্কুল বদলাতে হয়েছে ছয়টি। তবু বিদায় বেলায় মন খারাপ আটকানো যায় কি?

শ্রেয়সী ঘোষ

স্বপ্না বর্মণের স্বপ্ন সার্থক হোক! ডুয়ার্সবাসীর শুভেচ্ছা!

পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ জন্ম নেয়, যারা নিজের প্রতিভাকে ছাপিয়ে অভাব-অনটনকে তোয়াক্কা না করে গট গট করে এগিয়ে যায়। স্বপ্না বর্মণ হল সেই রকম একটি মেয়ে। প্রতিকুল পরিবেশে, হত দরিদ্র পরিবারে জন্মেও স্বপ্না বর্মণ জায়গা করে নিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া দলে; অংশগ্রহণ করছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে। জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের অন্তর্গত পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন একটি পাড়ার নাম পাতকাটা ঘোষপাড়া। এই পাড়ার বিশিষ্ট সেন পরিবারের দেওয়া একখণ্ড জমিতে কুড়েঘর নির্মাণ করে বসবাস করেন পঞ্চানন বর্মণ ও তাঁর স্ত্রী বাসনা বর্মণ। এই দরিদ্র দম্পতির দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদের নাম পবিত্র ও অমিত এবং দুই কন্যা চন্দনা ও স্বপ্না। পুঁথিগত শিক্ষায় প্রাথমিক স্তর অনুত্তীর্ণ পঞ্চানন বর্মণ বেছে নেন রিক্সা ভ্যান চালকের পেশা। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করেন পঞ্চানন বর্মণ। এই কাজ করতে করতে বহু সচ্ছল ও সজ্জন মানুষের সঙ্গে ঘটে তাঁর সুসম্পর্ক। পঞ্চানন বর্মণের স্ত্রী বাসনা বর্মণ শক্তির সাধিকা, সেই কুঁড়ে ঘরেই প্রতিষ্ঠা করেছেন কালি মূর্তি। শত অভাব অনটন সত্ত্বেও করেন নিত্য কালি পুজা। বহু মানুষ সেই কুঁড়ে ঘর মন্দিরে আসেন পুজো দিতে।

স্বপ্না বর্মণের জন্ম ১৯৯৬ সালের ২৯শে অক্টোবর। ২০০১ সালে স্বপ্নাকে ভর্তি করা হয় পাতকাটা ঘোষ পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ২০০৪ সালে স্বপ্না বর্মণ চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে সরকারী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাতকাটা অঞ্চল ও জলপাইগুড়ি সদর উত্তর মণ্ডলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে শক্তিগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উচ্চ লম্ফন বিভাগে ১ম স্থান লাভ করে স্বপ্না বর্মণ। এরপর জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে অনুষ্ঠিত রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উচ্চ লম্ফন শুধু ১ম স্থানই নয়— ১.৩৪ মিটার উচ্চ লম্ফন করে রাজ্যের মধ্যে এক নজির স্থাপন করে এই ব্যাতিক্রমি বালিকা। ক্রীড়া জগতে উত্তরণের এটাই ছিল স্বপ্না বর্মণের জীবনের 'টারনিং পয়েন্ট' এবং এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রথম পথ প্রদর্শক ছিলেন ঘোষপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ কর সহ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ।

প্রাথমিক স্কুলের পাট চুকলে স্বপ্না বর্মণকে ৫ম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয় কালিয়াগঞ্জ উত্তমেস্বর উচ্চতর বিদ্যালয়ে। ক্রীড়া বিভাগে এক কৃতি ছাত্রীকে পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই আপ্লুত বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষার শিক্ষক বিশ্বজিৎ মজুমদার। তিনি আন্তরিক ভাবেই স্বপ্না বর্মণের কোচিং এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় সাই-এর (স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া) শাখা ন্যাশনাল ইন্সটিট্যুট অব স্পোর্টস-এর অধীনে কোচিং নেওয়ার সুযোগ লাভ করে স্বপ্না বর্মণ, সুভাষ সরকার হলেন তার কোচ। আরএসএ-এর বিশেষ উদ্যোগে স্বপ্না বর্মণ এর দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় এবং কোচ হিসাবে নিয়োজিত হন সুকান্ত সিনহা। ২০০৭ সাল থেকে স্বপ্না বর্মণের অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা বা মেন্টর হিসাবে কাজ করে চলেছেন ব্যাংক কর্মী ক্রীড়া পাগল সমীর দাস।

জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ২০১৪ তে স্বপ্না বর্মণ জীবনের সেরা উচ্চ লম্ফনের ১.৭৮ মিটার লম্ফন করে ২য় স্থান লাভ করে। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত 'স্কুল এশিয়াড ২০১৩' তে স্বপ্না বর্মণ উচ্চ লম্ফনে ১ম, রিলে রেস (৪০০/৪০০) এ ১ম, জ্যাভলিন থ্রো তে ২য় এবং হ্যামার থ্রো তে ৩য় স্থান অধিকার করে ভারতীয় দলের মধ্যে সেরা হিসাবে গণ্য হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে অনুষ্ঠিত সাবগেমসে অংশগ্রহণ কালে অসুস্থ হওয়ার কারণে উচ্চ লম্ফনে ২য়, জ্যাভলিন থ্রো তে ৩য় স্থান অধিকার করে। চীনের তাইপেতে অনুষ্ঠিত এটিএফ-এ ভারতীয় দলে উত্তরবঙ্গের একমাত্র বালিকা স্বপ্না বর্মণ অংশগ্রহন করে এবং হেপটাথলন-এ ২য় স্থান অধিকার করে। স্বপ্না বর্মণ যে ক্রীড়া জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সে নিয়ে এরপর কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকে না!

স্বপ্না বর্মণ

স্বপ্না বর্মনের এই উত্তরণে তার বাপ-মায়ের অনুপ্রেরণা অপরিসীম। বাসনা বর্মণ তাঁর কুঁড়েঘরে প্রতিষ্ঠাতা কালি মাতাকে পুজো দিয়ে কামনা করেন, তাঁর কন্যা যেন ক্রীড়া জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 'বাসনা' ও 'কামনা' সমার্থক। কালি মাতা বাসনা বর্মণের কামনা পূর্ণ করেছেন, তাই স্বপ্না বর্মণের মেডেলগুলি পরিয়ে দিয়েছেন কালি মাতাকেই। স্বপ্না বর্মণকে কোচিং নিতে যেতে হত আরএসএ-র মাঠ বা মল্লিকপাড়া হাইস্কুলের মাঠে। কোচিং নিতে যাওয়ার বাহন সেই ভ্যান রিক্সা। চালক পিতা পঞ্চানন বর্মণ। মেয়ে স্বপ্নার সঙ্গে সেই বাহনের যাত্রী থাকত মা বাসনা বর্মণ। 'দিন আনা-দিন খাওয়া' পরিবারের বাপ-মায়ের আর সব ফেলে এই আত্মনিয়োজন ভাবা যায় না, আগামী প্রজন্মের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে।

কেবল বাড়িতেই নয়, বাড়ির বাইরেও স্বপ্নার স্বপ্নকে নিজেদের জীবনের স্বপ্ন ভেবে এগিয়ে এসেছেন বহু মানুষ। বিদ্যালয় শিক্ষা ও ক্রীড়া শিক্ষায় সর্বতো ভাবে সহযোগিতা করেছেন কালিয়াগঞ্জ উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডঃ জীবেন্দ্র নাথ সরকার, শারীর শিক্ষার শিক্ষক বিশ্বজিৎ মজুমদার ও গড়েন রায় ও বাকি শিক্ষক- শিক্ষিকারা। সদর পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চানন বর্মণকে ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পে নির্মাণ করে দিয়েছেন এক গৃহ। তৎকালীন জেলাশাসকপৃথা সরকার কিছু ব্যাবহারিক আসবাব পত্র উপহার দিয়েছেন স্বপ্না বর্মণকে। রাজ্য সরকার স্বপ্না বর্মণকে এক কালীন দশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করেছেন। এছারাও বিভিন্ন সময়ে বহু ব্যক্তি কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করেছেন। আর ক্রীড়া জীবনের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন সমীর দাস।

স্বপ্না বর্মণকে রাজ্য সরকার ২০১৫ সালের ২০শে জানুয়ারি 'বঙ্গরত্ন' সম্মানে ভূষিত করেছে। ২০১৭ তে দিল্লিতে পাতিয়ালা ফেডারেশন কাপে এবং ভুবনেশ্বরে এশিয়ান অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে হেপটাথলনে জোড়া গোল্ড মেডেল স্বপ্নপূরণের পথে এক ধাক্কায় তাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। স্বপ্নার সাফল্যে, স্বপ্নার স্বাচ্ছন্দ্য-ভাবনায় সোচ্চার হয়েছে বাংলা খেলার জগত। একদিকে বাড়িতে অনটন, বাবা অসুস্থ, মা একা সামলাতে পারছেন না, তার স্কলারশিপের অর্থ ব্যয় হচ্ছে সংসারে। অন্যদিকে এশিয়াডে খেলার সুযোগ, চোয়াল শক্ত করে কলকাতা সাইয়ের মাঠে চলছে জীবন-বাজি-রাখা কঠোর অনুশীলন। ডুয়ার্সের প্রতিটি মানুষ কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুক, আমাদের ঘরের মেয়েটি যেন জিতে ফেরে লড়াইয়ের মাঠ থেকে। ডুয়ার্সকন্যার মুখে জয়ের হাসি ফুল হয়ে ফুটে থাকুক আমাদের ঘরে ঘরে।

পার্থ প্রতিম রায় প্রধান

কৃতজ্ঞতা হরিশচন্দ্র রায়

রামশাই প্রজাপতি পার্ক

মেদলা টিকিট কাউন্টারের ঠিক পাশেই বছর পাঁচেক আগে শুরু হয়েছিল এই প্রজাপতি পার্ক। সকাল দশটা থেকে খোলা থাকে এই পার্ক। মোট ৮৭ প্রজাতির প্রজাপতি মেলে। খুব ভিড় না হলেও পর্যটকরা আসেন, ঘুরে ঘুরে দেখেন রঙবেরঙের প্রজাপতির বাহার। পার্কের দায়িত্বে থাকা পিংকি গোঁসাই জানালেন এসব তথ্য।

নিজস্ব প্রতিবেদন।
ছবি শুভংকর রায়

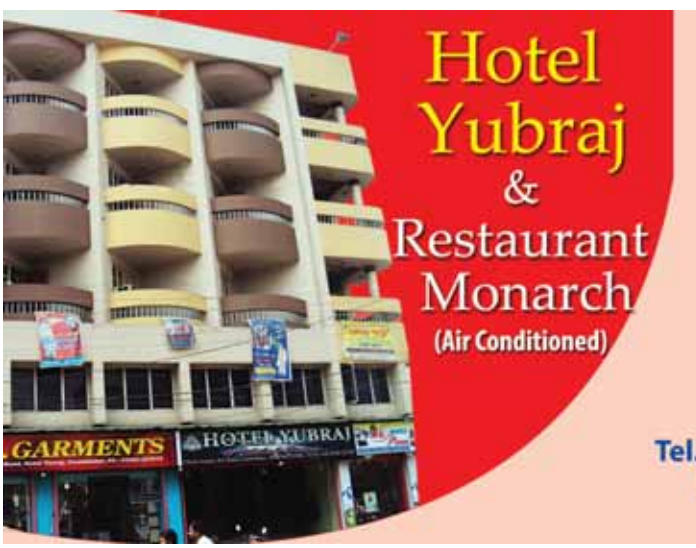

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

আমার ঠিকানা নয় বৃদ্ধাশ্রম !
নিপীড়িত বৃদ্ধাদের সুরক্ষাকবচ আইন

এক। নামজাদা বহুজাতিক সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত পুত্রটি একদিন দামি গাড়ি চালিয়ে সত্তরোর্ধ মাকে নিয়ে আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিল। আচমকা মাকে ফুটপাতে নামিয়ে দিয়ে সে বলল, 'তুমি একটুখানি দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি আসছি'। ব্যস সেই যে গেল ছেলে আর ফিরল না। তবে ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান। অসুস্থ মাকে পথে ছেড়ে যাওয়ার আগেই সব বিষয়সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল।

দুই। বৃদ্ধা মায়ের বাড়িতেই থাকে তাঁর অকর্মণ্য পুত্র। বাড়ির অংশ ভাড়া দিয়ে মাসে বেশ কয়েক হাজার টাকা রোজগারও করে। কিন্তু ভরণপোষণ তো দূরের কথা, মাকে ঠিকমত খেতেও দেয় না সেই কুলাঙ্গার পুত্র।

তিন। আলো বাতাসহীন ঘরে নিঃসন্তান বৃদ্ধাকে নির্বাসন দিয়েও থেমে থাকেনি নিষ্ঠুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও তার স্ত্রী। বাড়ির দলিল নিজেদের নামে লেখানোর জন্য পিসির গায়ে নিয়মিত হাতও তোলে তারা। তাতেও রাজি না হওয়ায় অসহায় বৃদ্ধাকে গলা টিপে খুন করবার চেষ্টা করে গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্র।

ঘটনাগুলো খুব চেনা লাগছে, তাই না? ঠিক ধরেছেন, সংবাদ মাধ্যমে এমন খবর তো প্রায়শই আমাদের নজরে আসে। তাছাড়া, আমাদের আশেপাশেও তো অহরহ ঘটে চলেছে এমন কত ঘটনা। কেবলমাত্র প্রেক্ষাপটটি বদলে যায় বার বার- কখনও রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, কখনও বা রাস্তা, কখনও আবার বাড়ির চার দেওয়াল ঘেরা বন্দীশালা। ২০১৪ সালে 'হেল্পএজ ইন্ডিয়া' বয়স্কদের ওপর সংঘটিত পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে ৯টি মেট্রো শহরে সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় উঠে আসে, বয়স্কদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশই এই ধরনের অত্যাচারের শিকার। এই ৫০ শতাংশের মধ্যে বৃদ্ধাদের সংখ্যা প্রায় ৫২ শতাংশ! মনে রাখবেন, এই সমস্ত নির্যাতন-বঞ্চনা বৃদ্ধাদের প্রতি দণ্ডনীয় 'অপরাধ'। আর যেখানে অপরাধ, সেখানে সসম্মানে বেঁচে থাকার অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে আইন। চলুন, জেনে নেওয়া যাক সেই আইনের কথা।

ভারতীয় সংবিধান কী বলে?

আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য হোক কিংবা শারীরিক-মানসিক অসহায়তা, যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই যাতে আইন বয়স্ক মানুষদের পাশে থাকে, সেই রাস্তা দেখিয়েছে ভারতের সংবিধান। যেমন

২১ নম্বর ধারা। আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনও মানুষকে তাঁর জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৪১ নম্বর ধারা। ভারতের সমস্ত প্রবীণ নাগরিকদের জন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে রাষ্ট্র।

৪৬ নম্বর ধারা। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের আর্থিক উন্নতি সাধন এবং সমস্ত রকমের সামাজিক অন্যায় ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

সকল প্রবীণ ও নিঃসম্বল মহিলারা সংবিধানের এই ধারাগুলির আওতায় পড়েন। তাই শেষ বয়সে বিপদে পড়লে কড়া নাড়া যায় আইনের দরজায়।

ভারতের অন্যান্য আইনগুলি কী বলে?

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩। নিজেদের 'প্রতিপালনে অক্ষম' মায়েরা সন্তানদের কাছে ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ নং ধারা অনুযায়ী খোরপোষ চাইতে পারেন। খোরপোষ পাওয়ার কোনও ঊর্ধসীমা নেই। তবে প্রমাণ করা জরুরি, মাকে 'অবহেলা' করছেন সন্তানেরা। সন্তানের রোজগার এবং মায়ের প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর রেখে আদালত মাসিক খোরপোষের পরিমাণ ধার্য করেন।

হিন্দু দত্তক ও রক্ষণাবেক্ষণ আইন, ১৯৫৬। এই আইনটির ২০ নম্বর ধারায় ছেলে এবং মেয়েকে তাঁদের অশক্ত ও বয়স্ক মাকে দেখাশোনা করার আইনি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 'মা' বলতে এখানে নিঃসন্তান সৎ মায়ের কথাও বলা হয়েছে।

মুসলিম, খ্রিস্টান ও পারসি ব্যক্তিগত আইন। মুসলিম আইনে আর্থিকভাবে দুর্বল মায়েদের দেখভাল করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁদের সন্তানদের ওপর। খ্রিস্টান ও পারসিদের ব্যক্তিগত আইন এই ব্যাপারে নীরব। সেক্ষেত্রে অভাবী মায়েরা ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ নং ধারা অনুযায়ী খোরপোষ চাইতে পারেন।

আইন, ২০০৫। অনেকেরই একটি ভুল ধারণা রয়েছে, স্ত্রীরাই কেবলমাত্র এই আইনের আওতায় পড়েন। আসলে মায়েরাও এই আইনি রক্ষাকবচের সুবিধা পেতে পারেন। ছেলের কাছে গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হলে, এই আইনে আদালতে যাওয়া যায়। সেখানে তাঁরা আর্থিক সুরক্ষা দাবি করতে পারেন ছেলেদের কাছে। দাবি করতে পারেন বাসস্থান সংক্রান্ত সুবিধা বা সেই সংক্রান্ত খরচ। সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে মায়েরা প্রোটেকশন অফিসারের নিরাপত্তায় থাকতে পারেন। অর্থাৎ, এই আইনের মাধ্যমে একই সঙ্গে আর্থিক সুরাহা, মাথা গোঁজার ঠাঁই, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

মাতাপিতা ও বরিষ্ঠ নাগরিক রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭। মাতাপিতা ও বরিষ্ঠ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণে আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও সেই হেতু আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরী করাই এই আইনটির মূল উদ্দেশ্য। তাই এই আইনের সুরক্ষা পেতে পারেন দরিদ্র মা ও প্রবীণ নিঃসন্তান মহিলারা। এই আইন অনুযায়ী ,'রক্ষণাবেক্ষণ' বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। 'কল্যাণ' বলতে খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিনোদন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বরিষ্ঠ নাগরিক বলতে ৬০ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের কোনও ভারতীয় নাগরিককে বোঝানো হয়েছে। ছেলে, মেয়ে, পৌত্র বা দৌহিত্র এবং পৌত্রী বা দৌহিত্রীর কাছে খোরপোষ চেয়ে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। তবে নাবালক হলে, এই আবেদন করা যায় না। জন্মদাত্রী ছাড়াও, আবেদন করতে পারেন পালক মা এবং সৎ মা। মা অবশ্য বরিষ্ঠ নাগরিক না-ও হতে পারেন। নিঃসন্তান বৃদ্ধারাও তাঁদের সম্পত্তির মালিক হয়েছেন বা হবেন, এমন আত্মীয়ের কাছে খোরপোষ দাবি করতে পারেন। মেইনটেন্যান্স ট্রাইব্যুনালে গিয়ে নিজেই দরখাস্ত করতে পারেন। মাসে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত খোরপোষ মিলতে পারে। ইচ্ছাকৃতভাবে বরিষ্ঠ নাগরিকদের পরিত্যাগ করলে এবং সেই অপরাধ প্রমাণ হলে, তিন মাস পর্যন্ত কারাবাস অথবা ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা কিংবা কারাদন্ড-অর্থদন্ড দু'ই কপালে জুটতে পারে। সম্পত্তি দানপত্র করে দেওয়ার পর দানগ্রাহকেরা যদি দানকারিনী বৃদ্ধার দেখাশোনা না করেন, তা হলে আদালতে গিয়ে দানপত্রটি বাতিল ঘোষণা করে সেই সম্পত্তি পুনরায় ফেরত নিতে পারেন সেই বৃদ্ধা। তবে শর্ত হল, দানপত্রে লেখা থাকতে হবে- 'দানগ্রাহকেরা বৃদ্ধাকে দেখাশোনা করবেন'। এই আইনে রাজ্য সরকারগুলিকে নিরাশ্রয় বয়স্ক মানুষদের জন্য বৃদ্ধাবাস তৈরি করতে বলা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা ও বিনোদন সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধে দিতেও সরকার দায়বদ্ধ। সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য মেইনটিন্যান্স অফিসার নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। ও অবহেলিত মায়েদের জন্য আইনের হাত প্রসারিত হয়েছে। প্রসারিত হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ। পুলিশ আছে, সেই সঙ্গে আছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হেল্পলাইন। তবু তাঁদের ওপর পারিবারিক নির্যাতন ও অবহেলা কার্যত মহামারীর আকার নিয়েছে। শারীরিক অক্ষমতা, আর্থিক অনটন, চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা, নিরাপত্তার অভাব সব মিলিয়ে এই মহিলাদের দুর্গতির সীমা নেই। তাই শুধুমাত্র আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেই সমস্যার সমাধান হবে না, প্রয়োজন মানসিকতা বদলের। পাশের বাড়ির ঘটনা বলে এড়িয়ে না গিয়ে সকলেরই প্রতিবাদ জানানো উচিৎ। কারণ এ ধরনের ঘটনার প্রভাব সর্বত্রগামী।

সেই সঙ্গে, নিরাপত্তার স্বার্থে বৃদ্ধা ও অসহায় মায়েদের কিছু সাবধানতা অবলম্বন করাও অবশ্য প্রয়োজন—

—অনেক আগে থেকেই নিজের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষার পরিকল্পনা করে রাখুন। ছেলেমেয়েদের ওপর নির্ভরশীল না থেকে, যতদিন সম্ভব সাবলম্বী থাকার কথা ভাবতে হবে।

—নিপীড়িতারা সাহস করে এগিয়ে আসুন, অভিযোগ জানান থানায়। আপত্যস্নেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও মনে রাখতে হবে, নিজের সম্মান নিজেকেই ফিরে পেতে হবে। তাই স্থানীয় থানার ফোন নম্বর অবশ্যই সঙ্গে রাখুন।

—পড়শিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলুন। প্রয়োজনে তাদের কাছে নিজেদের সমস্যা খুলে বলুন।

সবশেষে মনে রাখতে হবে, আপনাদের জন্যেও অনেকে আছেন। আপনারা কখনই একা নন।

রাখি পুরকায়স্থ
আইন বিশেষজ্ঞ Email: rakhe.pur@gmail.com

সেই পান্না সবুজ দিনগুলিকে ইচ্ছে করে পেতে

মনের আকাশে স্মৃতিরা যেন একেকটা জল ভরা মেঘ। একটু হাত দিয়ে সরাতে গেলেই টুপটাপ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। দু'হাতে ধরি সাধ্যি কী! কেবলই উপচে পড়ে।

আমার তিন বছরের নাতনি হাত ধরে টেনে আনে তার পুতুলের ভরভরন্ত সংসারে। কী নেই সেখানে! ওর তিনচাকা সাইকেলটা দেখেই মনে মনে চেপে বসি তাতে। সামনের আয়নায় চোখ রাখতেই দেখি একটা ঝাঁকড়াচুলো ছোট্টমেয়ে চেয়ে আছে। বলি, কে রে তুই? একটু যেন চেনা চেনা লাগছে। বিশেষ করে ওর ওই উলের লাল ফ্রকটা। কোমর থেকে দুটো উলের কদমফুল ঝুলছে। ও মুচ্‌কি হেসে বলল, চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার মেয়েবেলা। ওর চোখে চোখ রেখেই মনডুবুরি ডুব দিয়ে হুস করে চলে গেল পঞ্চাশ বছর পিছনে।

একদিকে পাহাড় আর তিনদিকে নদী দিয়ে ঘেরা এক প্রত্যন্ত চা-বাগান জয়বীরপাড়ায় জন্ম আমার। বারান্দায় দাঁড়ালেই নীল পাহাড়ের রেখা। পাহাড়ের বুকে এক গভীর ক্ষত চিহ্ন আজও চোখ বুঁজলেই দেখতে পাই। চারিদিকে সবুজ দিয়ে ঘেরা। পায়ের তলায় থাকে অনামী ছোট ছোট ফুলেরা আর পথের ধারের দন্ডকলস, হাতিশুঁড়ো, পুটুক্স, ঘেঁটুফুল, শিয়াল কাঁটারা ছিল ছোটবেলার সাথী। তিনচাকা সাইকেল চেপেই ঢুঁ মেরে আমি এলাকার আমার সেই ছোটবেলার টেবিলক্লথে ঘেরা টেবিলের তলার পুতুলঘরে। জুতোর বাক্সে জানলা দরজা বানিয়ে, বিস্কুটের টিনের খাঁজকাটা কাগজ দিয়ে ঘরের চালা বানানো হত। সাদা ন্যাকড়ার পুতুলের চোখ মুখ কালি দিয়ে আঁকা। কোনওটার ন্যাকড়ার লম্বা বিনুনি আবার কোনওটার বা মাথায় ঢাউস খোঁপা। পুতুলঘরের ছোট্ট ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখা ঝাঁকড়া চুলের মেয়েটা নিয়ে যায় মায়ের সেলাই মেশিনের সামনে। মেশিনের কাপড়ের একপ্রান্ত হাত দিয়ে টেনে ধরে বসে থাকে সে— একটুকরো কাপড়ের আশায়। মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করে, 'মা, এই টুকরোটাও লাগবে?' মায়ের গম্ভীর উত্তর, 'হ্যাঁ, ওটা পটি সেলাই করতে লাগবে'। হতাশ বিষণ্ণ মুখে তবু বসে থাকা যদি কিছু জোটে ছাঁটকাট থেকে।

স্কুল থেকে ফেরার পথে দর্জি দোকানের কমলদা কোনওদিন যদি একটুকরো কাপড় দিতেন— সেদিন বালুচরি-বেনারসি পাওয়ার আনন্দে বাড়ি ফিরে সটান টেবিলের তলায় পুতুলঘরে।

উঠোনের এক কোণে ছিল রান্নাবাটির সংসার। আনাজপাতির খোসা, পুটুক্স, ফুলের ফুলকপি, আমরুল ফল দিয়ে ঢেঁড়শ, শীতের আগাছা দিয়ে পালংশাক, বালির ভাত আর ইটগোলা ডাল রেঁধে ক্লান্ত হয়ে গামছা দিয়ে বানানো লম্বা চুলে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে কপট রাগ দেখানো, 'তোদের জ্বালায় আর পারিনে বাপু'! এই খেলায় সময় নষ্ট করে লেখাপড়ায় সময় কম দেওয়ার জন্য কতবার যে আমার পুতুল পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ছোট ছোট হাতে চোখের জল মুছে আবার কুড়িয়ে এনে নতুন কোনও কোণায় ঘর বেঁধেছে পুতুল মা।

আমাদের ছোটবেলায় উৎসবের ঘটাপটা একটু কমই ছিল। ওই দুর্গাপুজো আর দীপাবলি। সারাবছর অপেক্ষা ছিল তার জন্য। পুজোর মাসখানেক আগেই প্রতিমা গড়তে চলে আসতেন সুশীল কর কাকু। উনি ছিলেন আর্ট কলেজের লেকচারার। কাঠামোয় খড় বাঁধা থেকে সেখানে আমাদের নিত্য হাজিরা। যেদিন চক্ষুদান হত সেদিন সে কী উত্তেজনা— কেমন হল প্রতিমার মুখ!

আমাদের বাড়ির সামনেই 'পাতি ওজনঘরে' পুজোটা হত। মহালয়া থেকেই শুরু হত পুজো পুজো রব। মা সেদিন রাতেই স্টোভ ও চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখতেন। সেই কাকভোরে রেডিওকে ঘিরে আমরা ভাইবোনেরা মা-বাবার সঙ্গে মহালয়ার চণ্ডীপাঠ শুনতাম। মাঝে মাঝে ঘুমিয়েও পড়তাম। তারই মাঝে মা চা করে দিতেন— সেদিনের চা খাওয়ার আনন্দটাই ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মহালয়া শেষ হতেই সব বন্ধুরা মিলে হাঁটতে বেরোতাম। শিউলি ফুলে ছেয়ে থাকত গোবর নিকনো উঠোন। একপাশে গোয়ালঘর। মাঝে তুলসি মঞ্চ। ফুল কুড়িয়ে কিছুটা ঠাকুরঘরে, কিছুটা কাচের প্লেটে ঘরে রাখতাম। আমাদের অনাড়ম্বর জীবনে সাময়িক অন্দরসজ্জা। পুজোতে মা সবাইকে নিজে হাতে মেশিনে সেলাই করে এক রকমের জামা বানিয়ে দিতেন। পুজোতে আমাদের একটা বা দুটো জামা-ই হত। কোনওবার সংখ্যাটা বাড়লে অহংকারের শেষ থাকত না। ষষ্ঠী থেকে দশমী কীভাবে কেটে যেত টেরই পেতাম না। আশপাশের চা-বাগান থেকে লরিতে করে ঠাকুর দেখতে আসত। সন্ধ্যারতির সময় ছোটবড় সবাই ঢাকের তালে ধুনুচি হাতে আরতি করতাম। আমাদের বাগানের ডাকপিওন অমূল্যদার দু'হাতে দুটো, মুখে আর মাথায় একটা করে ধুনুচি দিয়ে বিশেষ নাচ আজও মনে আছে।

জুতোর বাক্সে জানলা দরজা বানিয়ে, বিস্কুটের টিনের খাঁজকাটা কাগজ দিয়ে ঘরের চালা বানানো হত। সাদা ন্যাকড়ার পুতুলের চোখ মুখ কালি দিয়ে আঁকা। কোনওটার ন্যাকড়ার লম্বা বিনুনি আবার কোনওটার বা মাথায় ঢাউস খোঁপা। লেখাপড়ায় সময় কম দেওয়ার জন্য কতবার যে আমার পুতুল পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ছোট ছোট হাতে চোখের জল মুছে আবার কুড়িয়ে এনে নতুন কোনও কোণায় ঘর বেঁধেছে পুতুল মা।

দশমীর ভাসান হত ফালাকাটার মুজনাই নদীতে। ট্রাকে চেপে সেই বিসর্জন দেখতে যাওয়ার আনন্দই ছিল অন্যরকম। এলাকার সব চা-বাগানের দুর্গাপ্রতিমাও আসত সেখানে। বেশ বড় একটা মেলা বসত। আমাদের চা-বাগানের নিস্তরঙ্গ জীবনে সেদিনটা একটা বিশেষ দিন হয়ে থাকত। বিসর্জন দেখে ফিরে দেখতাম মা থালায় ধান-দুব্বো সাজিয়ে নিয়ে বসে আছেন। সকলের মাথায় ধান-দুব্বো দিয়ে আশীর্বাদের পর নিমকি, গজা, নাড়ু, এলোমেলো, ছোলার ডালের তক্তিভরা প্লেট সবার হাতে ধরিয়ে দিতেন। তখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজয়ার প্রণাম করার রেওয়াজ ছিল— আর মিষ্টি মুখ তো বলাই বাহুল্য। কোন বাড়ির কোনটা স্পেশালিটি তা আজও মনে আছে। লক্ষ্মী পুজোতেও বাড়ি বাড়ি প্রসাদ নিতে যাওয়া আসার রেওয়াজ ছিল। ছোট জায়গায় সবাই সবার আত্মীয়র মত। ডাকগুলোতে ছিল ভীষণই আপনজনের মত। নিজেদের দাদা-দিদি ছাড়াও কত যে মেজদি, সেজদি, বড়মা, ছোটমা, ঠাকুরমা, দাদু ছিলেন। একে অপরের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াতেন সব সময়। কারও বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এসে গেলে রান্না করা খাবার তুলে দিয়ে আসতে দেখেছি মায়েদের। ভাইফোঁটাতেও নিজের ভাইয়েরা ছাড়া আরও অনেক ভাই ছিল ফোঁটার দাবিদার।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ছিল নিন্তাতই খড়ের চালের একটি লম্বা ঘর। পার্টিশান বিহীন এই ঘরের একদিকে বাংলার মাস্টারমশাই মধুদা পড়াতেন এক-দুই-তিন-চার। অন্যদিকে হিন্দি স্যার মহেশ ঝা পড়াতেন এক-দো-তিন-চার। ছাত্রছাত্রীদের সমবেত চেষ্টা থাকত একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার। আমার প্রাইমারি স্কুলের বন্ধুদের অধিকাংশই ছিল চা-শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়ে। কুল বাহাদুর, কৃষ্ণ বাহাদুর ছেত্রী, বাণসিং তামাং, মায়া লামা, উমা লামা, পুনিয়া ওঁরাও, জীবন, মঙ্গল ভগত। পুনিয়ার দুই ভ্রূর মাঝে ছোট্ট একটা উল্কির টিপ আঁকা ছিল। বাংলা পড়তাম প্রকাশ বুবুন, টিংকু, হাবুল, বিজলী, মঞ্জু ও আরও কয়েকজন। সবাই মিলে একসাথে খেলতাম। কোনও বাছবিচার ছিল না।

সরস্বতী পুজো কেবল স্কুলেই হত। সেদিন মায়ের শাড়ি পরে অঞ্জলি দিতাম। একবার আমার দাদারা সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' নাটকটা অভিনয় করেছিল, মায়েদের শাড়ি দিয়ে স্টেজ বানিয়ে। মনে পড়ছে কেউ কাপড়ের জানালায় ভর দিয়ে সংলাপ বলতে বলতে হুড়মুড়িয়ে বাইরে এসে পড়েছিল। দর্শকরা হেসে গড়াগড়ি। আর ভিতরে কুশীলদের মধ্যে প্রবল মারামারি লেগে গিয়েছিল। সে এক কান্ড!

আমাদের বাড়িতে দুটো বাইশ ইঞ্চির সাইকেল ছিল। ক্লাস থ্রি থেকেই সেগুলো দিয়ে সাইকেল শেখার শুরু। প্রথমে হাফ প্যাডেলে কোমর বেঁকিয়ে প্রবল চেষ্টা সেটাকে কব্জা করার। দিনের শেষে প্রচুর বকুনি— 'কে হ্যান্ডেল বেঁকিয়েছে, বলবেয়ারিং-এর দফারফা করেছে'? তাতে অবশ্য আমার সাইকেল শিক্ষায় ছেদ পড়েনি। দাঁড়ানো কোনো সাইকেল দেখলেই তখন সেটা নিয়ে এক চক্কর মেরে আসা— তা সেটা যারই হোক না কেন। ততদিনে শিক্ষা সমাপ্ত শরীরে অজস্র ক্ষত চিহ্নের বিনিময়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতা থেকে তুতো ভাইয়েরা এলে তাদের নিয়ে বান্দাপানি পাহাড়ের ঝরনা দেখতে নিয়ে যাওয়া তখন জলভাত।

একবার আমাদের চা-বাগানে এসএসবি-র (সশস্ত্র সীমা বল) জওয়ানরা রাইফেল ট্রেনিং ক্যাম্প করেছিলেন। মা-কাকিমারাও ট্রেনিং নিতেন। আমরাও লেজুড় হয়ে যেতাম সঙ্গে। জওয়ান কাকুরা খুব ভালবাসতেন। হাতে ধরে রাইফেলের যন্ত্রাংশর খুঁটিনাটি আমরা ছোটরাও শিখে ফেলেছিলাম। এখনও সেই পান্ডেজি, পাঠকজি, সুধাংশু গায়েন কাকুর কথা স্পষ্ট মনে আছে। ট্রেনিং শেষে ফিরে যাওয়ার সময় ওদের চোখের জলকে আজও ভুলিনি।

আমার মা ও পাড়ার কাকিমারা গল্পের বই পড়ার তাগিদ থেকে একটা লাইব্রেরি তৈরি করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'মৈত্রেয়ী লাইব্রেরি'। বই ভরতি বড় একটা কাঠের আলমারি। সেটার দায়িত্ব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকেই নিতে হত। সপ্তাহে একদিন সবাই বই নিতেন পছন্দমত। চাঁদাও ছিল নামমাত্রই।

বড়দিনের ছুটিতে আমরা ছোটরা সবার বাড়ি থেকে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ডিম দিয়ে চড়ুইভাতি করতাম কারও বাড়ির উঠোনে। মায়েরা কেউ রান্না করে দিয়েছেন। ডিমের বড়ার ঝোল, ডাল, আলুভাজা, চাটনি— মাটিতে বসে কলাপাতায় খাওয়া— সে যেন অমৃতের স্বাদ! সে কী আনন্দ। এখন ভাবি কত অল্পেই না সন্তুষ্ট ছিলাম আমরা।

ক্লাস ফাইভে বীরপাড়া হাইস্কুল। শৈশবকে পিছনে ফেলে কৈশোরে পৌঁছালাম। ট্রাকের পিছনে দাঁড়িয়ে ছয় কিলোমিটার দূরের স্কুলে যাওয়া, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ওই খোলা ট্রাকেই যাতায়াত বিরবিটি ঝোরা পেরিয়ে। সারা বছর ধূ ধূ বালির এই নদী বর্ষায় প্রলয়ঙ্করী রূপ নিত। এমনও হয়েছে স্কুলে গিয়েছি তারপর টানা কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে নদীর জল এতটাই বেড়েছে যে নদীর পারে দাঁড়িয়ে ভিজেছি কখন ওই জল কমবে সেই দিকে তাকিয়ে। বাড়ি ফিরতে রাত এগারোটাও হয়ে গিয়েছে। খিদে-তৃষ্ণায় কাতর ছোট ছেলেমেয়েরা যেন সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেবার পাঠটুকুও ওখান থেকেই নিতে শিখেছিলাম।

চা-বাগানে বৃহস্পতিবার হাট বসত। গুদরি বাজার খুব সম্ভবত 'গোধূলি' শব্দেরই অপভ্রংশ। এই বাজারের একটা আলাদা চরিত্র ছিল; গন্ধ ছিল। আজও চোখ বুঁজে সেটাকে খুঁজি। রাস্তার দু'ধারে দোকানিরা পসরা নিয়ে বসত। চাল, ডাল, মশলা, শুঁটকি মাছের ভাগা, কাচের চুড়ি, জামা-প্যান্ট, আনাজপাতি, জুয়ার ঠেক, কী না বসত সেই হাটে। একপাশে শুয়োর কেটে বিক্রি হত। ভয়ে ওইদিকে তাকাতাম না। হাঁড়িয়ার বিশাল হাঁড়ি নিয়ে আদিবাসী রমনীরা বসত। মনমোহনদার বিশেষ চানাচুর আর কাচের চুড়ির লোভে দু'-একবার যে হাটে যাইনি তা নয়। তবে আমাদের নিষেধ ছিল হাটে যাওয়া। স্কুল থেকে ফেরার সময় চোখে পড়ত বিশালদেহী অত্যন্ত সুদর্শন ও ভদ্রস্বভাবের

ট্রাকের পিছনে দাঁড়িয়ে ছয় কিলোমিটার দূরের স্কুলে যাওয়া, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ওই খোলা ট্রাকেই যাতায়াত বিরবিটি ঝোরা পেরিয়ে। সারা বছর ধূ ধূ বালির এই নদী বর্ষায় প্রলয়ঙ্করী রূপ নিত। এমনও হয়েছে স্কুলে গিয়েছি তারপর টানা কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে নদীর জল এতটাই বেড়েছে যে নদীর পারে দাঁড়িয়ে ভিজেছি কখন ওই জল কমবে সেই দিকে তাকিয়ে।

কাবুলিওয়ালারাও সেদিন হাটে আসত ঋণ দিতে ও সুদের টাকা নিতে। রহিমপুর থেকে রাইমোহনবাবু আসতেন রেডিমেড জামাকাপড় নিয়ে। বেশিরভাগই খাঁকি রঙের হাফ প্যান্ট আর ছিটকাপড়ের জামা। টায়ারের চটিও বিক্রি হত। এ দিনটা তলব অর্থাৎ পেমেন্ট হত তাই হাটও বসত ওই দিনই। সবার কাছেই এই দিনটা যেন এক ঝলক বাইরের হাওয়া ছিল। একটু বেহিসেবী হওয়া। হাঁড়িয়ার সৌজন্যে কিছুক্ষণের জন্য অনেক না পাওয়াকে ভুলে থাকার ছুতোর মত।

চা-বাগানে বিনোদন বলতে তো কিছুই ছিল না। কালেভদ্রে সাদা পর্দা খাটিয়ে প্রোজেক্টরের সাহায্যে সিনেমা দেখান হত। পর্দাটা আমাদের বাড়ির সামনেই টাঙানো হত। সবাই তাই আমাদের বারান্দায় বসে সিনেমা দেখতেন। তবে যেহেতু ওটা ছিল পর্দার পিছন দিক, তাই সবই উল্টো দেখতাম। মাঝে মাঝে রিল বদলানো হত। সেদিন সবার খুব আনন্দ হত। হোক না উলটো সিনেমা, তাই সই।

এমনিতে তো সন্ধে লাগতেই চারদিক শুনশান— লণ্ঠনের আলোতে পড়ুয়াদের পড়াশোনা, মায়েদের সেলাই ফোঁড়াই, বাবাদের তাসের মজলিশ। রেডিওই তখন একমাত্র বিনোদন। শুক্রবারের নাটক, অনুরোধের আসর, সংবাদ পরিক্রমা, আর খবর তো ছিলই। সকাল ছ'টায় খুলত— খবরের পর সাতটা চল্লিশে রবীন্দ্র সংগীতের পরে বন্ধ হত। রবিবার শিশুমহল, সংগীত শিক্ষার আসর আর গল্পদাদুর আসরের আকর্ষণও কম ছিল না।

এমনি করেই স্কুল পেরিয়ে জলপাইগুড়ির কলেজে পৌঁছে গেলাম একদিন। ছোটবেলাটা বড়বেলা হয়ে গেল এক নিমেষে। মেয়েবেলার অজস্র স্মৃতির নুড়িপাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করি এখন। সবকটা নুড়িকে নামিয়ে আনি। নেড়েচেড়ে, ঝেড়েপুঁছে আবার তুলে রাখি।

তিস্তা পাড়ের এই আমিটা গঙ্গাপারে দাঁড়িয়ে ঘোলাজলে তিস্তার পান্না সবুজ জলকে খুঁজি, সঙ্গে আমার সবুজ সবুজ মেয়েবেলাকেও।

শমিতা বিশ্বাস

ধারাবাহিক কাহিনি। ২

মহারাণী কথা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

স্কেচ দেবাশিস সাহা

৩

একলাটি সোহাগিনী মাটির বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। উঠোনের জল খানিকক্ষণ দাঁড়াবে। তারপর চলে যাবে। কতগুলো হলদে আর সিঁদুর আম উঠোনভরা। ব্যথা সেই একভাবেই আছে খুব বাড়েনি। পায়ে পায়ে উঠোনে দাঁড়ায়। শাশুড়ি মা কর্তা-বাবার ঘর, উঠোন পেরোনো। ওটায় সদ্য পাকা কোঠা করেছে রাজীব। নিজে কিন্তু সেটায় ওঠেনি। '—বাবা মা আর কদ্দিন বল সোহাগ, ... ওঁরা ও ঘরে দুটো দিন আরাম করুন, কি বল... !' বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নেড়ে দিতে সোহাগিনীর একটুও দেরি হয়নি। এক কোঁচড় পাকা আম কুড়িয়ে, নিমের দাঁতনে দাঁত ঘষে কুয়োর পাড়ে তোলা জলে চোখ মুখ ধুয়ে নিতেই শরীর কেমন আনচান করে। মাথাটা ঘুরে যায়। পা টিপে খুঁটি ধরে এগিয়ে আসে বারান্দায়। কালো জল চৌকিটা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না শরীর ছেড়ে দেয়।

রোদ ফুটতেই পাখিগুলো এমন কিচমিচ করে, রাজীব বা ওর মা বাবার ঘুম মুহূর্তে ছোটে রোজ সকালেই। আজ রাজীবের ঘুম ভাঙে মা'র চিল চিৎকার আর ধাক্কায়। বারান্দায়, জল চৌকিতে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে সোহাগিনী। চারদিকে সিঁদুরে আমগুলো এদিক ওদিক।

...একি ...একি বৌমা... চোখে মুখে জলের ছিটে দিতেই যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে সোহাগ। —ইস্, ডাকনি কেন বৌমা, ডাকনি কেন... দে, রাজীব অমলাকে খবর দে, ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে হাসপাতাল। ডা. বসাককে খবর কর একটা, রাতুলকে পাঠা।...

সোহাগিনীর মাথার ভিতর তখন তার মায়ের অপরিচ্ছন্ন বেড়া ঘেরা আঁতুর ঘর, বছর বছর ভাইবোন বিয়োনো মায়ের মুখ কেমন যেন শীর্ণ হতে হতে ধুঁকতে ধুঁকতে ওই আঁতুড় ঘরে বিনা প্রতিবাদে ঢুকেছে। না ডাক্তার না আয়া মাসি, অন্তত ওই অমলাদির মতও কেউ নেই। কেমন কান্না ঝেঁকে আসে মা'র জন্য। সোহাগিনী ডুকরে কেঁদে ওঠে... মা মা গো বড় যন্ত্রণা মা...

শাশুড়ি মা কোলের মেয়ের মত সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সোহাগিনীর। দু' চোখের কোল জুড়ে জল ছাপিয়ে যায় ক্রমে আরও আরও দু' কুল ভরে। অ্যাম্বুলেন্স মাঝ রাস্তায় পেয়ে যায় রাজীবকে। ওদের থামিয়ে রিক্সা থেকে সোহাগিনীকে উঠিয়ে নেয়। আর রাজীব ধীর পায়ে উঠে বসে ওর পাশে। ততক্ষণে যন্ত্রণায় কাতরে যাচ্ছে সোহাগিনী। এ যন্ত্রণায় নীল হতে থাকা শরীরটার দায়ভাগ খানিকটা হলেও রাজীবের। মন খারাপ করে। নিজেকে কেমন দোষী মনে হয়। এ কি ভালবাসা ? দু'হাতে চেপে ধরে, দু' চোখের কোল মুছিয়ে দেয় সোহাগিনীর।

...ঠিক এইরকম বিধ্বস্ত ঝড়ের এক বিকেল হঠাৎ মনে পড়ে রাজীবের। ছুটতে ছুটতে আসছে সমীরণ —তুই শিগগির পালা, পালা রে এ শহর ছেড়ে। ওই বামুন পুরোহিত তোকে মারার প্ল্যান পাকিয়ে তুলেছে গুণ্ডা লাগিয়েছে। ওদের পাশের বস্তি এলাকার। আর একটা কথা— তোকে বলব কি না ভাবছি, বৌদিকে বলবি না কোনওদিন। বৌদির বাবা বৌদির সমান এক কুশপুত্তলি তৈরি করেছে। বাড়ির সামনে সেটা লাগিয়ে আওড়াচ্ছে— কন্যা মৃত তার কাছে। ত্যজ্যপুত্রী ঘোষণা করছে নিজ মুখে, ...দাউ দাউ জ্বলছে ওই খড়ের পুতুল ...আর রাজনগরে এমন ঘটনা কখনও কেউ দেখেছে! শুনেছে? — হা ঈশ্বর...।

হু হু করে কান্না বেরিয়ে এল রাজীবের। দু'হাতে আগলে নিল আর একবার সোহাগিনীকে; যে কি না এক কাপড়ে ঘর ছেড়ে এসেছিল রাজীবের সঙ্গে। তারই টানে। শুধু মাকে জানিয়ে।

—যা যা তুই চলে যা সোহাগ, এ নরক তোর জন্য না —যা...।

আর তারপরই বহু ইতিহাস তৈরি করতে চেয়েছে ওর বামুন পিতা। বেজাত কুজাত বলে ওদের বাড়িতে লোক লাগিয়ে রাজীবকে খুনের চেষ্টারও বাকি রাখেনি। তখন রাজীবের বুকের ভিতর ভালবাসার টানা বারান্দা। এখনও... —আমরা হারব না সোহাগিনী, কোনওদিন না, দেখ ঠিক...

***

সেই তো এম জে এন হাসপাতাল করিডর। এখনকার মত ঘিঞ্জি নয়। অল্প ক'খানা পেইংবেড। সাতটা বেজে গিয়েছিল ভরতি করতে সোহাগিনীকে। যন্ত্রণা আর চেনা চেনা মুখের নার্সসহ সোহাগিনী যখন লেবার রুমে... রাজীবের বিরাট আকাশ জুড়ে এ কার প্রতীক্ষা! বাড়িতে মা-বাবা কার পদধ্বনি শুনতে বুক পেতে আছে...

উলুধ্বনির জোরাল শব্দ, আর শাঁখের জয়ধ্বনিতেই বাড়ি ফিরেছিল মহারাণী। ...ছোট্ট এক পুঁটুলি খুকুটি। মাথার চুলের ঝাপটে মুখ থুতনির খাঁজটুকু ঢাকা পড়ে আছে, সাগর জলের কাচ কাচ ছায়া, মণিতে কুচকুচে কালো ভাব নেই, এ আদর কোন কন্যার ...এত লক্ষ্মীর মত পুজো করে তোলা

... তবু মুহূর্তে মা সোহাগিনী কি একবারও ভেবেছিল একবারও... 'এক ছেলে হোক...'

ইস্টিকুটুম মাথার কাছে ডেকে ডেকে গলা ফাটিয়েছিল 'গৃহস্থের খোকা হোক'

...বলুক গে, চেঁচিয়ে গলা ভাঙুক; এ বাড়ির কর্তা বাবা থেকে শুরু করে প্রতিটি সদস্যের মনজুড়ে 'মহারাণী' আর 'মহারাণী'।

কে যেন ডাকে! ...সোনার খনি তো তুই... এই তো উঠোন জুড়ে বেড়ে ওঠা। এত ওর একার সাম্রাজ্য।

'সম্রাজ্ঞী মিত্র'। স্কুলের খাতা কলমে অবশ্য লিখিয়ে ছিলেন বাবা রাজীব মিত্র, সে-ও ততদিনে পূর্ত দপ্তরের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার।

***

বাড়ি জুড়ে এ কেমন আদর কেড়ে নেওয়া গাছ ভালবেসে শেওলার রং ভালবেসে টুক টুক কাচপোকা টিপের মেয়ে ঘোরতর খেলাঘরের পুতুল। আর পাঁচ জনের পাঁচ কথা। প্রথম দোলনায় থাকা মেয়ে নিয়েও সমস্যা।

—আরে হয়েইছে তো সোয়া দু' কেজি! বাঁচবে না মরবে কে জানে! তার উপর সারাদিনে রাতে কান্নার আওয়াজ নেই, এ কি রে বাবা, বোবা হবে নাকি, ক্ষিধেও কি পায় না!

...সোহাগিনী ওসব কানে তোলে না। অনেক কথা ইচ্ছে করে কানে তোলানো হয়... ধুর মেয়ে সন্তান, তার আবার জন্মদিন পালন। দেখিস না কপাল জোড়া দুঃখ হবেই। কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

কঠিন মুখ সোহাগের। ঘর আর বাইরে কাজ আর কাজ। শাশুড়ি ঠাকুরণ চলে যাওয়ার পর কত হিতৈষীর আনাগোনা

... মহারাণী সদ্য তখন নিজেকে বড় বলে ভাবতে

শিখেছে।

— কী রে সোহাগ, মেয়েডারে কিছুই তো কাজ শিখাইস না, এক গেলাস জল গড়ায়া খায় না; কী করবি যে... তুই জানিস। এরই মধ্যে বেড়ে ওঠে রাণী— মহারাণী। দু' হাত আকাশ জুড়ে কী যে শাশ্বত বিন্নিধানের খোঁজে। জীবন জুড়ে ইটারনাল সার্চ। মাথা উঁচু, চোখ সোজা আকাশে। বুকের মধ্যিখানে কি ঘর গেরস্তালি ছিল না কখনও! ছিল। একবার মুখ ফুটে বলতে না বলতেই রাজীব মিত্রের বাড়ির মিস্ত্রী ছোট্ট এক ঢেঁকি বানিয়ে দিয়েছিল মাটির বারান্দার এক কোণে। মাটির গর্তে বড়দের মতই মহারাণীর ঢেঁকি ওঠে আর নামে ওর ছোট শরীর নামাওঠা করে বড়দের ঢঙে। হুম্ হুম্ শব্দ ওঠে বড়দের মত।

***

—বেশ আছিস ভাই তুই রাণী। আমরা কেন যে তোর মত ...এই তোর মত জন্মালাম না, তোর মত মা বাবা আমাদের নেই কেন... ইস্ তোর মত এমন কুঁচকোনো মাথাভরা চুল নেই কেন! ...এই যে ছোট ছোট ক্ষোভ, না পাওয়াগুলো সব জমে জমে ঈর্ষার বাড়িঘর। যা কি না এ মুহূর্ত পর্যন্ত বয়ে বেড়ায় মহারাণীরা, এই মধ্যকালের মহারাণী। যৌথ বাড়ির আশপাশের সমবয়সীদের চোখে যেটা ফুটে উঠে ছড়িয়ে গিয়েছিল বড়বেলায় বিস্তৃত ধারাবাহিকতা ছড়ায় পরের প্রজন্ম টানে। ...না শ্রদ্ধা নয়, ঈর্ষা। ...আর কত মা! আর কত! থামো এবার। দু' চোখ বলে আর বাঁশি কেন— থামাও তোমার বাঁশি, হো হো হেসে একপাক ঘুরে নিতে ইচ্ছে হয় সেই আবছায়া নব রাজবধূটির মত। সেও স্থির হয়নি। বহন করেছে ব্রাহ্ম ধর্মবেত্তার রক্ত, ছড়িয়ে দিয়েছে বীজে, শস্যখেতে।

কেন স্থির হবে, কেন! তাহলে তো হেরে যাওয়া। সে হারবে না। I still look for you / oh! My golden winter paddy / Dazzling with radiance / when will my search end / For making milky white / Perched rice full of rich aroma??...

কচি বয়সে যার খোঁজ শুরু এখনও সে যাত্রা চলছেই। রাস্তার দু'পাশে বিছিয়ে রাখা সোনার রঙের ধান দু'হাতে নেড়ে দেয় বড়দের মতই। এ বিছিয়ে রাখা রাজনগরের সোনার ধানে যে বড় ভালবাসাবাসি।

৪

রাজবাড়ির মাঠে আজ খেলা। হই হই অনেকদিন ধরেই। রাজার খেলা বলে কথা। মাঠের চারদিক লোকারণ্য, কেউ সে সময় ভাবতে পেরেছে পতৌদির নবাব পুত্র আজ আসছেন! মহারাজার নামে সব জয়ধ্বনি করছে গো! করবেই। এমন সব পেয়েছির রাজা কেউ দেখেছে নাকি কোনওদিন! বড় অদ্ভুত ভালবাসা... বড় মাটির রাজা গো!

সেই কবে ব্রিটিশ সরকার বন্ধু হয়েছিল, তবেই না এ শহর এক্কেবারে পরিকল্পনা মত মাপজোক, রাস্তার মধ্য দিয়ে ইনার জলস্রোত, চওড়া রাস্তার দু'পাশে পামের সারি, তল্লিগাছ আর চওড়া নয়ানজুলির কলকল জল খুব স্বচ্ছ। হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে চুক্তিপত্র জমে উঠেছিল একেবারে, তারপর রাজ্য রাজধানী নিজের মত সাজানো ছিল, মনের ভিতরের পরিকল্পনাটি মাথার ভিতর সুন্দর ছকে নিয়েছিলেন রাজা, এমনই কি আর রাজার শহর! স্থান থেকে স্থানান্তরে কম তো বদল হয়নি রাজধানী... বাসস্থান। কোথায় পর্দানসীন রাজ্য, কোথায় যবনিকার আড়ালে রাজনগরের নারী! কয়েকধাপ এগিয়ে ছিলেন মহারাণী বৃন্দেশ্বরী। আহা! চাপ। দুঃখগুলো নিয়ে তিলে তিলে কেন কোণে বসে বয়স বাড়াবেন! মনের ভিতর যে স্বাধীন হাওয়া বইছে। তাই বলে বেরিয়ে পড়া যত্রতত্র, তা তো না, খাতা পেন্সিলে আখর তুলতে কে দিয়েছে বাধা? কেউ না। বরং খাতায় পৃষ্ঠায় মনের মাধুরী মিশিয়ে পুরান কথা চলুক না! রাজা থাক রাজার মত রাজ্যপাট আর সৌন্দর্যানয়নে অথবা পরিকল্পনায় মহারাণী এগিয়ে চলুক সে সময়ের উড়ন্ত উড়ানে... খেলার মাঠের হই হই ছবি গল্পকথা হয়ে লেগে আছে এ শরীর আর মাটির গন্ধে...

ইতিহাসের সেই ছবি। নরনারায়ণের মহিষী ভানুমতী অহমে নৌবহরে যুদ্ধে রত। তীরধনুক নিয়ে পুরুষের সঙ্গে কাঁধ মেলানো, ভাবা যায়! রাজসিংহাসনে রাজার পাশের আসনটিও যে তাঁর জন্য বাঁধা। এই যে দূরদর্শিতা, প্রজাদের জন্য চিন্তাভাবনা আর তাঁর শিক্ষানুরাগ মহারাণীর কাছে বহু দূরের ইতিহাস নয়। এই যে আজও ঠিক একইরকম সবুজ ঘাসে অদ্ভুত মাঠে সাদা দাগগুলোকে কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে! সেই তো বেড়ে উঠতে উঠতে মহারাজার অসীম ক্রিকেট প্রীতি, সঙ্গে গল্‌ফ আবার ফুটবলও কিছু কম যায় না... এ গল্প বলতে বলতে মহারাণীর বাবা রাজীবের গলার স্বর বুজে আসত। এক অদ্ভুত চোখের ঘোর লক্ষ্য করত রাণী। চোখ দুটোর ভিতর দিঘির গভীরতা মেপে নিতে পারত মেয়ে। চশমার আড়ালে ঝকঝকে চোখ দুটো তখুনি যেন চোখের সামনে দেখছে রাজবাড়ির সামনের মাঠের অসংখ্য দর্শক, ভিড় ভিড় মাটি। মধ্যিখানে মাঠের সবুজকে মেখে রেখেছে খেলোয়ারি সাদা পোশাক। হাতের ব্যাটের ধার, ব্যাটে বলের সংঘাত শব্দ রুদ্ধশ্বাস দর্শকের নীরবতা আর গভীর শ্বাসের ভিতর থেকে সমস্ত মাঠে ছড়িয়ে যেত। কখনও বৃষ্টি নামত ঝেঁপে, একটু দূরে জলাশয়ে টুপটুপ বৃষ্টির ফোঁটায় জল বৃত্ত তৈরি করত, ফড়িং উড়ে বেড়াত এধার থেকে ওধার। পাখিগুলোর মন কেমন করা চিৎকার আর ডানায় ভিজে ওঠা জলের উল্লাস অথবা আশ্রয় খোঁজার তীব্রতা এসব নিয়ে যে ছবি তৈরি হত, সে ছবির ইমারত তুলিতে যেন এঁকে যেত রাজীব মিত্র শব্দ দিয়ে। মহারাণী ছবির মত দেখতে পেত রাজনগরের রাজাদের ছবি চিত্রকলা। পরপর হেঁটে চলা হাতিদের, কখনও বা নদীর দিকে, নয়ত মহারাজাকে পিঠে বসিয়ে হাওদা পরিয়ে সাজোয়া চড়িয়ে সাজিয়ে তুলেছে মাহুত। দূর থেকে মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখছে ওরা এ গড়ে তোলা নগরীর রূপকারকে। মুহূর্তে এক পৃথিবীকে মুঠোর মধ্যে ভরে এনে ফেলতে চেয়েছেন মহারাজারা বংশানুক্রমে। সাজিয়ে তুলে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের অদ্ভুত সব কৌশলে রাজবাড়িকে সেই সঙ্গে শহরের টান টান রাস্তা আর নয়ানজুলির অপরূপ কারুকীর্তিতে, কে বলবে শহরের আবর্জনা জঞ্জাল কোথায় মুখ লুকিয়েছে!

এই কথাগুলোই বসে বসে ভাবছিল সম্রাজ্ঞী কলেজের সিঁড়িতে বসে। দেখতে দেখতে কলেজ। উন্মুখ সবুজ মাঠে আজ তো স্পোর্টস, এই ভাবনাগুলোও তাই ঘুরে ঘুরে সময় পেরোয়। বার বছর চলে যাওয়া মানেই তো একটু করে সরে যাওয়া আর জমতে থাকা শব্দ আর কথাকাহিনির ভিড় মানুষের মিছিল, একের পর এক জমে থাকা ইতিহাসের ভিড়।

আজ বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দেখে এসেছে বাবার অসুস্থতা। অ্যাসিডিটি হচ্ছে আজকাল, যা খাচ্ছে তাতেই। আসলে ওই ঠাম্মার চলে যাওয়ার পর থেকেই কেমন জল গভীর শূন্যতা। মাটির বারান্দা কবে যেন সিমেন্টে বাঁধাই হয়েছে, তবু সেখানেই মাটির বারান্দার ছবি দেখে রাজীব, আর তার মেয়ে মহারাণী। সামনের উঠোনে এখনও ঝড়জলে পাকা লাল টুকটুকে আম এসে পড়ে। আম কুড়োতে বাড়ির ক্ষুদেরা দৌড়ে গেলে কী হবে, মহারাণী জেনেই গিয়েছিল ঠাম্মা কাউকে সে আম ছুঁতেও দেবে না। সবচেয়ে টুসটুসেটি মহারাণীর জন্য ধুয়ে কেটে সাজিয়ে দেবে ঠাম্মা; সেই গভীর প্রশ্রয়, সেই অদ্ভুত কোল কেমন করে যেন নিভে গেল, সেই তখন থেকেই রাজীবের সমস্ত কাজ সেরে সন্ধের 'মা' বলে ডাক দিয়ে ঘরে ফেরা বন্ধ হয়ে গেছে। উদাসীনতা কাটতে যতখানি সময় নিচ্ছে রাজীব ততটাই উদাস হয়েছে বাড়ির এদিক ওদিক মানুষজন, সবমিলিয়ে ক্ষুদে মহারাণীও কেমন করে শোক বহন করে নিয়ে যেতে হয়, বুকের ভিতর চাঁদের বুকের মত স্ফটিক তৈরি করে নিতে হয় শিখে গেছে। আর সম্পূর্ণ অবস্থা একা সামাল দিচ্ছে সোহাগিনী, মহারাণীর মা। শোকের প্রকাশ কোথাও লেগে থাকে না তার। একদিকে রাজীবের শরীরের জন্য পথ্য রান্না, মহারাণীর একটুতেই শরীর খারাপ হয় বলে ঠান্ডা যেন না লাগে, পেট যেন খারাপ না হয় চলতে থাকে সেবা। আজও বেরনোর সময় সোহাগিনী মেয়েকে রেঁধে দিয়েছে পেঁয়াজ রসুন ছাড়া ঘি গরম-মশলার মাংস— নিরামিশ। কেন! তার কারণ, রাণী আজকাল হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছে। পেঁয়াজ রসুন চলবে না। এসব সামাল দেয় কী করে সোহাগিনী!

মাকে নিয়েও ভাবতে বসে মেয়ে— সে বাড়ির বাইরে সম্রাজ্ঞী আজ স্পোর্টসের দিনেও রাজবাড়ির ইতিহাস খুঁজছিল আর মাকে মনে হয়েছিল ঠিক ভানুমতী... এ যুগে জন্মেছেন যেন, এ যেন অন্যরকম রাজ্যপাট, অন্যভাবে সাম্রাজ্য চালানো। সেই মাটিই তো লেগে আছে শরীরে, পুলকিত হয় সম্রাজ্ঞী... আর ঠিক তখনই হই হই করে এসে পড়ে ওরা ...উত্তম, বিদ্যুৎ, কাঞ্চন, সিদ্ধার্থ, অম্বালিকা-রা ...'কী রে... সম্রাজ্ঞী ছায়াতে বসে বেশ জিরিয়ে নিচ্ছিস তো! ...ওদিকে আমরা দৌড়ে মরছি... দেখ, তুই ম্যাগাজিনে আছিস বলে ভাবিস না ক্রীড়া বিভাগে কোনও কাজ করবি না, চল চল নইলে পত্রিকা বের করার সময় এলে না... কালঘাম বেরিয়ে যাবে, কেউ থাকব না আমরা বুঝবি তখন। ...আচ্ছা আচ্ছা, চল বাবা চল। ওরই ফাঁকে অরুণের সঙ্গে এক পলকের চোখে চোখ পড়ে।

একটু কি বুকের ভিতর শিরশিরিয়ে ওঠে... ইসস্ চোখ নামিয়ে নেয় সে। বুকের ভিতর লাব ডুব লাব ডুবের শব্দ কানের ভিতর অস্বস্তি তোলে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে আরও বেশি রকম উৎসাহে মাঠের দিকে দৌড়ে যায়। পিছনে খুব ধীরে অরুণ নামের ছেলেটা এগতে থাকে ওদেরই দিকে।

৫

মহারাণী ভানুমতী ছেলেদের একেবারে সঠিক শিক্ষায় মানুষের মত মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। স্বামীর সহায়তা করা ছাড়াও সংস্কৃত পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ-কে দিয়ে প্রয়োগ রত্নমালা ব্যাকরণ রচনা করিয়েছিলেন। এই সমস্ত রাজবাড়ির গ্রন্থাবলীর টুকরো টাকরা খবর গন্ধর্ব নারায়ণের লেখা বংশাবলীতে আছে।

মহারাণীর উঠোন ঘুরে ঘুর ঘুর আর ঠাকুমার কালো খাট, কালো জল চৌকিতে বসে এসব বইয়ের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সেরে নেওয়া, লাল রঙের শালুতে জড়ানো থাকত কুলুঙ্গীর উপর। রোজ সন্ধ্যায় তুলসী তলায় সোহাগিনীর প্রদীপ দেখানো, শাঁখে ফুঁ —ঠিক তখনই ঠাম্মার হাঁক শোনা যেত 'রাণী... রাণী... আয়— অষ্টোত্তর শতনাম শুনবি তো—

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

শালবনে রক্তের দাগ

অন্ধকার নেমে এসেছে চিলাপাতা অরণ্যে। ওরা চলে যাচ্ছে কাজ শেষ করে। আমার কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল নিখিল। রাতের অন্ধকারে কেমন অনায়াসে চাঁদের কাছে চলে যাচ্ছে ও। আরও কারা এসে ঘিরে ধরেছে আমার কবর। ছায়া ছায়া কিছু মানুষ কারা এসেছে! আমার কোথায় যেন যাওয়ার ছিল কী যেন করার ছিল! হাঁড়ি থেকে বের করে আনছি সাপের বাচ্চাটাকে সাপুড়ে টাকা দিচ্ছে আমার হাতে! টাকাগুলো উড়ে যাচ্ছে। উড়ছে! আমি হারিয়ে যাচ্ছি গরম তরলে! মা গো! সাগরিকা রায়ের ধারাবাহিক থ্রিলারের শেষ পর্ব।

৪৫

গলাটা বাড়িয়ে দিলাম। অঝোর বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে আমার মুখ, মাথা। মহিলাটি এগিয়ে আসছে। জলে ভিজে ঝুপ্পুস হয়ে আছে। শরীর উন্মাদ করে দেওয়ার মতো করে ভিজেছে। লেপটে আছে শাড়ি যৌবনকে। ভেজা চুল মুখের ওপর থেকে সরিয়ে হেসে উঠল মহিলা। আমি চমকে উঠেছি ততক্ষণে। কী আশ্চর্য! এ সেই ফিনাইল বেচতে আসা তরুণী! হাসতে হাসতে হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাকে। তারপরেই ছুট লাগাল। আমি আশ্চর্য হয়ে পিস্তলটা একবার টাচ করে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। তাড়া করে ছুটলাম মেয়েটির পেছনে! আজ যেভাবেই হোক, ওকে ধরতে হবে! কে এই মেয়ে? কার হুকুমে চলছে ও?

রাস্তায় জলে জলে অথৈ পুকুর। নদী নালা একাকার। ভুল করে ডিপ নালায় পড়ে যেতে পারি ডাঙা ভেবে! মেয়েটিকে চোখের আড়াল করা যাবে না। ও আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়? অযথা রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছিল, একথা অবিশ্বাস্য লাগছে। প্রথম দিন থেকে এই মেয়ে আমার জীবনটা লন্ডভন্ড করতে চাইছে। কেন? রহস্যের শিকার হয়ে পড়েছি আমি। রাঘব আমাকে ডেকেছে। আমার দেরি হলে ও হয়তো বিপদে পড়ে যাবে!

জলের ভেতর দিয়ে ছুটতে হচ্ছে। জুতো ভিজে ভারি হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে চোখ মাটির দিকে রাখতে হচ্ছে। আবার খেয়াল করছি মেয়েটি হারিয়ে না যায়।

সামনে একটি পুরনো বাড়ি! কেউ থাকে বলে মনে হয় না! মনে হল জলের শরীরটা ওখানেই ঢুকে গেল।

বৃষ্টির জলে ভিজে যাচ্ছে বাড়িটা। গ্রাউন্ড ফ্লোরটা পাকা। ওপরতলা কাঠের। আজকের বাড়ি নয় এটা। বড় বড় গাছে ভর্তি বাড়িটা কেমন জীবন্ত যেন। আমি বাড়ির বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটা কোনদিকে গেল? বাড়ির গ্রাউন্ডে কোথাও লুকিয়ে আছে! এত তাড়াতাড়ি কোথায় পালাবে? কিন্তু পালাবেই বা ভাবছি কেন? পালাতে তো আসেনি ও! আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এখানে নিয়ে এসেছে! আমি কি ভুল করলাম এখানে এসে? ও কি ফের ফাঁদে ফেলল আমাকে? পিস্তল হাতে নিয়ে দেওয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখছি কোনও সাড়া শব্দ পাই কিনা! প্রবল বৃষ্টিতে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। কানে যেন তালা লেগে গেছে। একটা প্যাসেজ চলে গেছে ভেতরের দিকে। ওদিকে কী আছে? এক সারি ঘর দেখতে পাচ্ছি। কেউ থাকে বলে মনে হচ্ছে না। বারান্দায় শুকিয়ে আছে গরুর বর্জ্য পদার্থ। পাতা পড়ে ভিজে ঢোল হয়ে আছে। এমন মেঘ বৃষ্টিতে অন্ধকার হয়ে আছে প্যাসেজটা। ওদিকে মেয়েটা লুকিয়ে আছে বলে আমার বিশ্বাস। ওর কি সঙ্গী আছে কেউ? হতে পারে ওদিকের কোনও ঘরে কিছু লোক অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য! মেয়েটাকে দিয়ে আমাকে এই বাড়িটাতে টেনে এনেছে! যেভাবে আমি ডাকিয়েছিলাম রাজীবকে। সিন্ডিকেট ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছিল রাজীব। এক রাতে ওকে ডাকিয়ে এনেছিলাম বিশেষ কাজ আছে বলে। শ্যামলকে দিয়ে ফোন করিয়েছিলাম। রাজীব বাড়িতে বলেছিল সিগারেট আনতে যাচ্ছে। আসল কথাটা বলতে বারণ করা হয়েছিল ওকে। ওর পার্টনার গৌরকে না জানাতে বলা হয়েছিল। শ্যামল জানতো ওই সময়ে গৌর রাজীবের বাড়িতে থাকবে। গুলি করা হয়েছিল ওয়ান শটার দিয়ে।

সেই চিরাচরিত লোভ। রাজীব পার্টনারকে ঠকিয়ে নিজেই একা সাম্রাজ্য ভোগ করবে ভেবে শ্যামলের ডাকে বেরিয়ে এল। পাছে গৌর কিছু আঁচ করে, সে ভয় ছিল। সিগারেট কিনে আনছি— বলে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে... । আজ মেয়েটা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এই পোড়ো বাড়ির ভেতরে নিয়ে এল। আমিও পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে এসে পড়েছি এখানে! এটা কোন জায়গা... জানি না! আমি এদিকে আসিনি কখনও। বাড়ির ভেতর থেকে কোনও শব্দ পাচ্ছি না। অথচ মেয়েটাকে স্পষ্ট এই বাড়িতে ঢুকে যেতে দেখেছি। তার মানে হল, মেয়েটা এখানে ঘাপটি মেরে আছে! খানিকক্ষণ নিঃসাড়ে অপেক্ষা করলাম। না, বৃষ্টির শব্দ ছাড়া দ্বিতীয় শব্দ নেই। আস্তে আস্তে দেওয়াল ঘেষে ঘেষে পা বাড়ালাম। প্যাসেজের ভেতরে পা রাখতেই একটা সড়সড় শব্দ পেলাম। সাপ নাকি? এমন জঙ্গলে ভরা পরিত্যক্ত বাড়িতে সাপ থাকা বিচিত্র নয়! প্যাসেজের শেষে কী আছে? ঘরগুলো বন্ধ। প্যাসেজটা শেষ হয়েছে একটা সিঁড়ির কাছে। ছোট সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। সামনে বর্ষার জলে থই থই একসময়ের বাগান। যা এখন রীতিমতো ফরেস্ট হয়ে উঠেছে। না, না, মেয়েটা এই জঙ্গলে নামেনি। ও দোতলায় গিয়েছে।

আমি ব্যাক করলাম। দোতলার সিঁড়িটা কাঠের সিঁড়ি। দেওয়াল ঘেষে উঠে গেছে কোনও বাঁক না নিয়ে। উঠতে হলে সোজা উঠে যেতে হবে। ওপর থেকে গুলি চালিয়ে মাথা ফুটো করে দিতে পারে যে কেউ। ঝুঁকি নিয়ে উঠছি। একটা একটা করে ধাপ ভাঙছি, চোখ ওপরে নীচে দুদিকেই রেখে চলেছি। বলা যায় না নীচে থেকে আক্রমণ করতে পারে! আমাকে অযথা এখানে আনা হয়নি। আমি সব রকম পরিস্থিতিতেই অ্যাডজাস্ট করতে পারি। পা টিপে টিপে উঠলেও পুরনো কাঠের সিঁড়িতে খ্যাচ খুচ শব্দ উঠছে মাঝে মাঝেই। ওপরে কার পায়ের আওয়াজ পেলাম। এমন পজিশনে আছি, লুকিয়ে পড়ার উপায় নেই। সোজাসুজি সিঁড়িতে আছি। কোনও আড়ালে নেই আমি। খুব সহজে ফাঁদে পড়ে গেলাম। তবু আমি হয়তো আজ জানতে পারব রহস্যের আড়ালের মেঘনাদকে। আস্তে নীচু হয়ে বসে পড়লাম। সিঁড়ির ধাপে প্রায় শুয়ে পড়ে শরীরটা মিশিয়ে দিলাম। ঝট করে আমাকে দেখা যাবে না। উলটে আমিই আততায়ীকে দেখে ফেলতে পারব। ওই যে পায়ের আওয়াজ ক্রমে এগিয়ে আসছে! সিঁড়ির দিকে আসছে। কান পেতে বুঝতে পারছি এই আওয়াজ কোনও রমণীর রমণীয় পদক্ষেপ নয়। ভারী, সদর্পে চলা কোনও পুরুষের পায়ের আওয়াজ এটা! সে যে-ই হোক, আরেকটু এগিয়ে এলেই আমাকে দেখতে পাবে! পিস্তল আছে। একবার লক্ষ্যটা স্থির করার সুযোগ পেলে আমার নল থেকে পালাবার পথ নেই! বলে কিত্না আয়েগা, কিত্না জায়েগা! পজিশন নিয়ে নিলাম। তেরছা হয়ে শুয়েছি। প্রথম দুটো ধাপে যখন পা রাখবে, তখন আমি কোথায়— এই কৌতূহলে সামান্য অন্যমনস্ক থাকতে হবে ওকে। যদি একা থাকে। দুজন হলে আমার পক্ষে রিস্ক। যদিও এখন পর্যন্ত একজনের উপস্থিতি অনুভব করেছি। তো সেই সামান্য অন্যমনস্কতাকে কাজে লাগাতে হবে।

ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল মাথা নীচু করে লেপটে থাকতে থাকতে। কেউ তো নামছে না! পায়ের আওয়াজও নেই! নির্জন বাড়ির ঝুম ঝুমে শব্দ ছাড়া আর তো কিচ্ছু শুনতে পারছি না! কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? অর্থাৎ বাড়িটাতে হয়তো কেউ নেই বা হতে পারে আছে, কিন্তু সামনে আসছে না! আমি নীচু হয়ে থেকে লেপটে লেপটে ওপরে উঠতে থাকি। এমনও হতে পারে, ওপরে উঠে দাঁড়াতেই হেসে উঠল কিছু পিশাচ। যারা এতক্ষণ চুপচাপ লক্ষ্য করে যাচ্ছিল আমাকে। এবারে সটান দাঁড় করিয়ে গুলি না জানি না কীভাবে মারবে আমাকে! তারপরে বডি এই জঙ্গলে পুঁতে রাখবে! কত বৃষ্টির জলে ডুবে থাকব আমি!

নাহ, বাজে চিন্তা। এগুলো একসময় আমি করেছি। ফাঁদে ফেলে একটু একটু করে মেরে ফেলার মধ্যে যে কী আনন্দ! কী রোমাঞ্চ। উফফ! সেই ভাবেই ভাবছি নিজেকে উলটো দিকে রেখে। আমি পায়ের আওয়াজ পেয়েছি। যা এখন আর নেই! আমি একরাশ চুড়ির আওয়াজ পেলাম। কেউ ইচ্ছে করে হাত ভরা চুড়ি বাজিয়ে ছুটে গেল! প্রলোভিত করছে! এখনই যাব না আলেয়ার পেছনে। এদিকে আমাকে এসব করে আটকে রাখা হচ্ছে। রাঘবের কাছে যেতে দেওয়া হল না। জানি না, রাঘবকে মরে যেতে হল কিনা! রাঘব কোনও ভাবে গুপ্ত কথাটা জানতে পেরেছিল। বুঝেছিল আমাকেও ওরা বাঁচতে দেবে না। আরও কিছু কথা ছিল হয়তো। আমাকে জানাতে চেয়েছিল। পারল না মনে হচ্ছে। আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাব এখন। হিন্দি সিনেমার কায়দায় চুড়ি বাজিয়ে, সাসপেন্স তৈরি করে ভয় দেখিয়ে আমাকে আটকে রাখা যাবে না। রাঘবকে বাঁচাতে হবে। আমি ছুটে বাইরে এলাম। আমার গাড়ি কোথায় রেখে এসেছি?

৪৬

গাড়িটা কোথায় রেখে এসেছি? মেয়েটার পিছু নিয়ে কোথা দিয়ে কোথায় চলে এসেছি। বৃষ্টির মধ্যেই ছুটতে ছুটতে গাড়িটা খুঁজতে থাকি। বাইকের আওয়াজ পাচ্ছি না? হ্যাঁ, বাইক। মানে ওদিকে রাস্তা ওখানেই আমার গাড়ি, ব্যাক করে অন্য দিকের রাস্তা বেছে নিই। ছুটতে ছুটতে কিছুটা এগিয়ে যেতে যেতে চেনা চেনা মনে হয় রাস্তাটা। আমি এদিক দিয়েই ছুটে এসেছিলাম। এই যে এদিকের রাস্তায় আমার গাড়ি আছে ঠিক! বৃষ্টির জল হুড় হুড় করে ঢালু রাস্তা বেয়ে নেমে আসছে। ভিজে যাচ্ছি। রাস্তায় উঠে এদিক ওদিক তাকিয়ে দূরে গাড়িটা দেখতে পাই। নির্জন রাস্তায় একধারে গাড়ি জলে ভিজছে। দ্রুত গাড়ির কাছে গিয়ে শ্বাস ফেলে প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়লাম। স্টার্ট দিলাম। রাঘব কেমন আছে কে জানে! ওকে বোধহয় আর বাঁচাতে পারলাম না!

কী ঘন সবুজ চারপাশে। এখানে খুব দামি কাঠ পাওয়া যায়। কত কাঠ পাচার করেছি এই সেদিনও। শ্যামল চলে যাওয়ার পরেই আমি খানিকটা বলহীন হয়ে পড়েছি। কিন্তু শ্যামলকে না সরালে চলছিল না। মেয়েটা পা বাড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে। কী করতে চায় ও? আস্তে আস্তে ঝোরায় নেমে পড়ল! আমার দিকে তাকিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে! মানে কী?

ডুয়ার্সের বৃষ্টির জলে ভরে যাচ্ছে লিস, ঘিস, চেল, কালজানি, জলঢাকা, ডায়ানা...! মূর্তি নদীতে এসে মিশে যাচ্ছে খুনিয়া জঙ্গল থেকে গড়িয়ে আসা বৃষ্টি। রাঘবের থেকে পাওয়া ঠিকানার উদ্দেশে গাড়ি ছুটছে। সংকোশ নদী ডুয়ার্সের পূর্ব-পশ্চিম দুই ভাগকে ডুবিয়ে দিল আজ বুঝি। আজ রাস্তা প্রায় ফাঁকা। ডানদিকের রাস্তা দিয়ে একটি গাড়ি চলে এল সামনে। এসে পাশ কাটিয়ে চলে গেল আমার গাড়ির আগে আগে। ঝাপসা কাচের ভেতর দিয়ে কেউ একজন পেছন ফিরে আমার গাড়ির দিকে তাকাল যেন! সেই মেয়েটা কি? আমি ভুল দেখছি কি বারবার? মেয়েটা সেই বাড়িতে ঢুকে কোথাও হারিয়ে গেল! হারিয়ে যায়নি! কোনও গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে পড়েছিল। আমার সময় থাকলে মেয়েটাকে খুঁজে বের করে দুবাই পাঠিয়ে দিতাম। সোজা কথায় নারীপাচার। অনেক জ্বালিয়েছে ওটা! কিন্তু রাঘব ফোন করেছে। আমার আশায় বসে আছে ও। আমার ধারণা রাঘব খুব বড় একটা বিপদে পড়েছে। না হলে এভাবে আমাকে ডাকতো না। একটা খবর আমাকে স্বস্তি দিয়েছে। রাঘব আমার বাড়ির কাছাকাছি কোথাও এসে আছে। চাপড়ামারি থেকে এখানে এসে আছে! হয়তো আমার কাছে আসছিল। বাধা পেয়ে লুকিয়ে আছে। আমার কাছে আসতে চায়। রাঘব জানে আমি ছাড়া ওর সহায় বলতে কেউ নেই। গাড়ি নামিয়ে দিলাম নীচু রাস্তায়। সামনের গাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে না। যে যার গন্তব্যে চলে যায়। এটাই নিয়ম। মোবাইলে রুট দেখাচ্ছে। আমি চলে এসেছি... আমি চিলাপাতা ফরেস্টের কাছে এসেছি? আরে, আমার এটা ধারণা ছিল না! বা, হয়তো ভাল করে খেয়াল করিনি ঝোঁকের বশে। রাঘবের সঙ্গে কথা হয়েছিল একদিন চিলাপাতায় আসব। রাঘব দুটো দিন সময় চেয়েছিল। ও চলে এসেছে। এসে আমাকে ফোন করে চলে আসতে বলেছে। কিন্তু রাঘব কোনও একটা বিপদে আছে, একথাও ঠিক।

বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। গাড়ি থামিয়ে গাড়ির ভেতর দিয়ে বাইরেটা দেখছি। জলে ভিজে চারপাশ কেমন চকচকে সবুজ হয়ে আছে। এখন বেলা দুটো বেজেছে। বেলা পড়ে এসেছে। সিপিয়া কালারের রোদ কেমন অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা ছড়িয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে অনেক পুরনো দিনের পথ ধরে হেঁটে চলেছি। আমার সামনেও কেউ নেই, আমার পেছনেও কেউ নেই। খুব ধীরে ধীরে দিনের রং পালটে যাচ্ছে। বনভূমি জুড়ে একটানা বৃষ্টির জলের বয়ে যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকি। আমি গাড়িটা কোনদিকে নিয়ে এলাম? এদিকে গার্ড দেখছি না! রাঘব এই রকম জায়গায় দাঁড়াতে বলেছিল। আচ্ছা, এদিকে তো কাউকে দেখছি না! গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাই ভেতরের দিকে? রাঘবকে একটা ফোন করে দেখি বরং। যদিও ও ফোন রিসিভ করবে কিনা জানি না। দেখা যাক।

যথারীতি সুইচ অফ। নাঃ! ঝামেলা হয়ে গেল দেখি। কী করব এখন? ফিরে যাব? দিনের আলো ক্রমে কমে আসছে। সন্ধে হয়ে গেলে বিপদে পড়তে পারি। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে থমকে গেলাম। সামনের একটা ঝোরার ওপাশে কেউ একজন আছে! দাঁড়িয়ে আছে কেউ। দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে। একটি মহিলা সেই মেয়ে? আরে, কী আশ্চর্য। সেই মেয়েটা কি তন্ত্রমন্ত্র জানে নাকি? যেদিকে তাকাই, ওকে দেখতে পাই! ও কি আমার পেছনে নিয়তির মতো সেঁটে আছে?

মেয়েটি সবুজ শাড়ি পরে আছে বলে চট করে ওকে দেখতে পাইনি। হয়তো অনেকক্ষণ থেকেই ও আমাকে ফলো করছে! আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। সামনে ঝোরা। ঝোরার ওপাশে লম্বা লম্বা গাছেরা জড়াজড়ি করে একসাথে নিজেদের পাহারা দিচ্ছে। কী ঘন সবুজ চারপাশে। এখানে খুব দামি কাঠ পাওয়া যায়। কত কাঠ পাচার করেছি এই সেদিনও। শ্যামল চলে যাওয়ার পরেই আমি খানিকটা বলহীন হয়ে পড়েছি। কিন্তু শ্যামলকে না সরালে চলছিল না। মেয়েটা পা বাড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে। কী করতে চায় ও? আস্তে আস্তে ঝোরায় নেমে পড়ল! আমার দিকে তাকিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে! মানে কী?

আমি পা বাড়ালাম। রাঘব ওকে পাঠায়নি তো? এখন এতটা এগিয়ে এসে আর উচিত হবে না পেছন ফিরে চলে যাওয়ার। যদি দেখি পালাচ্ছে, ওকে তাড়া করে এগিয়ে যাব। আমি ঝোরার পাশ দিয়ে সরু কাদা মাটি সংলগ্ন পথে পা রাখলাম। ভেজা গুল্ম, ঘাস, কাদা সব মিলে মিশে কেমন একরকম গন্ধ বেরিয়েছে। মেয়েটা চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে। আমাকে কয়েক পা এগোতে দেখে পেছন ফিরে হাঁটতে লাগল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় ডাকল। মেয়েটা বনে ঢুকে পড়লে আর ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি দ্রুত হাঁটছি। ওর কাছাকাছি পৌঁছতেই হবে। আমাকে দ্রুত হাঁটতে দেখে মেয়েটা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। এবারে আমি কাদার ভেতরে দ্রুত পা ফেলছি। প্রায় ছুটতে হচ্ছে। এই ঘোর বনের ভেতরে মেয়েটাকে ঢুকে যেতে দেওয়া যাবে না। ও কোথায় লুকোবে দেবা ন জানন্তি! আজ মেয়েটাকে চাই। অনেক রহস্য ঢাকা পড়ে আছে মেয়েটার মধ্যে। আরে! ছুটে পালাচ্ছে

দেখ! এবারে ও আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। কাদা জল পেরিয়ে খানিকটা শক্ত মাটি পায়ের নীচে পেয়েই আমি দৌড় লাগালাম। জঙ্গলে দৌড়নো ভারি কঠিন। উঁচু নীচু জমি, কাঁটা গাছ। উঁচু নীচু জমিতে পা ফেলা সহজ না। তবু দীর্ঘ দিনের অভ্যেসে ধার কমেনি আজ বুঝলাম। মেয়েটা এঁকেবেঁকে ছুটছে। আমি তেরছা ভাবে ছুটলাম যাতে একধারে এনে ওকে ধরে ফেলতে পারি। লম্বা লম্বা পায়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ সেই হরিণ মারার দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। হরিণটা প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি ফায়ার করলাম। হালকা শিষের মতো শব্দ হয়েছিল। হরিণটা পড়ে গেল। ধড়াম করে পড়ে গেল। ইয়াক উফফ আহ! পা বেঁধে গেছে কেটে ফেলা গাছের গুড়ির সামান্য উঁচু হয়ে থাকা অংশে! আমি উপুড় হয়ে হাত পা ছড়িয়ে ধড়াম করে পড়ে গেলাম। কোথা থেকে এই গাছের গুড়িটা এখানে অপেক্ষা করছিল আমার জন্য! এমনভাবে পা বেঁধে গেল! এই গাছটা কি আমি কাটিয়েছিলাম একদিন? একটুখানি গোঁড়া নিয়ে অপেক্ষমান ছিল এটা আমি আজ আসব বলে?

ওদিকে মেয়েটা বুঝি পালিয়ে গেল!

৪৭

সারা শরীর প্রায় কাদা-জলে লুটোপুটি খেয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে চোখটা প্রথমেই সামনের দিকে গেল। মেয়েটা নেই! কোথাও কেউ নেই। অরণ্যের যেমন সৌন্দর্য আছে, তেমনি ভয়াল রূপও আছে একটা। একা এই সন্ধের ছায়ামাখা বনানী নিঃসাড়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। একটি পাতাও নড়ছে না কোনও গাছে। রান রান স্ট্যাচু খেলাটার মতো। মেয়েটা গহীন জঙ্গলের কোথায় ঘাপটি মেরে আছে বলতে পারব না। কিন্তু পালিয়ে চলে গেছে বলা যাবে না। আমার সামনের গাড়িতে একেই কি দেখেছিলাম? তাহলে গাড়িটা কোথায় গেল? এই ভাবনাটা নেহাতই বোকার মতো হয়ে গেল। এই বিশাল জঙ্গলের ভেতরে ঘাঁত ঘোত জানা থাকলে আবার গাড়ি লুকোনোর অভাব? আমরা যখন নিয়মিত এখানে আসতাম, তখনকার কুকীর্তিগুলো কী দেখিয়ে করতাম? জঙ্গলের গভীর থেকে গভীরতম জায়গা আছে। সে সব জায়গায় রোদ পৌঁছয় না! নল রাজার গড়ের কাছে যাব। ওর কাছাকাছি একটি দিক নির্দেশ করে আমরা ভাগ বাঁটোয়ারায় বসতাম। কত বার এসেছি এখানে! আমি মেয়েটাকে দেখেছি সোজাসুজি ওই দিকে যেতে। আমি যদি ঝোরার উল্টোদিক দিয়ে যাই, তাহলে মেয়ে আমার সামনা সামনি হয়ে যাবে।

আমি গাছপালার আড়ালে চলে গেলাম। এখানে এই বুড়ো মোটা গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে অবজার্ভ করে নিচ্ছি। বলা যায় না, আমাকে দেখতে না পেলে মেয়েটা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে! বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাবে না। বন কেমন একটা ঝিমিঝিমি সুর তুলেছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। আঁধার নামবে আরেকটু পরেই। রাঘবের সঙ্গে আর আজ দেখা হল না। না হোক, আমি একটু ঘুরে মেয়েটা যেদিকে গেছে, সেদিকে এগিয়ে যাই। ঘুরে বনের ভেতরের দিকে সাবধানে এগিয়ে যেতে থাকি। এত নির্জন হয় এই গভীর বনগুলো!

কারা কথা বলতে বলতে আসছে! পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি! লুকোতে হবে! যে-ই হোক, সে আমার বন্ধু হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

ঘন জঙ্গলের এক পাশ দিয়ে কোমরে কুকরি গোঁজা দুটো লোক আসছে। দেখে মনে হয় জঙ্গল ওদের নখদর্পণে! সম্ভবত ফরেস্ট গার্ড। চলে গেল ওরা। অনেক সময় ওরা টহল দিয়ে বেড়ায়। আজকের মতো কাজ হয়তো শেষ। আমি আড়াল থেকে নজর রাখি। হ্যাঁ, লোক দুটোকে আর দেখা যাচ্ছে না। একটা ময়ূর বনের নির্জনতা চিরে চিৎকার করে উঠল। উঠেই ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ল গাছের ওপর থেকে। খর খর করে হেঁটে চলে গেল ঝোরার কাছে। আমি গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে চারপাশে লক্ষ্য রেখে চলেছি। ক্রমেই ঘন মেঘে ভরে যাচ্ছে আকাশ। এখন বৃষ্টি নামলে ঝামেলা বাড়বে বৈ কমবে না। আমি এখন ফিরে যেতে পারি। কিন্তু মেয়েটাকে কি কখনই ধরতে পারব না! এই মেয়েটার থেকেই যত ঘটনার শুরু। সুতরাং একে আমার চাই। আরে! ওই যে মেয়েটা! ঘন গাছগুলোর আড়াল দিয়ে চলে যাচ্ছে বনের গভীরে। ওর ওদিকে একটা আশ্রয়স্থল আছে নিশ্চয়। না থেকে পারে না। অথবা ওদিকের কোনও গুপ্ত পথ দিয়েই ও এই ফরেস্টে ঢুকেছিল! আমি পিস্তলটা একবার টাচ করে নিলাম। বনের গভীরে কেবল হিংস্র জন্তু আছে তা নয়, হিংস্র মানুষও থাকে! বনের সবুজ সারল্যের আড়ালে কত দুষ্কর্ম হয়ে থাকে সেটা আমার থেকে বেশি কেউ জানে

একটা মানুষ ওপাশের জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। কে? লোকটা এক দৃষ্টে আমি যে গাছের আড়ালে আছি, সেদিকে তাকিয়ে আছে। ও কি জানে যে আমি এখানে আছি? কিন্তু লোকটা কে? ফরেস্ট গার্ড? দাঁড়িয়ে আছে যেন পাথরের মূর্তি! নড়েচড়ে না! কী হল ওর? ও কি শত্রু? বুঝতে পারছি না। আমার পেছনে একটা শব্দ হল না? হালকা শব্দ!

কি? ময়ূরটা চলে গেছে! কোনদিকে গেল? এখানে সাপ আছে। হান্টার বুট পরে থাকলে ভয় ছিল না। কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেলে! তাড়াতাড়ি পা চালাই। মেয়েটা বেশিদূর যেতে পারেনি এখনও। এই দিকে যেতে দেখেছি ওই যে ওর শাড়ির অংশ দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। ও পালাচ্ছে আমাকে দেখে। রাঘব কি এদের হাতে পড়েছে? রাঘব তো এখনও এল না! ওই যে মেয়েটা দ্রুত যাচ্ছে! গাছের আড়ালে আড়াল হয়ে গেল যে! ওদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ও? নতুন করে কোনও রাস্তা বের করেছে! নতুন কোনও যাতায়াতের রাস্তা! এইসব ফরেস্টে চলাফেরা করার অভ্যেস আছে আমার। ওকে ধরে ফেলব সহজেই!

অনেকটা ছুটে এসেছি। মনে হচ্ছে বনের বেশ গভীরে চলে এসেছি। বিকেলের আলো মেঘের ছায়ায় কালো হয়ে এসেছে। একা নির্জন বনের গভীরে দাঁড়িয়ে কেমন একটা গন্ধ পেলাম! সিপিয়া কালারের অতীত ফিরে এল আমার সামনে! এই সেই জায়গা! ডিভিডিতে এই জায়গার রেকর্ডিং করা হয়েছিল!! ওদিকে কি... একটু এগিয়ে গেলাম জঙ্গলের ভেতরে ...ডানদিকে! হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। নল রাজার গড়! আমি নল রাজার গড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। এসব জায়গা আমার খুবই চেনা। হাতের তালুর মতো চিনি! কেমন করে ফের সেই জায়গায় এসেছি আমি? এই গড়ের উল্টোদিকে একটা গাছ ছিল। আছে গাছটা? এই যে আছে! এই গাছের গায়ে কোপ মারতে রক্তের মতো লাল তরল পদার্থ বেরিয়ে এসেছিল! কী গাছ এটা জানি না। শম্ভু বলেছিল এই গাছের চারা নিয়ে যাবে। খুব কাজে লাগবে ফন্দী ফিকির করতে। শম্ভু নেই। গাছটা আছে। একা। অন্য গাছের থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন গড়টাকে পাহারা দিচ্ছে। ফিরে আগের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে সন্তর্পনে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কী নিস্তব্ধতা চারপাশে! সিনসিনে বাতাসে ভর করে সন্ধে এগিয়ে আসছে। মেয়েটাকে তাড়া করতে করতে আমি গভীর জঙ্গলে চলে এসেছি! এই সেই জায়গা! এখানে এসে আমরা কাঠপাচারের, নারী-শিশু-পশু পাচারের টাকা ভাগ বাঁটোয়ারা করতাম। গরুমারায় গন্ডার শিকার করা ছিল রাঘবের নেশা। হাতির দাঁত কেটে নিয়ে যেত ও সাগরেদদের সঙ্গে করে এসে। আমার সঙ্গে রাঘবের দেখা হয় অনেক পরে। আমিও যোগ দিয়েছিলাম ওর সঙ্গে। সেবার প্রথম হরিণ মেরেছিলাম। সেই হরিণের মাংসের ভোজ হয়েছিল।

আমার শরীরে একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বুনো গন্ধে ভরে গেছে এই জায়গাটা! হাতির পাল বেরিয়েছে কি ...নাকি অন্য কোনও জন্তু! কোথায় আছে সে বা তারা? আমি একেবারে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি! আমাকে আক্রমণ করলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো... ওই বর্ষার জলে পুষ্ট বড় বড় পাতাওলা শাল গাছটার পেছনে চলে যাই...! দূরের দাঁড়িয়ে থাকা গাছটার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখন ইচ্ছে করলেই একটা বুলেট আমাকে ফুঁড়ে দিতে পারে! খোলা জায়গা দিয়ে হেঁটে যাওয়া উচিৎ নয়। মেয়েটার পাত্তা নেই! গেল কোথায়? উফ্, বন ক্রমশ ছাই রঙের চাদর গায়ে দিচ্ছে, এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু কোন দিক দিয়ে এসেছিলাম...! ঠিক বুঝতে পারছি না কেন যে! আমি কি ভুল করছি? এই বন আমার খুব চেনা বন। এখানে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই আমার। রাস্তাটা চিনতে পারছিনা কেন? এদিকে... গন্ধটা তীব্র হচ্ছে। কেমন একটা আঁশটে নোনতা নোনতা গন্ধ! চেনা গন্ধ। কিন্তু মনে করতে পারছি না!

৪৮

আমার কাছে অস্ত্র আছে। পরিস্থিতি তেমন হলে আমি পারব কিছুক্ষণ লড়ে যেতে। এবং তারই মধ্যে পালিয়ে যেতে পারব। রাঘবের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। ও কেন আমার ফোন তুলছে না! ফোন করে ডেকে এই এলাকার দিকে ডেকেছিল বলেই তো আমি এলাম এখানে! যদিও এখানে আসার কথা হয়েছিল আমাদের দুজনের মধ্যে। এলই যখন, ডেকে আনলই যখন, তখন ও নিজে আসছে না-ই বা কেন? আমি ঠিকঠাক বুঝতে পারছি না ওকে। পরিস্থিতিটাও ধরতে পারছি না! কেমন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে! মেয়েটা আমাকে নিয়ে এভাবে খেলাচ্ছে কেন! আমি ওকে চিনিই না। কেনই বা আমার পেছনে পড়ে আছে! কী চায় ও?

এই জায়গায় এসে পড়লাম কেমন করে! এটা জঙ্গলের একেবারে গভীরে। এখানে বসে টাকা ভাগ করেছি। ওই ড্রাইভারটা একটা গাছে বাঁধা ছিল। ক্যামেরার ফ্রেমে লোকটার ভয়ার্ত চোখ দুটো মনে পড়ছে। এদিকে গাছটা কোথায় ছিল যেন! ক্যামেরাম্যান যদি ওদিক থেকে ছবিটা তোলে হ্যাঁ, ক্যামেরার সামনের ফাঁকা খানিকটা জায়গা ছবির সামনে ছিল। পেছনে ছিল গাছটা। হিসেব মতো গাছটা এদিকে মানে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এই কাছাকাছি কোথাও গাছটার শুকনো

পাতাহীন শাখা-প্রশাখা মনে আছে। তেমন শাল গাছ এদিকে দেখতে পাচ্ছি নাতো! আর সেই ড্রাইভারকে মেরে এখানেই কোথায় পুঁতে দিয়েছিলাম। রাঘব স্ল্যাব দিয়ে কবরটা ঢেকে দিয়েছিল। একটা আওয়াজ হচ্ছে সুভদ্র। কান পেতে শোন। খচমচ আওয়াজ হচ্ছে! বনের গভীর থেকে উঠে আসছে শব্দটা। কেউ আসছে! দল বেঁধে কারা আসছে! হাতির পাল? গাছে উঠে যাব? সেটা হাতির হাত থেকে পালানোর উপায় নয়। শব্দটা নেই এখন। কোনও জানোয়ারের চলাফেরার শব্দ হবে! এই রকম জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে মেয়েটা কী করছে? গেলই বা কোথায়? আমি ওকে হারিয়ে ফেললাম। ওদিক দিয়ে যদি যাই, তাহলে হয়তো খচমচ শব্দটা ফের হচ্ছে! এদিকে এগিয়ে আসছে কিছু! ওপাশের জঙ্গলের ভেতর থেকে কিছু আসছে! আমার মন, সমস্ত ইন্দ্রিয় গন্ধ পাচ্ছে। বিপদের গন্ধ! আমাকে পালাতে হবে! কিন্তু কেউ আসছে যেন! একটু লুকিয়ে থেকে সুযোগ পেলেই পালাবো। রাঘবের যা হয় হোক, ওকে বাঁচাতে গিয়ে আমি ঝামেলায় পড়তে পারব না! বলতে গেলে রাঘবের ফোনটা আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিল! আমি আসতাম এখানে ঠিকই, কিন্তু সেটা নিজের ইচ্ছে মতো। আজ কেমন যেন সব কিছু গোলমেলে লাগছে!

একটা মানুষ ওপাশের জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। কে? লোকটা এক দৃষ্টে আমি যে গাছের আড়ালে আছি, সেদিকে তাকিয়ে আছে। ও কি জানে যে আমি এখানে আছি? কিন্তু লোকটা কে? ফরেস্ট গার্ড? দাঁড়িয়ে আছে যেন পাথরের মূর্তি! নড়েচড়ে না! কী হল ওর? ও কি শত্রু? বুঝতে পারছি না। আমার পেছনে একটা শব্দ হল না? হালকা শব্দ! খুব সাবধানে পা ফেলে এলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমন শব্দ! ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে যাচ্ছি, একটা শক্ত হাত আমার মুখ চেপে ধরল। আর একজন কেউ আমাকে চেপে ধরেছে। প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। পারছি না। পেছনে কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। আমার হাত বেঁধে গাছের সঙ্গে আটকে ফেলা হল। কারা এরা? আমাকে এমন ভাবে বাঁধল কেন? আমি কিছুই করিনি। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি! মুখে স্টিকি টেপ আটকে দেওয়া। কথা বলতে পারছি না। কী হচ্ছে? আমাকে কি মেরে ফেলবে? কারা মেরে ফেলবে আমাকে?

সামনের খোলা জায়গাটা পেরিয়ে পাথরের মূর্তি এগিয়ে আসছে। আমি কি ওকে চিনি? আমার কোনও গোপন শত্রু নিশ্চয়! খুব কাছে এগিয়ে এল লোকটা। সন্ধের ঝাপসা আলোয় আমি ওকে চিনতে ভুল করলাম না। এই সেই লোক! যে আমার বাড়িতে ঢুকে চেয়ারে উঠিয়ে ফাঁসিতে লটকে দিতে যাচ্ছিল! অনির্বান বসু! ও মরেনি? ওকে ট্রাকটা পিষে দিয়েছিল! আমি নিজের চোখে মর্গে ওর বডি দেখে এসেছি!

—চিনেছেন স্যার? মরিনি। ওটা নাটক ছিল স্যার। আপনি যে ট্রাককে সুপারি দিয়েছিলেন আমাকে মেরে দিতে, আমি আপনার থেকে বেশি দিয়ে ওকে কিনে নিলাম। ঘটনা ঘটে গেল! আমার বডি পড়ল প্রচুর টোম্যাটো কেচাপ ছড়িয়ে! পুলিশ অফিসার সন্দীপ আমার কাজিন। হেল্প করেছে প্রচুর। আপনি মর্গে এসে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। ভাবলেন, আপনি সন্দেহের বাইরে! অনেকদিন ধরে একাট্টা হয়েছি আপনাকে কিছু বলব বলে! সেদিন আপনাকে মেরে দিচ্ছিলাম। সন্দীপ চলে এল। সঙ্গে ফোর্স। ও আমার কাজটা সম্পর্কে জানতো না। তাই আপনি বেঁচে গেলেন। আরে, আইন আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখছে! কিছুই জানেন না? তৃণা নামের কাউকে মনে পড়ে? সে মরেছিল। আপনি পালালেন একথা জেনে যে তৃণা প্রেগন্যান্ট। ওই দেখুন, ফিনাইল বেচতে গিয়েছিল আপনার কাছে, তৃণার মানে আপনারই অবৈধ সন্তান। মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে না? তাই কি হয়? আর আমি? জানতে ইচ্ছে করছে? আমি সেই ড্রাইভার অনিল মাইতির ছেলে অনির্বান মাইতি! সেই গাছে আপনাকে বেঁধেছি। মনে পড়ছে এই শাল গাছটা? ডিভিডি পাঠিয়ে সব মনে করিয়ে দিয়েছিলাম তো! এই শাল গাছের আড়ালে বাঁচতে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্যার! এই গাছে আমার বাবাকে বেঁধে মেরেছিলেন। তারপর বডি মাটিতে শুইয়ে বুকের ওপর উঠে লাফিয়ে বুকের পাঁজর ভেঙে দিলেন! আসুন। আজ ঠিক সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হোক। সোজা হয়ে দাঁড়ান। আর দেখে নিন ওই যে ডানদিকে আমার বাবাকে কবর দিয়েছিলেন। একজন টুরিস্ট সেদিনের ছবিটা তুলেছিল গোপনে! অনেক পরে ডিভিডিটা পাই হাতে! সোজা হয়ে দাঁড়ান। নড়বেন না স্যার। গুলিটা কে করবে? আপনার মেয়ে? যে আপনাকে প্রলুব্ধ করে এইখানে নিয়ে এসেছে। না, এই কাজটা একমাত্র আমার। ওর কাজ ছিল আপনাকে একটা ধন্ধে রাখা।

আমি অবাক হতে হতে স্থির হয়ে গেলাম। পুরোটাই একটা ছকমাত্র! এর মধ্যে রাঘব জড়িত! রাঘবকে দিয়ে আমাকে ফাঁদে ফেলেছে এরা? নাকি রাঘবকে ফাঁদে ফেলে বাধ্য করেছে আমাকে ফোন করতে? রাঘবকেও মেরেছে? আমাকে সত্যি মারবে? আজ আমার মৃত্যুর দিন? এই সেই শুষ্ক শাখা-প্রশাখা যুক্ত, পত্রহীন শাল গাছ? এই গাছ এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল আমার রক্তের গন্ধ পাওয়ার জন্য?

অনির্বান মাইতি আমারই পিস্তলটা দিয়ে আমাকেই টার্গেট করেছে! একটা শিষের শব্দ হল। ভলকে ভলকে আঁশটে গরম তরল ঢেলে দিচ্ছে কেউ আমার শরীরে। এই গন্ধটা আজ বারে বারে পাচ্ছিলাম এখানে এসে! এটা কি রক্তের গন্ধ! শরীর ভীষণ যন্ত্রণায় দাপিয়ে উঠল। লক্ষ লক্ষ হরিণের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যাওয়ার শব্দ পাচ্ছিলাম। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল আমার। আমি কি মরে যাচ্ছি? বিকট চীৎকার করে ছুটে এল সেই ময়ূরটা।

ময়ূরটা এসে দাঁড়িয়েছে ওই যে! মেঘ দেখে ওর পেখম মেলে দিয়েছে। একটি পায়ে তাল ঠুকে ঘুরে ঘুরে নাচছে ও! কানু সাপুড়েটা ওরা এসে দাঁড়িয়েছে দূরে। খুব হাসছে কানু। শুনতে পেলাম জোরে চেঁচিয়ে উঠল সেই মেয়েটা —মারো! মারো খুনিটাকে!

দেখতে পাচ্ছি মাইতিবাবুর কবরের স্ল্যাব তুলে ওখানে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সেই আগের মতো করে স্ল্যাব টেনে লতাপাতায় ঢেকে দেওয়া হল। পরিপাটি করে মাটি ঠেসে দিল শ্যামল! শ্যামল মরেনি! শ্যামল বেঁচে আছে! নাকি ভুল দেখছি! বাকি চারজন লোক কারা এসেছে আজ আমার অন্ত্যেষ্টিতে!

অন্ধকার নেমে এসেছে চিলাপাতা অরণ্যে। ওরা চলে যাচ্ছে কাজ শেষ করে। আমার কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল নিখিল। রাতের অন্ধকারে কেমন অনায়াসে চাঁদের কাছে চলে যাচ্ছে ও। আরও কারা এসে ঘিরে ধরেছে আমার কবর। ছায়া ছায়া কিছু মানুষ কারা এসেছে! আমার কোথায় যেন যাওয়ার ছিল কী যেন করার ছিল! হাঁড়ি থেকে বের করে আনছি সাপের বাচ্চাটাকে সাপুড়ে টাকা দিচ্ছে আমার হাতে! টাকাগুলো উড়ে যাচ্ছে। উড়ছে! আমি হারিয়ে যাচ্ছি গরম তরলে! মা গো!

তুমুল বর্ষণে ভিজে যাচ্ছে মাটি, গাছ, নদী! আমার বুক তৃষ্ণায় কাঠ হয়ে পড়েছে! এক ফোঁটা জল নেই কোথাও! জল নেই কিছু নেই! তৃণা নেই! অন্ধকার কথা বলছিল আমার সঙ্গে। এখন অন্ধকার ছাড়া আর কিছু তো নেই!

অধ্যাপক সুভদ্র সান্যাল হারিয়ে গেছেন। তাঁর গাড়িটাকে তিস্তাবাজার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

(সমাপ্ত)

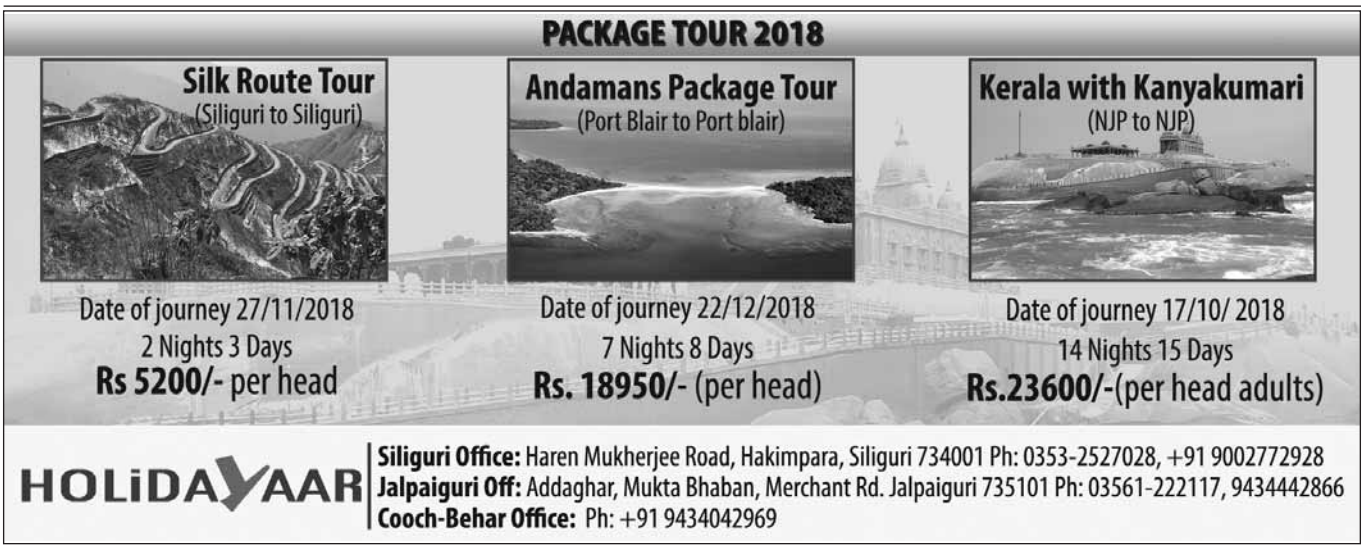

মনসা পূজা

সর্পসংকুল উত্তর বাংলায় মানুষের প্রাথমিক ভরসা আজও

দাদুর কাছে শুনে শুনে দেবী মনসার স্তুতি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল ছোটবেলাতেই। শোবার সময়, অন্ধকার পথে চলতে গেলে এই মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করার নিয়ম; করেছি এই সেদিনও। আজ লিখতে বসে অনুভব করছি সত্যি সে মন্ত্র কবে থেকে যেন আর বলিনা! 'আস্তিকস্য মুনিমাতা ভগিনী বাসুকিস্তথা /জরুতকারু মুনিপত্নী মনসাদেবী নমহস্তুতে নাগমাতা' —প্রায় এরকমই ছিল মন্ত্রটা। শিখেছিলাম অন্ধকারে জোরে জোরে শব্দ করে পা ফেলে হাঁটতে হবে আর এই মন্ত্র বলতে হবে, তাহলে আর সাপে কাটবে না। দেবী মনসা সব সাপেদের মা কিনা। তিনি সন্তুষ্ট থাকলে আর ভয় নেই। এমনটাই ছিল সেসময় বিশ্বাস।

সেসময় আমাদের গ্রামের বাড়িটির চৌহদ্দি কিছু কম ছিল না। বসত বাড়ি, উঠোন, গোয়াল, কুয়োতলা, পেছনে সুপুরি বাগান, যেমন গ্রামদেশে থাকে আরকি। আম, জাম, কাঁঠাল, কদম, কুল, নিম, পেয়ারা কী নয়! বাড়ির পেছনের শেষপ্রান্তে কলাগাছের ঝোপ আর বাড়ির সীমানা ঘেঁষে বাঁশবন। বাঁশ বাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠতেও দেখেছি বৈকি। আমার বাবা তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে জল-জঙ্গলপূর্ণ পূর্ব বাংলার সাতপুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে আসবার কালে সবাই বুকের ঝাঁপিতে ভরে নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের ফেলে আসা সবুজ সজল সেই 'দেশের বাড়ি'। আর সঙ্গে এনেছিলেন দেবী মনসাকেও। কারণ আমাদের বাড়িই শুধু নয়, গোটা গ্রামটাই সবুজে সবুজ, বর্ষার জল পেয়ে ঝকমকে আর ঝোপজঙ্গল লকলক করে বেড়ে উঠত চারিধারে। সেইসঙ্গে পোকামাকড় সাপ-খোপের রাজত্ব। নানা রকম সাপের দেখা মিলত গরমে আর বর্ষায়। পথে মাঠেঘাটে শুধু নয় বাড়িতে, উঠোনে, গোয়ালে, জমির আলে, ইদুরের গর্তে, মাটির বাড়ির ভিটের কোনে। মানুষের কাছাকাছি থাকাই যেন পছন্দ তাদের! দেখবার মতই তারা, যেমনই তাদের চলন তেমনই তাদের রূপ! সবুজ লাউডগা, কালো কুচকুচে দাঁড়াশ, মাথায় কৃষ্ণের পা আঁকা গোখরো, ঘেন্টি, জল ঢোঁড়া, আরও নানান নামের ও আকৃতির। বিপজ্জনক সরীসৃপটিকে যথেষ্ট ভয়ও পেতাম! কারণ জানতাম তার দংশনে মৃত্যু নিশ্চিত!

আমাদের বাড়িতে মনসা পূজার প্রচলন ছিল না। দুধ কলা ইত্যাদি পূজার উপকরণ সাজিয়ে, স্নান সেরে ধোয়া শাড়ি পরে মা-ঠাকুমা যেতেন গোস্বামী বাড়িতে বাটা দিতে। ওদের আঁচল ধরে সঙ্গ নিতাম বরাবর। এরকম অনেক বাড়ি থেকেই পুজোর বাটা যেত সেখানে। মেয়েদের ব্রতকথায় মনসাপূজার নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে দশহরা, নাগ পঞ্চমী ও শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পূজা বিহিত। ধূপ জ্বালানো নিষিদ্ধ। উপকরণ বলতে একটি মনসা গাছ, ৮টি নৈবেদ্য, কলা দুধ ইত্যাদি দিয়ে দেবীর পূজা করতে হয়। এই ব্রত পালন করলে দেবী মনসা গৃহস্থের উপর সন্তুষ্ট থাকেন। তাদের আর সর্প ভয় থাকে না। দেবী মনসার কৃপা বলে ধন পুত্র ও ঐশ্বর্য লাভ হয়। বলাবাহুল্য মেয়েরাই এ পূজার আয়োজক, পুরোহিত মশাই পুজো করেন, তাকে যথাবিহিত দান-দক্ষিণা দিতে হয়।

হিন্দু পুরাণে সপ্তলোকের উল্লেখ আছে এবং পাতালের শেষধাপে রয়েছে নাগলোক। মহাভারতেও নাগকন্যা উলূপীর সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ প্রসঙ্গ আছ। জরৎকারুমুনি পুত্র আস্তিকমুনির কথাও পাই। কুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হয় তক্ষক নাগের দংশনে তখন রাজার পুত্র জনমেজয় পিতার মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ হয়ে এক ভয়ানক সর্পসত্র যজ্ঞ করে নাগবংশ ধ্বংস করতে শুরু করেন। ব্রাহ্মণেরা অতি শক্তিশালী মন্ত্র উচ্চারণ করে জগতের সব সাপেদের আকর্ষণ করে আনেন ও সর্পকুলকে যজ্ঞের অগ্নিকুন্ডে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করেন। সর্পদেবী মনসাপুত্র আস্তিক তখন সেখানে গিয়ে জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করে এই যজ্ঞ বন্ধ করেন ও নাগবংশ রক্ষা করেন। এই দিনটি স্মরণে এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নাগপঞ্চমী ব্রত পালিত হয়। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে প্রতিবারের মতো এবারেও যাগযজ্ঞ সহকারে নাগপঞ্চমীব্রত উদযাপিত হবে ২৯শে শ্রাবণ বুধবার ; ১৫ইআগস্ট ২০১৮। গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে নাগপঞ্চমী তিথিতে নাগদেবতার পূজা করলে ভক্তজন পুণ্য ও আশির্বাদ লাভ করেন। মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণকালেও দেখেছি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছোটবড় মন্দিরের গায়ে নাগমূর্তি রয়েছে, প্রবেশদ্বারে বাঘের মূর্তি।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এবং মহাভারতেও আস্তিকমুনির মা দেবী মনসার উল্লেখ আছে। মহাঋষি কশ্যপের মানস কন্যা তাই তিনি মনসা। কুমারীকালে মহাদেবের কাছে স্তব,পূজা,মন্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা করে সিদ্ধা হন। জরুৎকারু মুনির সঙ্গে তার বিবাহ হয় এবং আস্তিক নামে তাঁর এক তেজস্বী ও তপস্বী পুত্রের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে সামান্য কারণে স্বামী জরুতকারু মুনি দেবী মনসাকে পরিত্যাগ করে যান। এরপর দেবী মনসা জয়ন্ত নগরে পুরী নির্মাণ করে স্বতন্ত্র বাস করতে লাগলেন। সারাদেশে পূজাও পেতে লাগলেন। সেকালের প্রেক্ষিতে এক

দেবীর এই স্বাতন্ত্র্যধর্মী ব্যক্তিত্ব ভাববার বিষয় বটে! মহাভারতে আরও বলা আছে এই দেবী অত্যন্ত সুন্দরী বলে এর নাম জগতগৌরী; শিবের শিষ্যা বলে শৈবী; বিষ্ণুভক্তা বলে বৈষ্ণবী; জনমেজয়ের যজ্ঞে নাগেদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন বলে নাগেশ্বরী; বিষহরণ করে বলে বিষহরী; মহাদেবের কাছ থেকে সিদ্ধযোগ পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধযোগিনী, কশ্যপের মানস কন্যা বলে মনসা।

কৃষিপ্রধান বাংলার মানুষের মাঠে-ঘাটে, জলে-জঙ্গলে জীবিকা কারণেই যেতেই হয়। পদে পদে মৃত্যুভয়! ফলে জন্ম হয় লোকায়ত দেবতার। স্থানিক বা ভৌগোলিক বিষয়টিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ তাই বাঘের দেবতা দক্ষিন রায়, বনবিবি পূজিত হন মূলত সুন্দরবন অঞ্চলে। তেমনভাবেই কুমীরের দেবতা কালু রায়, সর্পের দেবতা মনসা, পশুদের দেবতা চন্ডী ইত্যাদি দেবতার জন্ম ও পূজা। পুরাণে ও মহাকাব্যে এদের কাউকে কাউকে আমরা পেয়েছি। বাংলায় মধ্যযুগে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল দেব-দেবীর মহিমা কীর্তন করে। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে দেবীমনসার পূজার প্রচলন ছিল বেশি। অনেক কবি রচনা করে গেছেন মনসামঙ্গল কাব্য। কিন্তু সেখানে দেবী মনসাকে অন্যরূপে দেখতে পাই, সেখানে তাঁর দৈবী মহিমা খানিক ক্ষুণ্ণই হয়েছে। মর্ত্যে নিজপূজা প্রচারে ব্যাকুল, অত্যন্ত ক্রোধী, কোপণ স্বভাবের এই দেবী মর্ত্যের চাঁদসদাগরের কাছে পূজা পাওয়ার অভিলাষে নানা ছলচাতুরি করেন, তাঁর পরিবার ও ধন-সম্পদ সব তছনছ করে দেন। পুত্রবধূ বেহুলার অনুরোধে চাঁদ সদাগর বাম হাতে তাচ্ছিল্য ভরে মনসাকে ফুলের অঞ্জলি দিতেই দেবী আবার সদাগরের সব কিছু ফিরিয়ে দেন। কাহিনী এমনই। চাঁদ সদাগর, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর চরিত্রগুলি আমাদের পরিচিত। সেই দৈবী মহিমা প্রচারের যুগে এই মনসা মঙ্গল কাব্যেই দেখা গেল চাঁদ সদাগর বা বেহুলার মতো চরিত্রদের যারা মানুষ হয়েও দৈবকে অস্বীকার করছেন। বেহুলা চরিত্রটিকে নিয়ে আজও লেখক, কবি নাট্যকারেরা সমান উৎসাহী। মনসা দেবী বাংলার কৃষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছেন। কবি জীবনানন্দও বাংলার মুখ দেখে মুগ্ধ হয়ে কবিতায় বেহুলা প্রসঙ্গ না এনে পারেননি।

প্রায় পাঁচ'শ বছর ধরে জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে শ্রাবণী সংক্রান্তিতে মনসাপূজা হয় এবং সে উপলক্ষ্যে তিনদিন ধরে জমজমাট মেলা চলে। বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির প্রধান দেবতা শিব আর তাঁর কন্যা মনসা প্রধান দেবী। মনসারই অপর নাম পদ্মা। মনসাপূজায় রাজবাড়ির মন্ডপে কিন্তু বড় মনসা নেতা এবং ছোট মনসা পদ্মার পূজা হয়। এঁরা দুজনেই মহাদেবের কন্যা। নেতা জ্যেষ্ঠা কন্যা তাই বড় মনসা, তিনি আগে পূজিতা হন। দুই ভগ্নীই হংসবাহনা এবং তাঁদের চারটি করে হাত রয়েছে।

দাদুর কাছে শেখা মনসা স্তুতি বহুদিন উচ্চারণ করিনি! তার মূল কারণ খুঁজে দেখেছি আমাদের বর্তমান বসত ভিটেটুকু ছোট্ট, গাছপালা ঝোপজঙ্গলের আধিক্য কম তাই সর্পভয় খানিক কেটে গেছে। আর এখন অন্ধকারে টর্চলাইট সঙ্গে রাখা, তেমন ঘটনা ঘটলে ওঝা আর ঝাড়ফুঁক না করে দ্রুত হাসপাতাল আর অ্যান্টিভেনমের ব্যবস্থা করাটাই জরুরি। এখন জানি সব সাপেদের বিষ নেই, তারাও আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, আঘাত না পেলে সহজে কামড়ায় না। খাদ্যের সন্ধানেই তারা ঘুরে বেড়ায়। ইকোডাইভার্সিটি রক্ষায় সাপেদের অনন্য ভূমিকা রয়েছে, সে সব নিয়ে গণমাধ্যমগুলিতে বহুল প্রচার চলে। হয়ত পুরনোদিনের মানুষেরাও তা জানতেন ও মানতেন অন্যভাবে। তাই বাস্তুসাপ বাড়ির মঙ্গলই করে, তাকে মেরে ফেললে গৃহস্থের ক্ষতি হয় এমনধারা একটা গভীর বিশ্বাস লালন করতেন। তবে বিশ্বাস অন্ধ হলে পিছিয়ে থাকে মানুষ। আজও গ্রামবাংলায় গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে সর্প দংশনে মৃত্যুর খবর কিন্তু আকছার পাই, হাসপাতালে না গিয়ে ওঝা ও তার ঝাড়ফুঁকে অনেকটা সময় নষ্ট করে হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মৃত্যুর ঘটনাও কম ঘটে না। আবার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে হাসপাতালের দূরত্ব ও যোগাযোগের অব্যবস্থায় সাপে কাটা রুগীর প্রাণনাশের ঘটনাও কম নয়। অজ্ঞানতাই যে বিশ্বাসকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় এসব তারই জ্বলজ্যান্ত নমুনা। এতে দেবী মনসার কোনও হাত নেই।

আজও গ্রামবাংলায় গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে সর্প দংশনে মৃত্যুর খবর কিন্তু আকছার পাই, হাসপাতালে না গিয়ে ওঝা ও তার ঝাড়ফুঁকে অনেকটা সময় নষ্ট করে হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মৃত্যুর ঘটনাও কম ঘটে না। অজ্ঞানতাই যে বিশ্বাসকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় এসব তারই জ্বলজ্যান্ত নমুনা। এতে দেবী মনসার কোনও হাত নেই।

তবে কি ভক্তি থেকেই শুধু নয়, ভয় থেকেই পূজিতা হন মনসা? নাগদেবতার যাতায়াত যেখানে কম সেখানকার অধিবাসীরা মনসার পূজা করেন না? হাউসিং বা ঝা চকচকে শহর এলাকায় বাড়ি যাঁদের তেমন বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি একবাক্যে তাঁরা বলেন, না মনসা পূজাটা করা হয় না। এই শহরের পুবদিকে তিস্তা বাঁধের ওপারে নদী ঘেঁষা লম্বাটে চরটায় হাজার মানুষের বাস। খেটে খাওয়া দিনমজুরদের ঘরবাড়ি। সেখান থেকেই আমাদের কর্মসহায়িকা শেফালি আসে। সে জানিয়েছে, হ্যাঁ মনসা পূজা করি তো আমাদের ওইদিকে সব বাড়িতে। মূর্তি দিয়ে পূজা হয়। কোনও বাড়ি বাদ যায়না। ধূপধুনো দেই না, ঘরের মধ্যে পূজা করি। মূর্তির দুইপাশে মাটির সরায় ভর্তি দুধ আর কলা দেই। ফলটল দেহ, ঠাকুরমশাই পূজা করেন। দক্ষিণা,ভুজ্যি সব দেই। বর্ষার তিস্তা উথাল-পাথাল হলেই শেফালিদের পাড়ার ঘরবাড়ি, গৃহস্থি ভাসায়। সাপখোপ পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ে। ঘরের যাবতীয় জিনিস টেনে বাঁধের ওপর তখন ক'দিনের সংসার। সাপেরাও শুকনো ডাঙার খোঁজে মানুষের খাটে বিছানায় উঠে পড়ে। জল নামলেও নাগেরা সব মাটির উনুন ,গাছের ডাল,খাটের পায়া, ভাঁজ করে রাখা মশারির মধ্যে এসে শুয়ে থাকে। মনসা দেবীকে সন্তুষ্ট না রেখে উপায় কী? আমাদের পৌর এলাকার পাকা বাড়ি থেকে শেফালিদের বাড়িতে যেতে সময় লাগে মিনিট কয়েক। ওখানে সাপেদের রাজত্ব রমরমিয়ে চলছে এখনও। দেবী মনসার আরাধনাও। মাঝখানে কেবল একটি মাটির বাঁধ।

সৌদামিনী রায়

RESORT GREEN WAVE

ROOM RENT

Non AC Double Bed Rs. 990, Non AC DB Luxury Rs. 1200, Cottage AD Rs. 1800, Cottage Non AC Rs. 1500, Couple Delux AC Tower Room Double Bed Rs. 1800, Delux Double Bed Ac Rs. 2000, Super Delux Doble Bed Rs. 2400.

Contact for Booking:
Samir Paul 7679324601
Keshab Roy 9932897168
Office 7718740356
LATAGURI

হিড়িম্বা

আমাদের সমাজে বিশেষ করে নারীদের মধ্যে আকছার দেখা যায় সারা জীবনে শুধু ত্যাগই করে গেছেন, বিনিময়ে কিছুই পাননি। পৌরাণিক কালেও তেমন ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি দেখা যায়। মহাভারতের মহাকবি হিড়িম্বা চরিত্রের সৃজন করেছিলেন, যে নারী শুধু ত্যাগই করে গেলেন, বিনিময়ে পেলেন না প্রাপ্য সম্মানটুকুও। অথচ তার মত শ্রদ্ধেয়া নারী মহাভারতে মত সুবৃহৎ মহাকাব্যেও খুব বেশি দেখা যায় না। পাঠক সেই শ্রদ্ধেয়া, ত্যাগব্রতধারিণী মহাভারতের অনার্যা নারীকে, তাঁর কর্তব্যবোধকে, আত্মত্যাগকে, প্রেমের গভীরতাকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করুক ।

দুর্যোধনের জতুগৃহ দাহ করবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে মহামতি বিদুর প্রেরিত নৌকায় পাণ্ডবরা বারাবরত নগরের নদীতীরে অন্য পারে এসে উপস্থিত হলেন। এরপর তাঁরা হাঁটাপথ ধরলেন। সন্ধ্যার পূর্বে তাঁরা উপস্থিত হলেন এক মনোরম অরণ্যভূমিতে। ভীমসেন ছাড়া বাকি চার পাণ্ডব ও পাণ্ডবজননী কুন্তী ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে পীড়িত হয়ে শুয়ে পড়লেন বটগাছের তলায়। কিন্তু ভীমসেন তখনও সম্পূর্ণ কর্মচঞ্চল। মা ভাইদের তৃষ্ণার্ত দেখে ভীম যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে জল আনতে গেলেন। অনতিদূরেই জলাশয় দেখতে পেলেন ভীমসেন। স্নান ও জলপান সম্পন্ন করে সবার জন্য জল নিয়ে এলেন ভীম। কিন্তু মা ভাইদের কাছে এসে দেখলেন তাঁরা গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। মা ভাইদের এমন করুণ অবস্থা দেখে মনে মনে ভীমসেন অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাঁর ইচ্ছে করছিল এই সমস্ত কারণের জন্য দায়ী যে দুষ্ট দুর্যোধন — তাঁর প্রতি চরম প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে। অথচ এই মুহূর্তে পাণ্ডবরা নিরুপায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্বাপদশঙ্কুল অরণ্যে নিজে জাগ্রত থেকে মা ভাইদের পাহারা দিতে থাকলেন মধ্যমপাণ্ডব।

এরকম অবস্থায় পঞ্চপাণ্ডব এবং তাঁদের জননীকে দেখতে পায় নরমাংসভোজী রাক্ষস হিড়িম্ব। রাক্ষস বলে কিন্তু অন্য কোনও প্রজাতির প্রাণী নয়, মহাভারতীয় রাক্ষসদের আমরা মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, অনার্য সম্প্রদায়ের, শারীরিক শক্তিতে অত্যন্ত বলবান হিংস্র মানুষ বলে মনে করতে পারি। হিড়িম্বও সেই একই গোষ্ঠীভুক্ত। হিড়িম্ব অনেকটা নিজের এলাকার মাস্তানের মতই তার ভগীনি হিড়িম্বাকে বলে, মানুষের গন্ধে আমার জিভে জল আসছে। তুই যা, মানুষগুলোকে মেরে নিয়ে আয়। আর ওরা যেহেতু আমার এলাকাতেই শুয়ে আছে, তোর কোনও ভয় নেই।

দাদার নির্দেশে হিড়িম্বা এসে উপস্থিত হল নিদ্রামগ্ন পাণ্ডবদের কাছে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়ে জাগ্রত ভীমসেনকে দেখে হিড়িম্বার বড় ভাল লাগল। উজ্জ্বলকান্তি, সিংহসদৃশ এই পুরুষটিকে দেখে প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে গেল হিড়িম্বা। সে মনে মনে

দাদার নির্দেশে হিড়িম্বা এসে উপস্থিত হল নিদ্রামগ্ন পাণ্ডবদের কাছে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়ে জাগ্রত ভীমসেনকে দেখে হিড়িম্বার বড় ভাল লাগল। উজ্জ্বলকান্তি, সিংহসদৃশ এই পুরুষটিকে দেখে প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে গেল হিড়িম্বা।

ভাবল— আমার ভাই এঁদের মারতে বলেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই তা করব না। কারণ ভাইয়ের ভালবাসার চেয়ে স্বামীর ভালবাসা অনেক বেশি উপভোগ্য এবং সে ভালবাসার পরিমাণও বেশি। হিড়িম্বার এই মনোভাব আপাত দৃষ্টিতে কিছুটা বিস্ময়কর মনে হলেও একজন মানুষ যখন পূর্ণ প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে তখন কিন্তু সে তার প্রেমিক বা প্রেমিকার প্রণয়কেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তার স্থায়িত্ব কতটা সময় হবে তা নির্ভর করে অনেক ক্ষেত্রেই সেই সম্পর্কের গভীরতা ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর।

হিড়িম্বা অনার্য নারী, সে আর্য রমণীর মত নাগরিক আদবকায়দায় নিষেধ বা অবগুণ্ঠনের মাধ্যমে প্রেম প্রস্তাব পেশ করতে জানে না। সে যখন ভীমের প্রতি সম্পূর্ণ প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছে, তখন খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে তার হৃদয়ানুরাগ। ভীমের কাছে যাবার আগে হিড়িম্বা বেশ সাজগোজ করে নেয়, যাতে তাকে আভরণে ও বেশভূষায় মার্জিত রুচিশীল মনে হয়। ভীমের কাছে এসে সলজ্জে সে বলল, কোথা থেকে এসেছ তোমরা? তোমাদের পরিচয় কি? মাটিতে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছ তোমরা, তোমরা কি জান না যে এই বনে ভয়ংকর হিড়িম্ব রাক্ষস বাস করে। হিড়িম্বা ভীমের প্রতি এতটাই প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে যে, সে তার ভাই হিড়িম্বার পরিকল্পনার কথা গোপন রাখতে পারে না। হিড়িম্বা বলল, আমার ভাই খুব খারাপ মন নিয়ে একটা কাজ করতে আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সে তোমাদের মেরে তোমাদের মাংস খেতে চায়। কিন্তু এটা আমি হতে দেব না। তোমার এই দেবতার মত চেহারা দেখে আমি আমার ভবিষ্যতের স্বামী হিসেবে আর কাউকেই ভাবতে পারছি না। আর আমার নরখাদক ভাইয়ের হাত থেকে আমিই তোমাকে বাঁচাব। তারপর চলে যাব নির্জন কোনও স্থানে।

ভীম মা ভাইদের পাহারা দিচ্ছেন। এই সময় এই কাজ ফেলে কোনো রাক্ষসী রমণীর প্রেমে সাড়া দেওয়া ভরত বাংশীয় মধ্যম পাণ্ডবের পক্ষে শোভন নয়। তিনি বললেন, বেশ বললে তো! রাক্ষসের থালায় আপনজনদের পরিবেশন করে আমি তোমার সঙ্গে কামার্ত পুরুষের মত বনবিহারে যাই আর কি ! হিড়িম্বা বুঝতে পারে তার আগের কথা স্বার্থপরের মত হয়ে গেছে। তাই সে বলে, তাহলে তুমি সবাইকে জাগাও। আমি সকলকেই বাঁচাব। ভীম এবার সদর্পে বলে উঠলেন, হে তন্বী সুনয়না, ঐ রাক্ষস আমার কিছু করতে পারবে না। তুমি চলে যাও। তোমারা রাক্ষস ভাইটিকে পাঠাও। ভীমের কথার ধরন থেকে বোঝা যায় ভীম কিন্তু হিড়িম্বাকে অপছন্দ করছেন না। তন্বী, সুনয়না ইত্যাদি বিশেষণ হল তার প্রমাণ।

এদিকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর তিতিবিরক্ত হয়ে হিড়িম্ব সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখল তার বোন এক অচেনা পুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপে ব্যস্ত। ক্রোধে হিড়িম্বা বলে উঠল, তুই অসতীর মত পরপুরুষ কামনা করছিস। এদের সঙ্গে তোকেও খুন করব। ভীম হিড়িম্বাকে আশ্বস্ত করলেন। শুরু হল হিড়িম্ব ও ভীমের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ। অবশেষে হিড়িম্বকে বধ করলেন ভীমসেন।

যুদ্ধের তর্জন গর্জনে জেগে উঠলেন কুন্তী ও পাণ্ডবভ্রাতারা। সম্মুখে হিড়িম্বাকে দেখে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন কুন্তী। হিড়িম্বা নিজের পরিচয় জানাল। তার সমস্ত কিছু আনুপূর্বিক বিবৃত করার সঙ্গে সঙ্গে সলজ্জ নম্র কণ্ঠে এও জানাল যে, সে ভীমের প্রতি প্রণয়াসক্ত এবং ভীমকে মনে মনে নিজের জীবনসঙ্গীরূপে বরণ করেছে। আর সে যদি প্রত্যাখাত হয় তবে তার পক্ষে আর জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। হিড়িম্বা নিজের আবেগকে গোপন করেনি। অনার্য সরলতায় প্রকাশ করেছে ভীমের প্রতি তার অনুরাগের গভীরতার মাত্রাকে।

কুন্তী উপলব্ধি করলেন হিড়িম্বার প্রার্থনাকে। উপলব্ধি করলেন যুধিষ্ঠিরও। যুধিষ্ঠির বললেন, হিড়িম্বা, তুমি যা বললে সত্য। কিন্তু আমাদের একটি কথাও তোমাকে শুনতে হবে। তুমি ভীমের সঙ্গে সারাদিন থাকতে পার, যেখানে খুশি ঘুরতে পার। কিন্তু সূর্যাস্তের পর রাত্রিবেলায় ভীমকে আমাদের কাছে এনে দেবে।

হিড়িম্বা রাজি হয়ে যাওয়াতে ভীম বললেন, শোন আমি তোমার সঙ্গে ততদিনই বিহার করব যতদিন না আমাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করছে। তারপর আর পারব না।

এরপর হিড়িম্বা ভীমকে নিয়ে মনোহর পর্বতে, সুপুষ্পিত বনে, নদীচরে, সমুদ্রসৈকতে প্রমোদবিহার করতে লাগল। কিছুকাল পর হিড়িম্বা ও ভীমসেনের এক পুত্র জন্মাল। তার নাম রাখা হল ঘটোৎকচ। এরপর এল সেই বিদায়ের পালা। পরম কষ্টে ভীমকে বিদায় জানাল হিড়িম্বা। বলল, আর্যপুত্র , আমার এই পুত্র যদি কোনওদিন পিতৃকুলের কোনও কাজে আসে তো ডেকে পাঠিও।

পরবর্তী সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের একাঘ্নী বাণের থেকে অর্জুনকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ দেন ঘটোৎকচ।

নিরপেক্ষ বিচার করলে হিড়িম্বার মত শ্রদ্ধেয়া নারী দেখা যায় না। সে অনার্যা। কিন্তু শর্তভঙ্গ করে কোনওদিন স্বামীর কাছে ফিরে আসেনি। স্মৃতি সম্বল করে পুত্রকে স্বামীর উপযুক্ত করে মানুষ করেছে। বিবাহ দিয়েছে। পৌত্র অঞ্জনপর্বাকে বড় করে তুলেছে। পুত্র পৌত্র দুজনেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছে। আর অভাগিনী হিড়িম্বা স্বামীর কল্যাণ কামনায় চিরকাল থেকে গিয়েছে কুটিরের অঙ্গনে প্রতীক্ষায়। ভীমসেনের স্মৃতিতে হিড়িম্বা কতখানি উজ্জ্বল, কতখানি তার আত্মত্যাগ, তা বিচার করবেন পাঠকরা।

শুভ্রজিৎ রায়

সার্চ এন্ড রিসার্চ

আগস্ট মাসের উৎকট গরম। লম্বা লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে আছি, শিয়ালদা ষ্টেশনের ভেতরে। না, এটা টিকিট কাউন্টারের লাইন নয়। আর তাছাড়া সে লাইনের ধার একদমই ধারি না আমি। কারণ, এই স্টেশনের বাইরে, লটারির দোকানগুলোই তো আজকাল রেল কোম্পানির ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়ে বসে আছে। মাত্র এক টাকা বেশি খরচ করলেই সেখানে লোক্যাল ট্রেনের টিকিট কেনা যায়। আর, ভিড়ের শিরঃপীড়া একদমই নেই।

তবে হ্যাঁ, এখন যে লাইনটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেখানেও পরিষেবা মূল্য এক টাকা। এবং খুবই জরুরি সে পরিষেবা। বস্তুতঃ, এতটাই জরুরি যে, তার জন্য লাইনে দাঁড়ানো অনেক লোকই সাক্ষাৎ অধৈর্য্যের প্রতিমূর্তি হয়ে উশখুশ করছে।

বলাই বাহুল্য ওদের সে তাড়া, ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার তাড়া নয় মোটেই। কারণ, এটা হলো স্টেশন গর্ভে, প্ল্যাটফর্মের ধারে পে এন্ড ইউজ পাবলিক টয়লেট। যেখানে লাইন খুব বেশি লম্বা হলে, হামেশাই এক গাদা মরিয়া মুখ আপনার চোখে পড়বে।

দোতলা সমান উচ্চ পুরনো দিনের কক্ষ। আমি দাঁড়িয়ে আছি উর্ধমুখী হয়ে। এবং দেখতে পাচ্ছি, গোদা গোদা রেললাইনের মতো এক সারি লোহার বিম ছাদটাকে স্বস্থানে ধরে রেখেছে। দেখতে দেখতেই ভাবছি, কি দারুণ বুদ্ধি ছিল ঐ পুরনো দিনের স্থপতিদের! রেল কোম্পানির বিল্ডিং বানাতে এসে দিব্যি রেলের তেলেই সরেস করে মাছ ভেজে ফেলেছে!

আওয়াজে গমগম করছে উঁচু ছাদের ঘরটা। একদিকের দেয়ালে সার দিয়ে চারখানা ইউরিন্যাল। তার দু'-একটার সামনের লাইন বাড়তে বাড়তে একদম ঘরের বাইরে। উঁচু নিচু নানা স্বরে কথা বলছে সেই লাইনের লোকজন। অর্থাৎ, সোরগোলের মেজরিটি এই দিকেই।

আর এছাড়া, ঘরের অন্যদিকে খান চারেক কুঠুরিতে বড় বাইরের বন্দোবস্ত। যার রেট দু' টাকা। সেখানেও অবশ্য প্রতিটি কুঠুরির দরজা ব্যাঙ্কের স্ট্রংরুমের দরজার ন্যায় নিরেট ভাবে বন্ধ। ফলে, দরজাগুলোর সামনে অধীরভাবে অপেক্ষারত যে একজন দুজন লোক রয়েছে, সাঙ্ঘাতিক সাসপেন্স আর টেনশন তাদের মুখে চোখে। সঠিক সময়ে দ্বার না খুললে, একদম খুল্লে আম বেইজ্জত হয়ে পড়ার ভয় আছে কি না!

লজ্জার মাথা খেয়ে তাদের কেউ কেউ, আচম্বিত দরজা থাবড়ে মিনতি করছে, ভাইরে আয়রে বাইরে আয়রে বাইরে!

নেহাত শোচনীয় দশা না হলে কে আর আসতে চায় ষ্টেশনের শৌচাগারে। আর বিসর্জনের পালা আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সেদিন আমার এক আশ্চর্য জ্ঞান অর্জন হয়ে গেল সেখানে!

—ও দাদা! ও দাদা! ফোনে কথা বলতে বলতে টয়লেট করবেন না!

গাঁক গাঁক করে এক ভদ্রলোক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন। রীতিমত সিরিয়াস কণ্ঠ তার। আর মাইকের মতো জোরালো বলে, অন্য অনেকের মতো আমারও দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সেই চিৎকার। এবং একটু আশ্চর্য হয়েই ভাবলাম, এমন আপত্তির কারণ কি? আজকাল তো মনে হয়, একমাত্র প্লেন চালানোর সময় পাইলট মশাই আর অপারেশন করার সময় সার্জেন ছাড়া, সব অবস্থাতেই সব্বাই আমরা মোবাইল ফোনে কথা বলাটা জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছি। সুতরাং টয়লেট স্টলে দাঁড়ানো দশাসই লোকটা কি এমন দোষ করল? এক হাতে তার কানে ধরা ফোন, আর অন্য হাতে ইয়ে, মানে, থাক!

—আরে তাউজী কো সমঝাও না! আব হি বেচ দেনা চাহিয়ে। ইশকি বাদ অগড় ভাউ মন্দি মে চলি গয়ি তো পুরাহি নুকসান

দেয়ালমুখি সেই ব্যক্তি, একেবারে ওয়াল স্ট্রীটের উলফ হয়ে, গর্জে গর্জে ইক্যুয়িটি ভাষণ শানাচ্ছে মোবাইলে। কিন্তু তার আট মানুষ পেছনে, লাইনে দাঁড়ানো রোগা পটকা একটি বেঁটে লোক কেন যেন খুব রেগে যাচ্ছে তাতে। জোয়ারের ঢেউ লেগে দুলে ওঠা গঙ্গাবক্ষের বয়ার মতোই, উঁচু নীচু ডিঙ্গি মেরে আবার হেঁকে উঠল সেই লোকটা, আরে দুটো কাজ এক সঙ্গেমে কখনো হোতা নাকি রে বাবা? যে কোনো একঠো তো তুমি আগে খতম করো, আপদ!

—আরে নহি দাদা, ওহ পিসাব ভি কর রহা!

লাইনের সপ্তম ব্যক্তি সান্ত্বনাসূচক স্বরে তার পেছনে দাঁড়ানো ওই অষ্টমকে শান্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

দেখা গেল, অষ্টম সে যুক্তি গ্রাহ্য করতে একেবারেই নারাজ।

—ওরকমভাবে হোতা নেহি মশাই! উসকা ধিয়ান কিধার হ্যাঁয়? ব্রেন কিধার হ্যাঁয়? ফোনমে হ্যাঁয়! ওইজন্য ফালতু ফালতু দেরি হোতা। জানেন আপনি?

সপ্তম ব্যক্তি জানে না জানাতে দুদিকে মাথা নাড়লো। আর অষ্টম, আরও ফায়ার হয়ে চিল চীৎকার করে উঠলো, কানমেঁ ঠুলি গোঁজা নাকি? ইয়ার্কি হচ্ছে? বারণ করছি সেই কখন থেকে!

দশাসই লোকটা এবার রক্তচক্ষু পাকিয়ে ঘুরে তাকাল, আপত্তির উৎস সন্ধানে। আমাদের রোগা পটকা অষ্টম অবশ্য তাতে মোটেও বিচলিত নয়। বুক চিতিয়ে শুধু যে সে নিজেকে দৃশ্যমান করলো, তাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে মাতব্বরি ঢঙে টিপ্পনী মেরে বলল, আরে, যো করতা হ্যাঁয় তুমি জলদি করো। ফোনে গ্যাঁজানোর জন্য বাড়ির বাথরুম আছে!

চারপাশে এক সাথে অনেকগুলো লোক হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল সেই কথা শুনে। দশাসই মশাই তাতে বেশ অপমানিত বোধ করছে, মুখের ভঙ্গীতেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। সর্বকর্ম সমাধা করে বেশ তেরিয়া মেজাজেই সে এগিয়ে এলো অষ্টম (যে কিনা টেকনিক্যালি তখন সপ্তম)-এর দিকে। এবং গোলমেলে উচ্চারণের বাংলায় খ্যাঁক খ্যাঁক করে বলল,

—কি বোলছেন? ফালতু কোথা কেনো বোকছেন?

—কে বলেছে ফালতু? একদম হক কথা বলেছি।

—পুরা বকোয়াস কোথা আছে!

—ল্যাও ঠ্যালা! আপনি গায়ের জোরে দিনকে রাত করবেন বুঝি? ওই যে, দেখুন, ঐদিকে দেখুন!

—কি ঘণ্টা দেখবো?

দশাসই খুব বিরক্ত ভাবে মুখ ফেরালো রোগা লোকটার অঙ্গুলি নির্দেশ লক্ষ্য করে। আর রোগা লোকটা এবার সপ্তম থেকে ষষ্ঠ স্থানে এগিয়ে যেতে যেতে তির্যক স্বরে বলল,

—দেখছেন? আপনার পরে যে নেক্সট ছিল? কেমন সুন্দর, অল্প সময়ে গল্প শেষ করে ফেলল? ওই জন্য ফোনে কথা বলতে বারণ করছিলাম। স্পীড কমে যায়।

—ফির সে ফালতু বাত! ফোন আর পিসাব... কৌনসা কানেকশন হলো এইটা?

—সায়েন্স জানা আছে? এইটা পুরো সায়েন্টিফিক কানেকশান।

—কৌনসা প্রুফ আছে আপনার কাছে, বতাইয়ে!

—ও আচ্ছা! প্রুফ চাই? খুব ভালো কথা! চলুন আমার সাথে। প্রুফ দেখতে চাইলে সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায়?

—হাসপাতালে চল। হাসপাতালের আউটডোরে টেস্টিং মেশিন থাকে। এক্ষুনি টেস্টিং করিয়ে দেখিয়ে দেবো।

আকাশ থেকে পড়ল দশাসই লোকটা, এই বিচিত্র প্রপোজাল শুনে। সত্যি বলতে কি, আর বাকি সবাইও যথেষ্ট অবাক। সুযোগ বুঝে একটি অদৃশ্য স্বর, ফট করে ফুট কেটে বলল, যেতে হয় হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে যান দাদা। ওখানে কিন্তু এখানের চেয়েও বড় লাইন পড়ে!

চারিপাশে আবার নানা মাপের হাসি ফেনিয়ে উঠল এই টিটকিরির প্রতিক্রিয়ায়। আর বিরক্ত দশাসই লোকটি নিজের কপালটাই হাল্কা ভাবে থাবড়ে অস্ফুটে বলল, ধ্যাত তেরি! ইয়ে পুরা পাগলা আদমি আছে!

বাইরে বুঝি তখুনি লম্বা রুটের কোনো লোক্যাল ট্রেন এসে ঢুকেছে প্ল্যাটফর্মে। দশাসই যেই ঘুরে বেরোতে যাবে, অমনি তাকে লাট্টু পাক খাইয়ে, স্রোতের মত এক পাল লোক ভেতরে এসে জমা হতে লাগল। এত জনসমাগমে, ঘরের জড়ানো প্যাঁচানো লাইনগুলো আরও বিপুল ভাবে জট পাকিয়ে গেল এক লহমায়।

ভাগ্যক্রমে, আমার পালা চলে এসেছে ততক্ষণে। গোলমালের ঘোলা স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি নিশ্চিন্তে উঠে পড়েছি পাদানির নিরাপদ ডাঙ্গায়। আহ! স্বস্তি।

অবশেষে ততক্ষণে পেছনে একটা কুঠুরির দরজা খুলেছে তখন। আর সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে উঠলো এক ভয়ঙ্কর হাহাকারের স্বর, আরে মশাই...করেন কি? সরেন, পিছনে সরেন! একদম হাঙ্গামা করবেন না বলতিছি ! এই দরজা আমার! সেই কখন থেকে দাঁড়ায় আছি পাহারা দিয়ে!

টয়লেট...এক প্রেম কথার সেই প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে যখন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম, ডিজিট্যাল ডিসপ্লে-র বুকে তখনও আমার ট্রেন ঘোষিত হয়নি। তাই ভাবলাম, স্টেশনের ফ্রি ওয়াই ফাই-টাকে কাজে লাগিয়ে একটা গুগল সার্চ মেরেই ফেলি। ভদ্রলোক সায়েন্সের দোহাই দিয়ে যেভাবে ফোন কথনকে দোষী করলেন, কথাটা কতদূর যুক্তিগ্রাহ্য দেখা যাক।

গুগল এক অতি নির্বিকার তথ্যদাতা। তাই 'Should you use cellphones while peeing' –টাইপ করার পর, অমন বিদঘুটে সার্চ রিকোয়েস্ট দেখেও ভুরু তুলে বিস্ময় প্রকাশ করল না। বরং কয়েক ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যেই প্রার্থিত জবাব চলে এলো স্ক্রিনে। দেখলাম, ভদ্রলোক ব্রেন সম্বন্ধে যে কথাটা বলছিলেন, সেটা একদম ঠিক। মনঃসংযোগ অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে দেখলেই নাকি ব্রেন মহাশয় আমাদের টয়লেট ফ্লো কমানোর কলকাঠি নেড়ে ফেলেন। অর্থাৎ ফোনে কথা বললে সত্যিই স্পীড কমার সম্ভাবনা থাকে। আর এটার দীর্ঘমেয়াদী কুফল হলো, আপনার ব্লাডারের পেশিগুলো ক্রমশঃ দুর্বল হতে শুরু করবে। আশি বছর বয়সের বার্ধক্য গ্রাস করবে আপনার রেচন প্রক্রিয়াকে।

আমার আশেপাশে আরও অনেক যাত্রী স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে ডিসপ্লে বোর্ডে নজর রাখছিল। এবার গুণগুণ করে উঠলো সেই ভিড়। নড়ে উঠলো কোনো অদৃশ্য সুইচ দ্বারা চালিত হয়ে। হাতে ধরা স্ক্রীন থেকে চোখ তুলে বড় স্ক্রীনে তাকিয়ে দেখলাম, ট্রেন দিয়েছে ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে। বাকি লোকজনের পিছু পিছু সেদিকে এগোতে যাব... কিন্তু নজর আমার আটকে গেল গুগলের আরেকটি সার্চ রেজাল্টে। সেটার হেডলাইনের সারমর্ম হলো, খুবই শিগগিরি নাকি আসতে চলেছে মূত্র দ্বারা চার্জেবল ব্যাটারির মোবাইল ফোন।

আরে বাপরে! 'কি কল বানাইছে সাহেব কোম্পানি'... গানটা মনে পড়ে গেল, এই আশ্চর্য সংবাদ দেখে! প্রতিবেদনটায় এক ঝলক নজর বুলিয়ে দেখলাম, একদল গবেষক নাকি একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোনকে তিন ঘণ্টা ফোন কল করার মত চার্জ দিতে সক্ষম হয়েছেন মাত্র ৬০০ মিলিলিটার ইউরিন ব্যবহার করে!

নাঃ! পা চালিয়ে গিয়ে একটা সীট দখল করে বসতে হচ্ছে তো ট্রেনে। এমন আশ্চর্য বিকল্প শক্তির সম্ভাবনা আগে কখনো শুনিনি বা দেখিনি। ফ্রি ওয়াই ফাই এর আওতায় থাকতে থাকতে, যতটা পারি, জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি বরং! আর আপনারাও যারা উৎসাহী, একটিবার সার্চ করে দেখে নিন!

অভিজিৎ সরকার

প্রতিমা নির্মাণের কারিগরদের পাশে দাঁড়ায় কোন্ দেবতা?

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি থেকেই দুর্গা প্রতিমা তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়, এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কুমোরটুলিতে খোঁজ নিলেই দেখবেন বারোয়ারি পুজোর বায়না প্রায় শেষ। কিছু বাড়ির প্রতিমা বা ছোট পুজোর বায়না হয়ত বা বাকি থাকতে পারে। উৎসবের আগমনী বার্তা সুখী মানুষের মনে খুশির বান ডাকে ঠিকই কিন্তু কিছু খেটে খাওয়া মানুষের কাছে পুজো মানে আজও কেবল ডাল-রুটির সংস্থানটুকুই, সুখ-সাচ্ছন্দ্য-বিলাস তাদের কাছে অধরাই থেকে যায়। যেমন বছরের পর বছর দেবদেবীদের শয়ে শয়ে প্রতিমা নির্মাণের পরেও কপাল ফেরে না কারিগরদের, ক্রমাগত একের পর এক চ্যালেঞ্জ এসে তাঁদের জীবিকাকে সংকটপূর্ণ করে তোলে। পুজোর রোশনাইয়ে নেতা মন্ত্রীরা যখন দেবী প্রতিমা উন্মোচন করেন তখন সেই অপূর্ব দেবীমূর্তি যাঁরা নির্মাণ করেছেন নিজেদের পেটের তাগিদে সেই মৃৎশিল্পীদের কথা কি কারও মনে পড়ে? সরকারি উদ্যোগে এর আগে কুমোরটুলি নাম দিয়ে ছোটবড় শহরে কিছু পরিকাঠামো নির্মাণ, এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য তৈরির চেষ্টা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই চেষ্টা যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তা নয়। প্রথমত স্থান নির্বাচনে ত্রুটি, দ্বিতীয়ত প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত পরিসর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। মৃৎশিল্পীরা উত্তরবঙ্গে আজ নানা চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে সচ্ছলতার স্বাদ পেতে ভুলে গেছেন।

আমার জন্ম হয়েছিল মালবাজার শহরের কাছেই বেতগুড়ি চা বাগানে। ছোটবেলায় দেখতাম বেশ বড়সড় এই চা বাগানে ম্যাজিক শো, ফিল্ড পাবলিসিটি দপ্তরের প্রজেক্টারে সিনেমা, রামলীলা এসব লেগেই থাকত, তবে দুর্গাপূজা আমাদের বাগানে হত না। আমরা পুজো দেখতে চার দিনই বাগানের ট্রাকে অনেক দূরে দূরে ঠাকুর দেখতে যেতাম। ফলে পূজার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল ছোট থেকেই। বিশেষ করে কীভাবে সাধারণ এক মানুষের হাতে পূর্ণাঙ্গ অবয়বের এক অপূর্ব নারী মূর্তি তৈরি হয়ে ওঠে তা দেখবার আকাঙ্খা জন্মেছিল সেই সময়ে। ওদলাবাড়িতে আমাদের এক কাকা থাকতেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা সেসময় কঠিন থাকলেও সেই কাকার বাড়ি যেতে, বিশেষত পুজোর আগে যেতে খুব ভাল লাগত, কারণ ছিল একটাই, ওখানে স্থায়ী মন্ডপে শিল্পী দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতেন।

মনে আছে তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, পড়াশোনার জন্য জলপাইগুড়িতে ভাড়া বাসায় থাকি,পাড়ার ক্লাবের সরস্বতী পুজোর প্রতিমা বায়না দেবার ছুতোয় বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিদিন বিকেলে মৃৎশিল্পীদের কারখানায় হাজির হতাম। সেই সময়ের এক জন নামকরা শিল্পী ছিলেন নিতাই পাল। শিল্পীদের প্রত্যেকের পদবি ছিল পাল। সেই প্রথম দেখি কাঠামো তৈরি, খড় দড়ি দিয়ে বেঁধে অবয়ব, মাটি চাপানো, ছাঁচে ঢালা মুখ, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এক সুশ্রী নারী, স্নিগ্ধ সাজে সে নারী রূপান্তরিত হয় দেবীতে। পুজোর ছুটিতে চা বাগানে যাওয়ার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হত প্রতিমা তৈরির কাজ। দুর্গা ঠাকুর তাঁর চার পুত্রকন্যা, অসুর, সিংহ, আরও কত কি। যখন প্রতিমা তার পূর্ণ অস্ত্র সজ্জিত রূপ পেত তখন আমরা জলপাইগুড়ির বাড়ি তালা ঝুলিয়ে বাগানে ছুটি কাটাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। স্কুলে পড়াকালীন ঠাকুরের মন্ডপ যাত্রার দৃশ্য কোনওদিন দেখা হয় নি।

কিছুদিন আগে কদমতলা দুর্গাপূজা কমিটির কর্মকর্তাদের কাছে শুনেছিলাম, বিগত ষাটের দশকে যে পূর্ণ বিগ্রহের মূল্য ছিল হাজার টাকার মধ্যে বর্তমানে তা পঞ্চাশ হাজার ছুঁয়ে ফেলেছে। পঞ্চাশ বছরে পঞ্চাশ গুণ মুল্যবৃদ্ধির সুলুক সন্ধানে বেরিয়ে দেখলাম মৃৎশিল্পীরা নিরুপায় হয়েই দাম বাড়ান। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এঁটেল মাটি জোগাড় করে রাখতে হয়, নইলে শেষ বেলায় দুস্প্রাপ্য হয়ে ওঠে প্রতিমা তৈরির মাটি। এরপর বাঁশ, খড়, কাঠ, সুতলি, বিভিন্ন ধরনের রঙ, প্রসাধনের জিনিস, দেব দেবীর নানা রকম অস্ত্র আরও কত কী যে প্রয়োজন হয় তার ইয়ত্তা নেই। উপকরণের লাগাম ছাড়া মূল্য বৃদ্ধি শিল্পীদের সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গে বাঁশের অভাব কোনদিন অনুভূত হয়নি। বাঁশ ছিল সস্তার সামগ্রী। কিছুদিন আগেও একটা বাঁশের দাম ছিল ৪০-৫০ টাকা, অথচ তার বর্তমান দাম ১২০-১৩০ টাকা। এই সেদিন এক ট্রাক মাটির মূল্য ছিল ৭৫০০-৮০০০ টাকা, এবছর তা বেড়ে হয়েছে ২০০০০-২২০০০ টাকা। একই রকম ভাবে খড়, কাঠ, সুতলি সব কিছুর মূল্য প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর আছে কাজ চলাকালীন মূলধনের অভাব। বারোয়ারি পূজা কর্তৃপক্ষ যেহেতু চাঁদার উপর নির্ভরশীল কাজেই প্রতিমার বায়না স্বরূপ বড় অঙ্কের টাকা তাঁদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। এদিকে অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলি বিশেষত ব্যাঙ্কগুলি কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রতিমা শিল্পে দাদন দিতে চায় না। দুর্গাপূজায় মৃৎশিল্পীদের কার্যকরী মূলধনের চাহিদা যদি দশ লক্ষ টাকা হয় তবে সরস্বতী পূজোয় মূলধন লাগবে হয়ত দু লক্ষ টাকা, সেটা কালী পূজোতে পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থাৎ একেক পূজোয় একেক রকম ক্রেডিট লিমিটের প্রয়োজন। ড্রয়িং পাওয়ার সিজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আসলে কেউ এত ঝামেলা বহন করতে চায় না। প্রবীণ মৃৎশিল্পী জীবনদা বলছিলেন যে ওনারা চল্লিশ বছর আগে নিজেদের একটা সংগঠন তৈরি করেছিলেন। তারপর জেলা প্রশাসন ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে নানাসময় দরবার করেছেন কিন্তু সে উদ্যোগ খুব কিছু ফলদায়ক হয়নি। আমরা পরামর্শ দিয়েছিলাম জেলার লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার এবং নাবার্ড-এর ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজারের সাথে অবিলম্বে দেখা করে অন্তত সম্পূর্ণ সমস্যাটা একবার বোঝানোর জন্য। নইলে শিল্পীদের চড়াসুদে টাকা ধার করতে হয় এবং ঋণ পরিশোধের পর লাভের ঘরে কিছুই আর থাকে না।

জলপাইগুড়ির এক প্রবীণ শিল্পী বলছিলেন, আগের থেকে এখন কাজের পরিমাণ অনেক বেশি। শীতলা, মনসা, সন্তোষী, বাসন্তী দেবীর মূর্তি তৈরির বায়না এখন অনেক বেশি আসে। আর কালী প্রতিমার চাহিদা তো সারা বছর ধরেই থাকে। তবে দুর্গা প্রতিমার বায়নার উপরই শিল্পী পরিবারের সারা বছরের সংস্থান নির্ভর করে।

বিকাশবাবু অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মের শিল্পী। গ্রাজুয়েট হয়েছেন এবং বর্তমানে প্রতিমা তৈরিই তাঁর জীবিকা। তিনি বলছিলেন কী করে আরও ভাল মানের কাজ করা যায় তারই নিত্য ভাবনা ও প্রচেষ্টা চালাতে হয় বছরভর। প্রতিমা নির্মাণে উত্তরবঙ্গের মাঝারি মাপের ক্লাবগুলিতেও আজকাল দেখা যাচ্ছে কলকাতা থেকে শিল্পী এনে কাজ করাবার রীতি বাড়ছে। সেজন্য নিজেদের কাজের গুণমানে প্রতিবার আরও উন্নতি না ঘটালে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা বা প্রতিমার সঠিক দাম পাওয়া দুইই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মতে, শ্রম দিলে প্রতিমা নির্মাণের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা অবশ্যই সম্ভব তবে ডালভাত থেকে পোলাও-মাংসতে উন্নীত হওয়া কঠিন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন মেধা সম্পন্ন সৃজনশীল ছেলেমেয়েরা এই পেশায় এলে অন্যরকম চেহারা নিতে পারে এই পেশা। মফস্বল শহরে মহিলারা এই কাজে যুক্ত থাকেন না অথচ এসব সুক্ষ্ম কাজে মহিলাদের স্বভাবগত দক্ষতা অস্বীকার করা যায় না। বিকাশবাবুর স্ত্রী কিন্তু তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন। বিকাশবাবুকেই জিজ্ঞেস করি, প্রতিমা নির্মানে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিলে কোনও সুরাহা হবে কিনা। উত্তরে বিকাশবাবু বললেন, হয়ত হবে, কিন্তু শিল্পীর হাত আর তুলিরই কদর বেশি।

দুর্গোৎসবের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা যেমন আজ আর ধর্মীয় আধারে আবদ্ধ থাকে নি তেমনই প্রতিমা নির্মাণ এখন শুধুমাত্র বাঁশ, খড়, মাটিতে আবদ্ধ নেই, বোতাম থেকে চিনে বাদামের খোসা বহু কিছুই প্রতিমা তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদেশের পুজোয় প্রতিমা সাবধানী মোড়কে উড়োজাহাজে পাড়ি দেয়, ফাইবারের প্রতিমার চলও বিদেশে কোথাও কোথাও রয়েছে। কয়েক বছর আগে একবার পুজোর সময় বিলেতে ছিলাম, দেখেছি পুজোর নির্ঘন্ট-আচার-উপাচার যতটা নিষ্ঠার সঙ্গে না মানা হয়, কয়েকটি বিধান প্রবাসী ভক্তরা খুব মেনে চলেন। যেমন অঞ্জলির ফুল বেলপাতা ঠাকুরের পায়ে দেওয়া যাবে না, কিংবা ঠাকুরের যাত্রাকালে মুখে পান বা মিষ্টি ছোঁয়ানো যাবে না ইত্যাদি। এসবের কারণ একটাই, যাতে প্রতিমাটিকে একইরকম অমলিন রেখে পরপর কয়েক বছর পূজা করা সম্ভব হয়। না করেই বা উপায় কী! পঞ্চাশ হাজারের দেবী প্রতিমা তো ওদেশে পৌঁছতে পৌঁছতে পাঁচ লাখী হয়ে যান। তা সে হোক না যতই ডলার-পাউন্ডের পুজো, বাঙালির পকেটের সাইজ তো পৃথিবীর কোথাওই খুব একটা বড় থাকে না।

শৌলমারির সাধুর কল্যাণেই ফালাকাটার নাম ছড়িয়েছিল দেশ জুড়ে

দশকটি গত শতকের ষাটের। আরও নির্দিষ্ট বললে ১৯৫৯ সাল। ফালাকাটায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি আশ্রম। প্রতিষ্ঠাতা সারদানন্দজী। এর আগে তাঁকে দেখা যাচ্ছে বীরপাড়ার কাছে থাকা তাসাটি চা বাগানের বড়বাবু অনাথবন্ধু ঘোষের বাড়িতে রাত কাটাতে। এখানে একটি গল্প আছে। ডুয়ার্স বিশেষজ্ঞ শ্রী ব্রজগোপাল ঘোষের কাছে শোনা। তিনি সে সময় কিশোর। থাকেন তাসাটি চা বাগানে। ব্রজগোপালবাবুর কথায় ' তাসাটি চা বাগানের বড়বাবু একদিন কোয়ার্টারে ফিরে দেখলেন তাঁর বিলেতফেরত জামাই পায়চারি করছেন। তাঁকে দেখেই জামাই জানালেন যে এক সাধু এসেছিলেন। থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি নাকচ করে দিয়েছেন। সাধু চলে গেছেন জটেশ্বরের দিকে। বড়বাবু বিরক্ত হলেন জামাইয়ের কথায়। সাধুসন্তের ব্যাপার বলে কথা। কালক্ষেপ না করে বাগানের ডাক্তারবাবু বিভূতিভূষণ মৈত্র ও অন্য সহকর্মী বীরেন চক্রবর্তীকে নিয়ে রওনা দিলেন সাধুকে ফিরিয়ে আনতে। সাধু বেশি দূর যান নি। এক গাছতলায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। অনেক অনুরোধে তিনি রাজী হলেন যেতে ঠিকই তবে জানালেন তাঁর থাকবার ব্যবস্থা ঘরের বাইরে করতে হবে এবং তিনি স্নান করবেন। তাইই হল। আহার গ্রহণ করলেন না। সারারাতে মোট আটবার স্নান করলেন। পরদিন সাধু চলে গেলেন ফালাকাটায়। তখনও কেউ ভাবি নি বা বুঝিও নি এই সাধু ইতিহাস গড়বেন। '

ফালাকাটায় ডঃ রমণীমোহন দাসের চেম্বারে সাধুকে দেখা গেল এরপর। বসলেন নেতাজীর ছবির নীচে। 'তুই' সম্বোধনে ডাঃ দাসকে জানালেন তিনি থাকবেন ও রাতে দুধ খাবেন এবং কলা লাগবে। দুধে এক বিন্দু জল থাকলে এবং কলায় কোন দাগ থাকলে তাঁর চলবে না। স্পষ্টতঃই বিরক্ত ডঃ দাসের কথা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন চেম্বারে উপস্থিত লোকেরা নেতাজীর ছবি ও সাধুর দিকে ঈশারায় দেখতে বললেন। এরপরই ডাঃ

ফালাকাটায় ডঃ রমণীমোহন দাসের চেম্বারে সাধুকে দেখা গেল এরপর। বসলেন নেতাজীর ছবির নীচে। 'তুই' সম্বোধনে ডাঃ দাসকে জানালেন তিনি থাকবেন ও রাতে দুধ খাবেন এবং কলা লাগবে। দুধে এক বিন্দু জল থাকলে এবং কলায় কোন দাগ থাকলে তাঁর চলবে না। স্পষ্টতঃই বিরক্ত ডঃ দাসের কথা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন চেম্বারে উপস্থিত লোকেরা নেতাজীর ছবি ও সাধুর দিকে ঈশারায় দেখতে বললেন।

দাসের তদগত হয়ে যান। কেননা ততক্ষণে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে এই সাধু আর কেউ নন, স্বয়ং নেতাজী। ছবির সাথে সাধুর চেহারার অদ্ভুত মিল।

সেবার চলে গেলেও কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসেন সাধু এবং ফালাকাটার উপকণ্ঠে শৌলমারিতে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর আশ্রম। ক্রমে স্থাপিত হল প্রাথমিক বিদ্যালয়। জমি দিলেন ফালাকাটার বহু মানুষ। এলাকা বাড়ল আশ্রমের। অনেকে সরকারি বিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে যোগ দিলেন আশ্রমের বিদ্যালয়ে। আশ্রমের প্রবেশপথেই অখন্ড ভারতবর্ষের ম্যাপ (ততদিনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান এবং ভারত— এই তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে দেশ), ভেতরে উপাসনাস্থল, বিরাট মাঠে বেদী যেখানে বসে সাধু সম্বোধন করেন আম-জনতাকে, পঞ্চবটি ইত্যাদি। আশ্রমে জেনারেটর চলে রাতে বিদ্যুতের জন্য। এলাহী কান্ডকারখানা।

চেহারায় ভীষণ সাদৃশ্যের জন্য সবার মনে বদ্ধমূল ধারণা হল সারদানন্দই নেতাজী। টনক নড়ল ভারত সরকারেরও। সরকারি স্তরের আধিকারিকরা আসতে শুরু করলেন। আসলেন বহু বিখ্যাত ব্যক্তি। সাধুর মর্জি মত কেউ আশ্রমে প্রবেশের অনুমতি পেলেন, কেউ পেলেন না। আম জনতার তো কথাই নেই। দলে দলে আসতে শুরু করলেন তারা। এই দলের মধ্যে ছিলেন কোচবিহারের তিন নামী বিদ্যালয়ের তিন প্রধানশিক্ষক, জেনকিন্স স্কুলের কালীপদবাবু, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের সতীশবাবু ও টাউন হাই স্কুলের মোহিনীমোহনবাবু। তাঁরা এতটাই মুগ্ধ হলেন যে কোচবিহারে ফিরে ঠিক করলেন নেতাজীর জন্মজয়ন্তী

সবগুলি বিদ্যালয় মিলে একসাথে উদ্‌যাপন করা হবে। তাঁদের সৃষ্ট সেই উদযাপন আজও একইভাবে পালিত হয় শহর কোচবিহারে। সবকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাতে অংশ নেয়। সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গে এরকমটি আর কোথাও হয় না। যাই হক, সারদানন্দজী কোনদিন স্বীকার করেন নি তিনি নেতাজী। উল্টে এই কথায় ভীষণ বিরক্ত হতেন তিনি। কিন্তু তিনি নেতাজী এই ব্যাপারে যারা বিশ্বাস করেন তাদের যুক্তি হল ফালাকাটার কাছে থাকা মুজনাই পারের শৌলমারিকে বেছে নেওয়ার পেছনে ছিল নেতাজীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। অবস্থান হেতু ফালাকাটার কাছে হলেও অর্থাৎ সাবেক জলপাইগুড়ি জেলার কাছে হলেও শৌলমারি কোচবিহার জেলায়। তাই পুলিশ আসতে সময় লাগতই সে সময়। ফালাকাটার খুব কাছে মাদারিহাট। জলদাপাড়া-সহ বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি। ভূটান দু'পা এগোলেই। ওদিকে কোচবিহার পার করতে পারলেই আসাম রাজ্য শুরু। এদিকে শিলিগুড়ি দিয়ে নেপালও দূর নয়। যদি আবার অন্তর্ধান করতে হয় তবে ফালাকাটা তথা শৌলমারি আদর্শ স্থান।

ফালাকাটা এই সময়ে যে সর্বভারতীয় পরিচয় পেয়েছিল তার নেপথ্যে ছিল শৌলমারি। ফালাকাটার শৌলমারি। আজ নেহাতই একটি ছোট্ট জনপদ। কল্পরেখার বিচারে খাতায়-কলমে কোচবিহার জেলার হলেও ফালাকাটাই তার পরিচয়। ফালাকাটা মহাকালবাড়ি মন্দির, শ্মশান পার হয়ে সোজা রাস্তা ধরে এগোলে আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ আগেও আরণ্যক পরিবেশে পৌঁছে যাওয়া যেত শৌলমারিতে। ক্রমবর্ধমান নগরবিস্তার সেই পরিবেশকে কেড়ে নিয়েছে আজ। পথের দু'ধারেই বাড়িঘর আর বাড়িঘরের ফাঁকফোকর দিয়ে মুজনাই নদীর বয়ে চলা দেখতে দেখতে খুব তাড়াতাড়িই যেন পৌঁছে যাওয়া যায় শৌলমারিতে। শৌলমারি আশ্রম পার হয়েই বাঁ হাতে কোচবিহার চা বাগান। চা বাগানের ভেতর দিয়ে খানিক এগিয়ে ওঠা যায় কোচবিহার-মাথাভাঙাগামী রাজ্য সড়কে। আর চা-বাগানের ভেতর দিয়ে না গিয়ে সোজা গেলেও সে পথ এঁকেবেঁকে পৌঁছে দেবে রাজ্য সড়কে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, প্রচুর বাড়িঘর তৈরি হলেও শৌলমারিতে আজও গ্রামীণ গন্ধ। সারল্য তাদের জীবনযাত্রায়।

১৯৬৭ সালে সারদানন্দজী চলে যান পাকাপাকি ফালাকাটা থেকে। ১৯৭৭ সালে দেরাদুনে দেহ রাখেন। তাঁকে ঘিরে যে মিথ সৃষ্টি হয়েছিল তার অভিঘাত আজ মিলিয়ে গেছে ঠিকই তবু তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা আজও

শৌলমারি আশ্রম, মুজনাই নদী, কোচবিহার চা-বাগান, সামান্য দূরে মুজনাই-জলঢাকার মিলন ও মানসাই নামে সম্মিলিত প্রবাহের বয়ে চলা, সূর্যাস্তের সময় মুজনাইয়ের জলের রক্ত আভা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে পর্যটক আকর্ষণে অন্যতম বাজি হতে পারত, এখনও পারে।

শৌলমারিতে মিলিত হন, দেখভাল করেন আশ্রমের। তিনি নেতাজী ছিলেন কিনা সে কূট তর্কে যাব না। শুধু এটাই বলব এক রহস্যময় ব্যাপারের মতোই তাঁর আগমন বীরপাড়া-জটেশ্বর হয়ে, চলেও যাওয়া জটেশ্বর-বীরপাড়া হয়ে তাঁর সর্বক্ষণের সাথী সিগারেট মুখে নিয়ে। ডুয়ার্সের অনেক রহস্যের মতোই আজও কেমন এক রহস্য যেন শৌলমারি আশ্রম।

আজকের শৌলমারি ফালাকাটার কৃষি-উন্নয়নে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। মুজনাই নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বলে সেচের জলের ক্ষেত্রেও অসুবিধা তেমন নেই। ফালাকাটার কৃষিমান্ডিও সহায়ক হয়ে উঠেছে ফসল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। তবে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা আজও নিত্যসঙ্গী এই অঞ্চলের। কবে পিচের প্রলেপ পড়েছিল তা মনে করতে পারলেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনার জন্য ভরসা ফালাকাটার বিদ্যালয়গুলি। যদিও কিলোমিটারের হিসেবে ফালাকাটা-শৌলমারি দূরত্ব কিছুই না তবু মনে হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে নজর দেওয়ার সময় হয়ে এসেছে। চিকিৎসার ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। ভরসা সেই সাবেক ফালাকাটা। দোকানপাটও নেই বললেই হয় সেভাবে। কিছু মুদি দোকানের ওপর ভর করে তো কোন জায়গার তেমন উন্নয়ন হতে পারে না, সে কথা কে না জানে। তাই ফালাকাটার প্রায় যমজ হওয়া সত্ত্বেও শৌলমারির অর্থনৈতিক ভিত্তি আজও কৃষি। শৌলমারিকে ঘিরে পর্যটনের যে বিকাশ ঘটানো সম্ভব ছিল তা হয় নি বললেই হয়। শৌলমারি আশ্রম, মুজনাই নদী, কোচবিহার চা-বাগান, সামান্য দূরে মুজনাই-জলঢাকার মিলন ও মানসাই নামে সম্মিলিত প্রবাহের বয়ে চলা, সূর্যাস্তের সময় মুজনাইয়ের জলের রক্ত আভা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে পর্যটক আকর্ষণে অন্যতম বাজি হতে পারত, এখনও পারে। কোচবিহার চা বাগানই কোচবিহার জেলার সম্ভবতঃ একমাত্র চা বাগান যেখানে কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের নামাঙ্কিত হাসপাতালটি দেখা যায়।

শৌলমারি ও ফালাকাটার যুগলবন্দী অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। একে অপরের সাথে এমনই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আছে যে দুজনেই দুজনের সুখ-দুঃখের শরিক। শরিক ভাবনারও। ফালাকাটার উন্নয়নে শৌলমারির অবদান অনস্বীকার্য হতে পারে, তেমনি শৌলমারির উন্নতি মানে ফালাকাটারও উন্নতি।

শৌভিক রায়

শৈবতীর্থ বাণেশ্বর বৌদ্ধমূর্তি? নাকি বৌদ্ধ প্রভাব?

প্রতিবেশি পি এন পি সি

পুরাকালে দৈত্যরাজ বাণাসুর প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের রাজত্ব দখল করে নেন, যদিও তার ইষ্ট দেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের আদেশে তিনি দেবরাজকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। স্বর্গরাজ্য দেবতাদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েই বাণাসুর অনুশোচনা করতে শুরু করেন যে, দেবতারাই পৃথিবীর অধিপতি হবার কারণে আমার রাজ্যের প্রজাদের পরিণতি এরপর কী হবে? মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্যের প্রজাদের দেবতারা স্বস্থান থেকে তুলে নিয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা দেবার অভিপ্রায়ে যদি যমের হাতে সমর্পণ করে তাহলে তা হবে এক মর্মান্তিক বিষয়। অতএব দৈত্যরাজ বাণ মনে মনে স্থির করলেন উজানী নগরেই তিনি দ্বিতীয় কাশীনগর স্থাপন করে মহাদেবকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করবেন।

এই অভিপ্রায়ে মনোস্কামনা পূরণের লক্ষ্যে কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করতে রাজ্যপাট ত্যাগ করে গহন অরণ্যে গমন করলেন বাণাসুর। কঠিন তপস্যায় মগ্ন হলেন। অবশেষে তপস্যায় ইষ্টদেবতা শিবকে তুষ্ট করতে সমর্থ হলেন। অতঃপর তাঁর কাছে এই বর প্রার্থনা করলেন যে, দেবাদিদেব মহাদেবকে তিনি কৈলাশ থেকে মর্ত্যে আনয়ন করে জল্পেশ্বরে অর্থাৎ তাঁর রাজত্বে তাঁকে স্থাপন করবেন। গড়ে উঠবে দ্বিতীয় কাশীনগর ধাম। বাণাসুরের প্রার্থনা মহাদেব মঞ্জুর করলেন বটে তবে তাঁর পরাক্রমে মনে মনে কিছুটা শঙ্কিত হলেন। তিনি বাণাসুরের কাছে শর্ত রাখলেন যে, মহাদেবকে মস্তকে স্থাপন করে সূর্যোদয়ের পূর্বে জল্পেশ্বরে পৌঁছতে হবে; তবেই তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে, নচেৎ নয়। বাণাসুর শিবের এই শর্ত মেনে নিয়ে ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে স্বর্গপুরী কৈলাশ থেকে মর্ত্যের দিকে যাত্রা করলেন। একে লাফে দ্বাদশ যোজন পার হয়ে রাত্রির শেষ প্রহরে জল্পেশ্বরের কাছাকাছি এসে মূত্রত্যাগ করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। সামনে পেয়ে গেলেন এক ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণের কাছে মহাদেবকে গচ্ছিত রেখে দৈত্যরাজ মূত্রত্যাগ করতে গেলেন। কিন্তু দেবতাদের ছলনায় তাঁর মূত্রত্যাগ সম্পন্ন হতে ভোর হয়ে যায়। পুব আকাশে সূর্যদেব উদিত হয়েছে। বাণাসুর মূত্রত্যাগ সম্পন্ন করে এসে দেখলেন ব্রাহ্মণ মহাদেবকে ভূমিতে রেখে গাত্রোত্থান করেছেন। ফলে বাণাসুরের মনোস্কামনা অধরাই রয়ে গেল। ভগ্নমনোরথ বাণাসুর অনোন্যপায় হয়ে ইষ্ট দেবতা শিবের কাছে করুণ মিনতি জানালে ভক্তের আবেদনে সাড়া দিয়ে মহাদেব তাঁকে সেখানেই স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হল মহাদেব। বাণেশ্বর হল লিঙ্গপীঠ এবং অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে দেবাদিদেব সেখানে পূজিত হতে লাগলেন। বাণাসুরের রাজ্য শৈবরাজ্যে পরিণত হল। বাণাসুরের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থাননাম হয়ে উঠল বাণেশ্বর। সেখানে অর্দ্ধনারীশ্বররূপী চলন্ত বাণেশ্বর শিব আজও ভক্তবৃন্দের কাছে পূজিত হয়ে চলেছে। বাণেশ্বর শিব মন্দিরের অদূরে ক্ষীণ ধারায় বয়ে চলেছে বংতী নদী। এটাই বাণেশ্বর শিব মন্দিরের বহুল প্রচলিত লোক কাহিনি। এর বাইরেও রয়েছে আরও লোক কাহিনি।

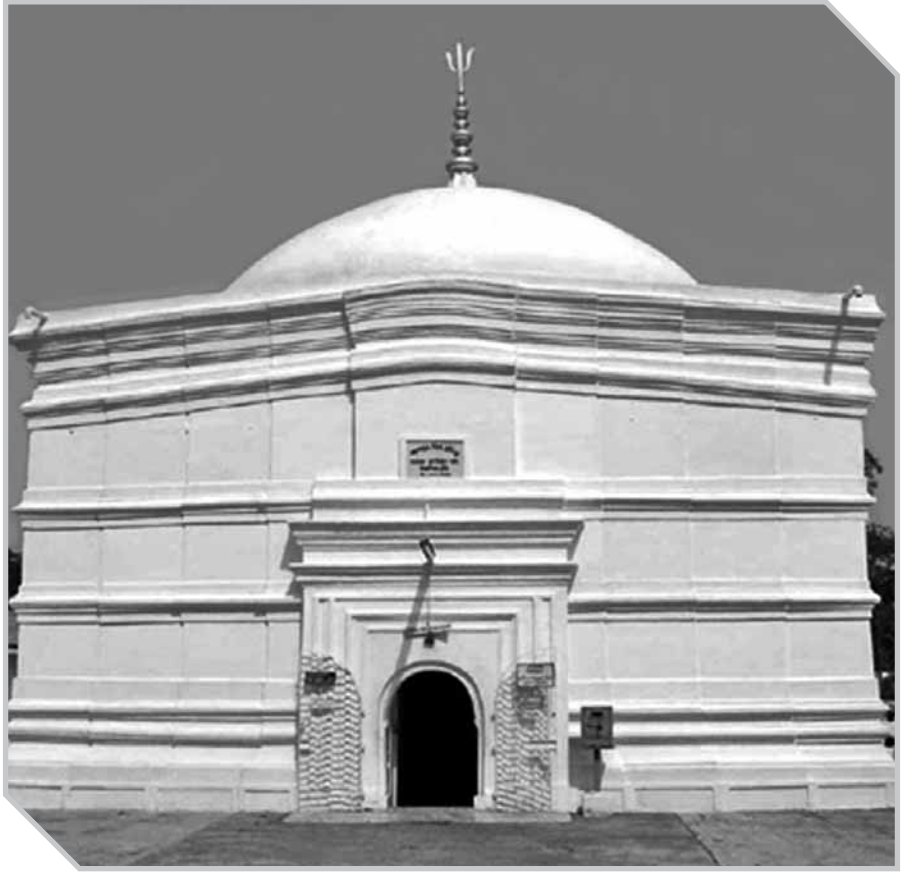

কোচবিহার শহর থেকে ১২ কিমি দূরত্বে কোচবিহার— আলিপুরদুয়ার সড়কে বাণেশ্বর বন্দরের অবস্থান। এখানেই রয়েছে প্রাচীন শিবমন্দির। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মহারাজ প্রাণনারায়ণ কর্তৃক পুনঃনির্মিত এই মন্দির এক দ্রষ্টব্য বিশেষ। কথিত ষোড়শ শতকে কোচবিহার রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি মহারাজ নরনারায়ণ জঙ্গলের মধ্যে শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করে সেখানে মন্দির নির্মাণ করেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মহারাজ প্রাণনারায়ণকে তাহলে নতুন করে মন্দির নির্মাণ করতে হল কেন? এর উত্তর অনুসন্ধানে যেটা অনুমিত হয়, ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলার নেতৃত্বে আক্রমণের সময় এই এলাকার প্রায় সকল মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে মহারাজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করে পুনরায় দেবস্থানগুলি পুনঃনির্মাণে ব্রতী হন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের হাত ধরেই বাণেশ্বর, গোসানিমারি, জল্পেশ প্রভৃতি মন্দির পুনঃনির্মিত হয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সররকারের পর্যটন দপ্তরের অধীনস্ত কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের পরিচালিত

শ্রাবণী পূর্ণিমায় বিন্দোলে

৬০০ বছরের প্রাচীন ভৈরবীর বন্দনা

কেমন হত যদি বই এর পাতায় ছাপানো ইতিহাসকে বাস্তবে ছুঁয়ে দেখতে পারতাম আমরা! অথবা পৌঁছে যেতে পারতাম পুরোনো সময়ে! উত্তর দিনাজপুরের জেলা সদর রায়গঞ্জ শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বিন্দোল। এখানেই দেখা মিলবে ইতিহাসের নানা স্মৃতি বিজড়িত ভৈরবী মন্দিরের। উত্তর দিনাজপুরের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম এই ভৈরবী মন্দির প্রায় ৬০০ বছরেরও বেশি পুরনো। স্থানীয় মানুষদের মুখে জানা যায়, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় এই মন্দিরে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় পুরাকীর্তি গুলির মধ্যে রয়েছে নানা মঠ, মন্দির, মসজিদ, মাজার, জমিদার বাড়ি, কাছারিবাড়ি প্রভৃতি। কিন্তু এই ভৈরবী মন্দিরটির গঠন লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, হিন্দু -মুসলিম সংস্কৃতি যেন মিলে মিশে গেছে। কিন্তু কীভাবে এমন ভাস্কর্য গঠিত হয়েছিল! এই বিষয়ে জেলার ইতিহাসবিদ ডঃ বৃন্দাবন ঘোষ জানিয়েছেন, ১৪১৫-১৮ সালে ভাতুরিয়ার তৎকালীন জমিদার গণেশ নারায়ণের আমলে তৈরি হয়েছিল এই মন্দিরটি। ভাতুরিয়া থেকে বিন্দোল এর দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। যদিও বর্তমানে ভাতুরিয়া বাংলাদেশে অবস্থিত। জমিদার শিব ভক্ত হওয়ায় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ইট ও চুন সুরকি দিয়ে তৈরি এই মন্দিরের প্রতিটি দেওয়াল কারুকার্যখচিত ও পোড়া মাটি বা টেরাকোটা শিল্পকলা দিয়ে নিপুণ ভাবে বানানো হয়েছিল। পাল যুগেও এই শিল্প বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল। মধ্যযুগেও এই ধরনের শিল্প নানা স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে চিরাগ ও গোম্বুজাকৃতি ছাদ মালদা জেলার হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতিতে তৈরি লোটন মসজিদের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাদশাহি সড়ক ও বালিয়াদিঘীর বুরহান ফকিরদের কেল্লাও দুই মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। বলা হয় সেই সময়কালের বেশিরভাগ জুড়েই সুলতানি আধিপত্য থাকাতেই ২১ ফুট উঁচু ও ৭০ ফুট চওড়া এই মন্দিরটির ভাস্কর্যে ইসলামিক প্রভাব রয়েছে।

এই মন্দিরে রয়েছে কষ্টিপাথরের একটি সূর্যমূর্তি। জানা যায়, বৈদিক যুগে সবচাইতে বেশি পূজিত হতেন সূর্য দেবতা। তাই এই মূর্তিটিও সমসাময়িক সময়কালের বলে মনে করা হয়। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে বাংলায় সূর্য দেবতার পুজো শুরু হয়। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে বিন্দোল এলাকায় এই মূর্তি গড়ে ওঠে। মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট। দেহের গুরুভার গড়ন এবং চোখ দুটি খোলা ও গোলাকৃতি। সূর্য দেবতার কোনো কোনো মূর্তি দ্বিভুজ, ষড়ভুজ আবার দশভুজও হয়ে থাকে। ভৈরবী মন্দিরের মূর্তিটি দশভুজের ছিল বলে জানা যায়। যদিও ধর্মবিদ্বেষী কোনো শাসকের আমলে তা ধ্বংসের মুখে পড়ে। ভেঙে দেওয়া হয় মূর্তির উদরও। কথিত আছে গণেশ রাজার ছেলে কোনও এক ইসলাম ধর্মের মেয়ের সাথে প্রণয় সম্পর্কে আবদ্ধ হন। সেই সম্পর্ককে পরিণয়ের রূপ দিতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয় তাকে। তার নামকরণ করা হয় জালালউদ্দিন। যদিও বেশ কিছু সময় পড়ে ফের সে হিন্দু ধর্মে ফিরতে চায়। কিন্তু তৎকালীন পুরোহিতদের নিদানে তার বিরোধিতা হতে থাকে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে জালালউদ্দিন এলাকাজুড়ে অবস্থিত বিভিন্ন মন্দির ধ্বংস করতে থাকে। এই মন্দিরটি ভাঙার পেছনেও এই ধরনের গল্প শোনা যায়। এই মূর্তিটি কারুকার্যখচিত একটি রথের আদলে তৈরি আসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক যুগে রথের প্রভাব বেশি থাকায় এই মূর্তিতেও তা পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাশ্ব চালিত এই রথের আদলে তৈরি বেদির দুই পাশে দুটি নারীমূর্তি দেখা যায়। মনে করা হয় যে এই দুই নারী হলেন, ঊষা ও প্রত্যুষা। এই সূর্য মূর্তিটি মার্তণ্ড ভৈরবের বলে জানা যায়। লোকমুখে শোনা যায়, বহুদিন ধরে এক সাধিকা এই মন্দিরে ভৈরবের পুজো করতেন। তাই তাকে ভৈরবী বলা হত। তার নামেই এই মন্দিরের নামকরণ করা হয় ভৈরবী মন্দির। তার সাধনায় বহু বিপদ থেকে মুক্তি পায় তৎকালীন বর্ধিষ্ণু এই গ্রাম। এলাকাবাসীরা এখানে পুজো দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। আজও এই একই বিশ্বাসে পুজো করেন গ্রামবাসীরা।

১৪১৫-১৮ সালে ভাতুরিয়ার তৎকালীন জমিদার গণেশ নারায়ণের আমলে তৈরি হয়েছিল এই মন্দিরটি। ভাতুরিয়া থেকে বিন্দোল এর দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। যদিও বর্তমানে ভাতুরিয়া বাংলাদেশে অবস্থিত। জমিদার শিব ভক্ত হওয়ায় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ইট ও চুন সুরকি দিয়ে তৈরি এই মন্দিরের প্রতিটি দেওয়াল কারুকার্যখচিত ও পোড়া মাটি বা টেরাকোটা শিল্পকলা দিয়ে নিপুণ ভাবে বানানো হয়েছিল।

মন্দির হিসাবে পরিচিত বাণেশ্বর শিবমন্দির। সরকারি খরচে এই মন্দিরের নিত্য পূজা ও বিশেষ পূজা সম্পন্ন হয়। মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ বা শিবমূর্তির ডানহাতে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা ও বাম হাতে ধ্যান মুদ্রা দেখে ইতিহাস গবেষকের ধারণা এটি আসলে একটি বুদ্ধমূর্তি, যার সঙ্গে নবম-দশম শতাব্দির বৌদ্ধতন্ত্রের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। অন্যান্য বিগ্রহের মধ্যে মহাদেবের বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তিটি শিব-দুর্গার সম্মিলিত রূপ। মূর্তিটিতে ডান অঙ্গটি শিবের ও বাম অঙ্গটি দুর্গার। বছরে দু'বার এই বিগ্রহকে কোচবিহার শহরে মদনমোহন

মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ বা শিবমূর্তির ডানহাতে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা ও বাম হাতে ধ্যান মুদ্রা দেখে ইতিহাস গবেষকের ধারণা এটি আসলে একটি বুদ্ধমূর্তি, যার সঙ্গে নবম-দশম শতাব্দির বৌদ্ধতন্ত্রের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়।

মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। একবার দোল পূর্ণিমার পরদিন দোলসোয়ারী উৎসবে এবং দ্বিতীয়বার মদন চতুর্দ্দশী তিথিতে। এছাড়াও বাণেশ্বর শিব, নারায়ণ শিলা প্রভৃতির নিত্য পূজা হয়। শিব চতুর্দ্দশী তিথি উপলক্ষ্যে বসে এক জমজমাট মেলা। শ্রাবণ মাস জুড়ে ভক্তবৃন্দের ঢল নামে শিব লিঙ্গের মাথায় জল ঢালার উদ্দেশ্যে।

বাণেশ্বর শিব মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে রয়েছে প্রমাণ সাইজের শিবদিঘি। এই দিঘিতে রয়েছে অসংখ্য বিরল প্রজাতির বিশাল বিশাল আকারের কচ্ছপ। 'মোহন' নামে পরিচিত এই কচ্ছপগুলি কুর্ম অবতার রূপে শ্রদ্ধাভক্তি পেয়ে আসছে। ভক্তবৃন্দ মোয়া, নাড়ু, খই, মুড়ি দিয়ে তাদের সেবা করে থাকে। অনেক সময় এই কচ্ছপগুলিকে বাণেশ্বর অঞ্চলে বিচরণ করতে দেখা যায়। স্থানীয় অধিবাসীগণ এদের সর্বদা যত্ন সহকারে দেখভাল করে থাকে।

শৈবতীর্থ বাণেশ্বর মন্দিরের থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত আরও একটি প্রাচীন দেবালয় সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। দেবী চণ্ডী এখানে দেবী সিদ্ধেশ্বরী নামে পূজিতা হন। এই এলাকার গ্রাম নাম দেবী সিদ্ধেশ্বরী নামাঙ্কিত। অর্থাৎ এলাকাটি সিদ্ধেশ্বরী নামে পরিচিত। মন্দির চত্বরে রয়েছে একটি বহু পুরনো কামরাঙা গাছ, যা দেবী কামাখ্যা জ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি পেয়ে থাকে। সিদ্ধেশ্বরী কোচবিহার জেলার একটি অন্যতম শক্তিপীঠ। এই মন্দিরটিও কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের আওতাধীন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে নিত্যপূজা ও বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। বাণেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে ভক্তবৃন্দের আগমণ কোচবিহার জেলার পর্যটন মানচিত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দিক বিশেষ। সঠিক পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে বহিরাগত পর্যটকদের কাছে তা আরও আকর্ষণীয় করবার সুযোগ রয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
ঁশচীন্দ্রনাথ রায়, স্বপনকুমার রায় ও উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকা।

মধ্যযুগে এই জেলার ওপর দিয়ে বয়ে চলতো মহানন্দা, তিস্তা, নাগারু, কুলিক, কাহাণই, শ্রীমতি, সুধানি, বেহুলা, রোহিতা, কাঞ্চন প্রভৃতি নদী। জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ কাঞ্চন নদীপথে নৌকা করে এই মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন। মন্দিরের পূর্ব কোণে একটি সুড়ঙ্গ রয়েছে। এখানেই আগে পুজোয় ব্যবহৃত ফুল বেলপাতা ফেলা হত। মন্দির থেকে ৪০০ মিটার দূরে তাল দিঘিতে এই ফুল বেলপাতা ভেসে যেত। তবে বহু বছরের অযত্ন অবহেলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এই মন্দিরটি। মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে গজিয়ে ওঠে বট-অশ্বত্থ। এই ধরনের গাছের শেকড়ে ভেঙে পড়ে মন্দিরের দেওয়াল। যদিও রাজ্য হেরিটেজ কমিশন ইতিমধ্যেই মন্দিরটির সংস্কার করেছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনও মন্দির সংস্কারে অর্থ বরাদ্দ করে। ২০১০ সালে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কারের কাজ শুরু হয়। হেরিটেজ কমিশন ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা মন্দিরের ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি অক্ষুণ্ণ রেখেই মন্দিরটি সংস্কার করে এটিকে পর্যটন কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি বহু মানুষ দূরদূরান্ত থেকে এখানে ভক্তি ও মনস্কামনা পূরণে আসেন। নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। ইতিহাসের নানা স্মৃতিবিজড়িত এই মন্দিরে তাই একবার ঘুরে আসা যেতেই পারে। বিন্দোল গ্রামের সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি ভৈরবী মন্দিরের ভক্তি ও ইতিহাসের হাতছানি নতুন অভিজ্ঞতা আনবে— তা বলাই যায়।

অপরাজিতা জোয়ারদার

জলপাইগুড়ি শহরের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে
'এখন ডুয়ার্স' আয়োজিত

ডুয়ার্স বাংলা সীমান্ত মঞ্চ নাটক প্রতিযোগিতা

১৭ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর ২০১৮, জলপাইগুড়ি

নাট্যদলগুলিকে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাই

নিয়মাবলী

১। নাটক করতে হবে ৩৫ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে। মঞ্চসজ্জার জন্য অতিরিক্ত ১০ মিনিট।

২। নাটক হতে হবে মৌলিক। রাজনৈতিক প্রচারমূলক নাটক অথবা কোনও বিদ্বেষমূলক নাটক চলবে না।

৩। ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে (২০১৮) নাট্যদলের নাম, ঠিকানা, নাট্যকারের নাম, পরিচালকের নাম, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং ফোন নাম্বার সহ নিচের ঠিকানায় জমা দিতে হবে। সঙ্গে থাকতে হবে নাটকের সংক্ষিপ্তসার সহ নাটকের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। আবেদন করবেন — সম্পাদক, এখন ডুয়ার্স। জমা দেওয়ার ঠিকানাঃ আড্ডাঘর। মুক্তাভবন। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১। অথবা মেইল করুন editor.ekhonduars@yahoo.com

৪। আবেদনকারী দলের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে নির্বাচন করা হতে পারে।

৫। প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত দলগুলিকে নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যাতায়াত ভাতা এবং টিফিন দেওয়া হবে। মঞ্চে সাধারণ আলো এবং শব্দপ্রক্ষেপণ ব্যবস্থা থাকবে। মঞ্চসজ্জার কোনও উপকরণ পাওয়া যাবে না। নিজেদেরই আনতে হবে।

৬। প্রতিযোগিতায় স্থানপ্রাপ্ত নাটকগুলি নিয়ে একটি সংকলন প্রতিযোগিতার প্রথম দিন প্রকাশ করা হবে।

আরও বিস্তারিত জানতেহলে
যোগাযোগ করুন
editor.ekhonduars@yahoo.com

ইতিহাস অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ

বইপত্র সাহিত্য

‘কোচবিহার বৃত্তান্ত’ স্বপন রায় লিখিত কোচবিহারের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ, যাকে লেখক বলেছেন ‘কোচবিহার বিষয়ক এলোমেলো কয়েকটি পাঁচমিশেলি ভাবনা’। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা দিয়ে স্বপন রায়-এর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল, পরে ব্যাঙ্কে। জীবিকা যাই হোক না কেন তাঁর গভীর আকর্ষণ কোচবিহারের ইতিহাস বিষয়ে। ‘অন্যস্বর’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেও তিনি যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতির অধিকারী, তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে কোচবিহারে। কোচবিহারের শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও তাঁর ভেতর প্রোথিত। কোচবিহারের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। এসব প্রবন্ধ নিয়ে তার ভাবনাও ‘বহুমুখী’। এরকমই তিরিশটি প্রবন্ধের সংকলন ‘কোচবিহার বৃত্তান্ত’, যা একান্তই স্বপনবাবুর ইতিহাস অনুসন্ধিৎসার ফসল। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে— কোচবিহারের ইতিহাস অনুসন্ধান ও প্রত্ন সংরক্ষণ প্রচেষ্টা। ইতিহাস রচনার উপকরণ, ‘রাজ্য কোচবিহারের ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্তি বিষয়’, কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথিপত্র ও জার্নাল, পুরনো কোচবিহারের সাময়িক পত্র-পত্রিকা গেজেট, প্রাচীন কোচবিহারের অবলুপ্ত দেবদেবী, মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ও কোচবিহারের আধুনিকতা, মহারাণী সুনীতি দেবী নববিধান ও সমকাল। শতবর্ষে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ, এরকম বহুবিধ বিষয়ে তিরিশটি নির্বাচিত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ১৬টি দুর্লভ ঐতিহাসিক চিত্র রয়েছে যা ‘কোচবিহার বৃত্তান্ত’র বড় সম্পদ।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগ থেকেই বাংলার ইতিহাস সাধনায় দুটি ধারা পাশাপাশি চলছে, এক সামগ্রিক ধারা যা বাংলার জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ, আরেকটি আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ধারা, যা সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট এলাকার জনজীবনের ইতিহাস।

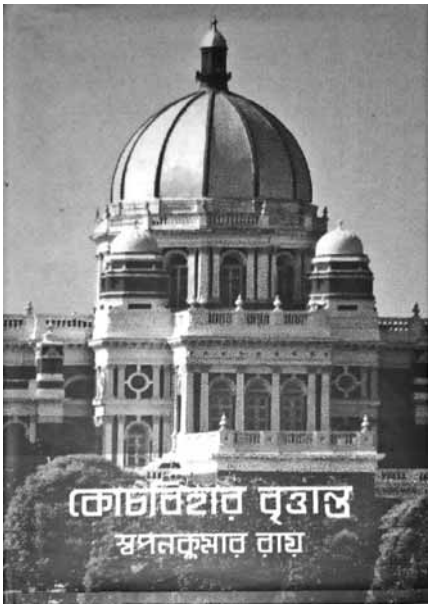

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পুস্তক তালিকা বা গ্রন্থপঞ্জী তৈরি করা। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত মুদ্রিত যাবতীয় বইয়ের তালিকা যদি ‘কোচবিহার বৃত্তান্ত’-এ দেওয়া হত তবে কোচবিহারের ইতিহাস সাধনার ধারা আরও বেশি স্পষ্ট হত।

স্বপন রায়-এর ‘কোচবিহার বৃত্তান্ত’ও এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কোচবিহার জেলার ইতিহাস চর্চার বেশকিছু আকর গ্রন্থ আছে যেমন— আমানতুল্লা আহমেদ খান চৌধুরীর ‘কোচবিহারের ইতিহাস’, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কোচবিহারের ভূগোল ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’, যাদবেন্দ্র চক্রবর্তীর ‘কোচবিহারের ইতিহাস’, নৃপেন্দ্রনাথ পাল-এর ‘মহারাজ বংশাবলী’, শশিভূষণ হালদার-এর ‘কোচবিহার হিতৈষণী সভা’ প্রভৃতি। স্বপনবাবু অকপটেই জানিয়েছেন— ‘এ গ্রন্থে পরিবেশিত সম্পূর্ণ তথ্যই লেখক কর্তৃক নানা আকরসূত্রে সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপাদানবলী থেকে পুনর্গঠিত ও লেখকের ভাবনা প্রসূত।’ তাই এ নিয়ে কোনও তর্কের অবকাশ নেই। তবে প্রতিটি প্রবন্ধ শেষে তথ্য উৎস ও পরিশেষে তথ্যপঞ্জী থাকলে বইটির গুরুত্ব আরও বাড়ত। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পুস্তক তালিকা বা গ্রন্থপঞ্জী তৈরি করা। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত মুদ্রিত যাবতীয় বইয়ের তালিকা যদি ‘কোচবিহার বৃত্তান্ত’-এ দেওয়া হত তবে কোচবিহারের ইতিহাস সাধনার ধারা আরও বেশি স্পষ্ট হত।

স্বপন রায়ের ‘কোচবিহার বৃত্তান্ত’ তথ্যবহুল ‘ঐতিহাসিক উপাদান সমৃদ্ধ’, তবে এটাই শেষ কথা নয়, তিনি তো পেশাদার ইতিহাস গবেষক নন, সম্পূর্ণত আঞ্চলিক ইতিহাস লিখন পদ্ধতি (হিস্টোরিওগ্রাফি) দ্বারাও চালিত নন। সংগৃহীত তথ্য ও উপাদানের যথাযথ ব্যবহার ও বিশ্লেষণ যেভাবে করেছেন তাতে কোচবিহারের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু পাঠক অবশ্যই আকৃষ্ট হবেন। বহু পরিশ্রম করে এ ধরনের একটি গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। বইটি সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত। আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ।

কোচবিহার বৃত্তান্ত (ইতিহাস অনুসন্ধান)
স্বপনকুমার রায়, কলকাতা, বইওয়ালা, ২০১৭
মূল্য ৩০০ টাকা।

রণজিৎ কুমার মিত্র

শুভ প্রকাশ

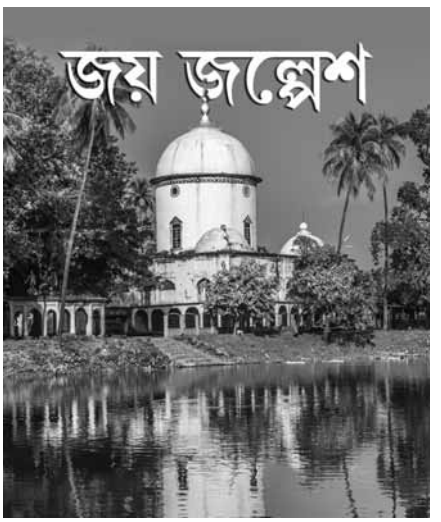

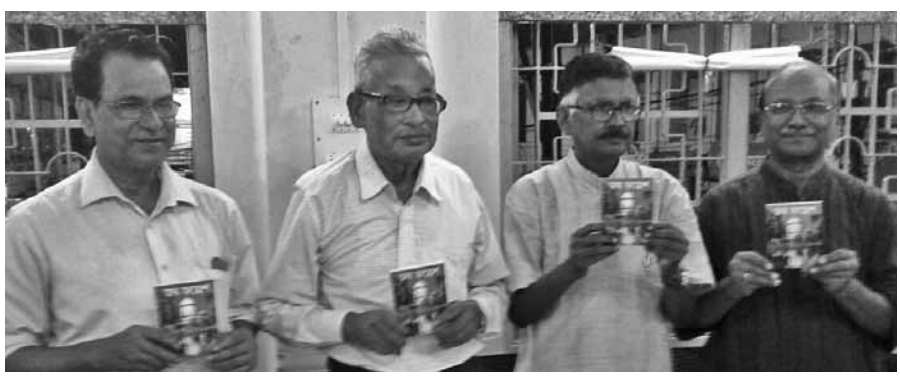

উল্টোরথের দিন অর্থাৎ ২১ জুলাই শনিবার বিকেলে জলপাইগুড়ির আড্ডাঘর-এ প্রকাশিত হল ‘জয় জল্লেশ’। ‘এখন ডুয়ার্স’ প্রকাশনা বিভাগের এই মরসুমের প্রথম বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক ড সুখবিলাস বর্মা, গবেষক উমেশ শর্মা ও জল্লেশ মন্দির কমিটির সভাপতি অজিত বর্মন মহাশয়। আড্ডাঘর ক্লাব সদস্যদের উপস্থিতিতে এই পকেট বইটির প্রকাশ উপলক্ষে জল্লেশ নিয়ে আলোকপাত করেন অতিথি বক্তারা। সংকলনের সম্পাদক শুভ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, জল্লেশ নিয়ে সাধারণ মানুষকে অবহিত করতেই এই বই, এটি কোনওভাবেই ধর্মগ্রন্থ নয়। জল্লেশ মন্দির ও মেলার নানান রঙীন ছবি বইটির আকর্ষণ বাড়াবে নিঃসন্দেহে। আর দামও রাখা হয়েছে ৯০ টাকা, যা সবার সাধ্যের মধ্যেই। বইটি পাওয়া যাচ্ছে ডুয়ারর্সের বড় বইয়ের দোকানেই।

নিজস্ব প্রতিবেদন

‘গোল্ডেন’ অতীত

আজও টেনে নিয়ে চলেছে দেড়শ বছরের পুরনো শহরের খেলাধূলা চর্চা

খেলাধুলায় ডুয়ার্স

তিস্তা নদীর পাড়ে দেড়শ বছরের প্রাচীন এই শহরের খেলাধূলার অনুশীলন-চর্চার লেখচিত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উর্ধগামী হতে হতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছে। ১৮৯৪ সালে এই শহরে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় যে ইউরোপীয়ান ক্লাব, সেখানে নিয়মিত খেলা হত বিলিয়ার্ডস, টেবিল, টেনিস, লন টেনিস। লন টেনিস টুর্নামেন্ট খেলতে দার্জিলিং, মালদা এমনকি বিহার থেকেও প্রতিযোগীরা আসত। চা-বাগান বেষ্টিত এই শহরে খেলাধুলা বিশেষ করে ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা ছিল রীতিমত ঈর্ষণীয়।

অতীতের বিখ্যাত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব আজ যাঁরা ৭০-৮০-র ঘরে পৌঁছেছেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় খেলাধূলা সম্পর্কে আজ হতাশার সুরই শুনতে পাই। ‘ওল্ড ইজ গোল্ড’ এই বহুল প্রচলিত বাক্যটি থেকে সরেই বলতে হচ্ছে একসময় সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা বাংলায় খেলাধুলা চর্চার পীঠস্থান ছিল এই এই জলপাইগুড়ি শহর। চা-শিল্পের উত্থানের সঙ্গে খেলাধূলারও যেন একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল অন্যান্য অ্যাথলিট মিট-এর মধ্যে বেশি চর্চা হত ফুটবলকে ঘিরেই। সেই সময় ক্রীড়া সংস্থা-সংগঠন ছিল না, খেলা হত ওয়ার্ড ভিত্তিক বা ক্লাব ভিত্তিক। এই শহরে খেলাধূলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যাক্তিটি যদি হন এস.পি.রায় (সত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়) তাহলে ক্লাবটির নাম অবশ্যই টাউন ক্লাব। ১৯৫৪ সালের আগে শহরে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন ক্লাসে-পাড়ায় খেলাধূলার অনুশীলন চলতে থাকলেও তাকে সাংগঠনিক রুপ দেন এস.পি.রায়। তাঁর উদ্যোগেই ১৯৫৪ সালে জলপাইগুড়ি শহরে গড়ে ওঠে জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং সেই বছরেই সংস্থার উদ্যোগে প্রথম লিগ পর্যায়ের খেলা শুরু হয়।

সেই সময় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বেশ কিছু ক্লাব। বলা যায় ক্লাবগুলি ছিল যেন ফুটবলার তৈরির এক একটি কারখানা। এই ক্লাব গুলিতেই খেলতেন কত দক্ষ ফুটবলার। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— মনিলাল ঘটক, রুনু গুহ ঠাকুরতা, ফজলার রহমান, সুকল্যান ঘোষ দস্তিদার, মণীষ ঘটক, বলাই অধিকারী, আফসার আলী, মোজাম্মেল হক, প্রভাস সাহা, অরুণ লামা, শিবু সিংহ, দেবু বসু, ভানু চক্রবর্তী, মঙ্গল ভৌমিক, রুনু চক্রবর্তী, কমল ভৌমিক, সন্ত চ্যাটার্জী, মিলন ঘোষ, নাড়ু গুহ, বরুণ সান্যাল, রণলাল ব্যান্যার্জী, বিপ্লব দত্ত, রতন দত্ত, ভলেন বসুনিয়া, মনিকা দে, বিপ্লব মজুমদার, অভয় মাহাতো, আরও কত নাম বলব? এঁদের মধ্যে মনিলাল ঘটক দীর্ঘদিন খেলেছেন ইষ্টবেঙ্গলের হয়ে। সুকল্যান ঘোষ দস্তিদার খেলেছেন মোহনবাগান ক্লাবে। খেলেছেন ভারতীয় একাদশের হয়েও।

যাঁরা জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা নিয়মিত খেলতেন তাঁরা হলেন — নীতিন ঘটক, ভনু চক্রবর্তী, রুনু চক্রবর্তী, সন্তু চ্যাটার্জী, কমল ভৌমিক, বিপ্লব মজুমদার, আফসার আলী চৌধুরি, বরণ স্যান্যাল, ভলেন বসুনীয়া, মিলন ঘোষ। অভয় মাহাতো ছিলেন একজন কৃতি ফুটবলার।

অতীতের কয়েক জন বিখ্যাত ফুটবলার, ক্রিকেটার, অ্যাথলিট যাঁরা আজও শহরের বাবুপাড়ার নার্সিংহোম সংলগ্ন চায়ের ঠেকে সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। তাঁদের সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরের অতীত-বর্তমান খেলাধূলা নিয়ে আলোচনা অনেক তথ্য জানা যায়। এঁরা হলেন—

মিলন ঘোষ, এখন বয়স ৭০, ছিপছিপে চেহারা। একসময় চুটিয়ে ফুটবল, ক্রিকেট দুটোই খেলেছেন। ৬০-৭০এর দশকে জে.ওয়াই.এমএ-র নিয়মিত ফুটবলার ছিলেন। একজন দক্ষ স্ট্রাইকার। ছাত্র জীবনে জেলা স্কুলে পড়াকালীন ১০০, ২০০, ৪০০ এবং ৮০০ মিটার দৌড়ে সাফল্য পেয়ে ব্যাক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। একসময় ক্রিকেটও জেলা দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৯৭ — ২০০২ এ প্রবীণ ফুটবলার হয়ে বাংলাদেশের ঢাকাতেও খেলেছেন।

রণলাল ব্যাণার্জী সত্তোরোর্ধ। এখনো নিয়মিত মাঠে অনুশীলন করেন। ২০০৬ সালে ব্যাঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত এশিয়া মাস্টার্স অ্যাথলিট মিটে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। ফুটবল খেলতেন ‘হাফ’-এ। ১৯৬৫-৬৬ তে জলপাইগুড়ি জেলা দলে প্রতিনিধিত্ব করছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবনে স্কুল অ্যাথলিট মিটএ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ভলিবলও খেলেছেন এক সময়। জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে খেলেছেন বিখ্যাত ফুটবলার সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে।

এই দুই প্রবীণ খেলোয়াড় মনে করেন ফুটবলে শহরের ছেলেরা উঠে আসছে না, তার কারণ অনুশীলনের সময় কেড়ে নিয়েছে প্রাইভেট টিউশন নামক পড়াশোনার ইঁদুর দৌড়। অভিভাবকরাও চান না পড়াশোনা না করে খেলাধূলা করে সময় নষ্ট করতে। বিনোদন সর্বস্ব আজকের খেলাধূলার জগৎ। গণমাধ্যমের বাড়-বাড়ন্তে বিশ্বক্রীড়ার দুর্দান্ত পারফরমেন্সের সামনে হারিয়ে যাচ্ছে ঘাম ঝরানো, খেলাধূলার অনুশীলন চর্চার মানসিকতা। চটজলদি সাফল্যলাভের অন্ধ মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে খেলুড়ের নয়া প্রজন্ম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় অতীতের একজন মহিলা অ্যাথলিটের নাম। তিনি দীপালি মল্লিক। শোনা যায় একসময় তিনি নিয়মিত তিস্তানদীর চরে ভোর বেলায় দৌড়তেন। এই অনুশীলন, পরিশ্রমের জন্যই তিনি একজন দক্ষ অ্যাথলেট হতে পেরেছিলেন। শ্যামল ভৌমিক এক সময় ভাল ক্রিকেট খেলতেন জেলা দলে ও ইউনিভার্সিটি হয়েও নিয়মিত খেলেছেন, জলপাইগুড়ি শহরে দক্ষ ক্রিকেটার হিসেবে শিলাদিত্য ও গদাই দুটোই জনপ্রিয় নাম। বাবলু বোসও খুব ভাল ক্রিকেটার ছিলেন।

এই জেলা শহরে একসময় ২২টি ফুটবল ক্লাবে খেলাধূলা হত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্লাবগুলি হোল টাউন ক্লাব, জে.ওয়াই.এম.এ, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, জে.ওয়াই.সি.সি., রায়কতপাড়া ক্লাব, মিলন সংঘ, ইউনাইটেড ক্লাব, পুলিশ ক্লাব, রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন। খেলাধূলার চর্চায় জলপাইগুড়িতে টাউন ক্লাব বাদে আর যে দুটি ক্লাবের নাম উল্লেখ করা হয়, সেই ক্লাব দুটি হল রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ও রায়কতপাড়া ইয়ং

অ্যাসোসিয়েশন। এই দুটি ক্লাবই এখনও নিয়মিত কয়েকদিন ব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে আসছে।

বর্তমানে ইনডোর গেমস অনুশীলন চর্চার কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য নাম জলপাইগুড়ি শহরের ল'কলেজ সংলগ্ন শিববাড়ি নবযুবক সংঘ। মূলত সাঁতার প্রশিক্ষণ ও শরীর চর্চা কেন্দ্র। এখানে ১৯৮৩ সনে সাঁতারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়। বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়েরা এখানে নানা শিফটে নিয়মিত সাঁতারের প্রশিক্ষণ নেয়। সম্প্রতি এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেরই একজন সাতারু মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ভাগীরথী বক্ষে দীর্ঘ সাঁতার প্রতিযোগিতায় নজর কাড়ে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে দুই-একজন রাজ্যস্তরেও সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া জলপাইগুড়ির মহন্তপাড়া সিনিয়র সিটিজেন পার্কেও সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনেক নিয়মিত অনুশীলন করছেন। সাঁতারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে এখানে মাল্টি জিমনাসিয়াম কেন্দ্রেও শরীর চর্চার সুযোগ রয়েছে।

জলপাইগুড়ি শহরের শিল্পসমিতি পাড়ায় করলা নদীর পাশে ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ইতিমধ্যেই বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে। এখানে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ব্যাডমিন্টনের বেশকিছু টুর্নামেন্টের আসর এখানে মাঝে মাঝে বসে। তেজেন সকারের তত্ত্বাবধানে বেস কিছু ছেলে মেয়ে ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতি বছর শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয় ব্লক স্তর এবং জেলাস্তরে ফুটবল এবং অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। শহরের ছেলেদের এখন মাঠে ফুটবলের পরিবর্তে ক্রিকেট অনুশীলনের দিকেই ঝোঁক বেশি। প্রত্যেকটি জেলা শহরের মত এই শহরেও একাধিক ক্রিকেট কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্সে শহরের ছেলেদের আগ্রহ ও উৎসাহ কমে গেছে। শহরের বাইরে চা বাগান অধ্যুষিত এলাকার আদিবাসী ছেলেদের মধ্যে এখনও ফুটবল-প্রীতি অটুট।

কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়িতে স্পোর্টস কমপ্লেক্সের (বর্তমান বিশ্বক্রীড়াঙ্গণ) মাঠে বসেছিল ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক মিটের আসর। এসেছিলেন বিখ্যাত অ্যাথলিক পি.টি.উষা। বর্তমানে স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে নিয়মিত ক্রিকেট অনুশীলনের সঙ্গে কুংফু-ক্যারটে নিয়েও প্রশিক্ষকদের কাছে প্রশিক্ষণ নিতে দেখা যায় এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের। জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে স্পোর্টস কমপ্লেক্সের উন্নত পরিকাঠামোর জন্যই এই বছর আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি এখানে নিয়ে এসেছে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (সাই) শিলিগুড়ি থানা। এই কেন্দ্রটিকে উত্তরপূর্বাঞ্চলের খেলাধূলার 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' হিসেবে গড়তে চলেছে সাই। এই কমপ্লেক্সে আছে দৌড়ের জন্য উন্নত ট্র্যাক জিম, সুইমিং পুল এবং দুটি মাঠ। অধিকর্তাদের পছন্দ এই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এখন অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, আর্চারি, সাঁতারের প্রশিক্ষণ হচ্ছে। এই বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনকে ঘিরে আগামী দিনে জলপাইগুড়ি শহরে খেলাধূলার ক্ষেত্রে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হতে পারে বলে প্রত্যাশা করা যেতেই পারে।

গৌতমেন্দু নন্দী

প্রতিবেদকের ঋণ স্বীকার শ্যামল ভৌমিক, মিলন ঘোষ, সন্ত চ্যাটার্জী, রণলাল ব্যানার্জি, গৌড় বিশ্বাস, উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এই প্রতিবেদনটি 'উত্তরের ক্রীড়া দর্পণ স্মরণিকা ২০১৭' থেকে অনুমতি নিয়ে পুনর্মুদ্রিত হল

হিলকার্ট

শিলিগুড়ি ডায়েরি

চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া একটা পথ, সড়কপথ। বেশ জমকালো একটি দ্বিত্ব গেঁথে দিতে ভালই লাগে যখন সেটা হয়ে যায় বিশেষ কোনও পথ। যেমন বলি 'হিলকার্ট রোড'-এর কথা, আসলে তো ৫৫নং জাতীয় সড়ক । বন্ধনহীন গ্রন্থি বেঁধে পথটি এগিয়ে গেছে। এগিয়ে গেছে পাহাড়ের ঢালকে জড়িয়ে মড়িয়ে নদীর কলতানে স্নান সেরে নিতে নিতে। গাছেরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, ফুলগুলি উপহার পাঠায়। 'মারব হালার পাসায় লাথ্যি' — কঁকিয়ে ওঠে দু'পাশের বকুল জারুল। 'শালা হারামি'। পথের কোনও ভাবান্তর হয় না। অটোচালকের সম্ভাষন শুনতে অভ্যস্ত টোটোচালক সামলে নেয় নিজেকে ও যানটিকেও।

এই রাস্তার ওপরেই আগে শুয়ে থাকত ট্রেনলাইন। দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ের বড় আদরের খেলনারেলের লাইন বেশ কয়েক বছর আগেও রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা ভবঘুরের মতোই পড়ে থাকত। হিলকার্ট রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় মিশে থাকা সমান্তরাল লাইন জোড়া কেমন এক রূপকথার ভূমিকা পালন করত। কবে যেন উঠে গেল তারা! রাস্তা চওড়া হল। দু'পাশের বাড়িঘর দোকানপাট অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে বদলে যাওয়ার দিকে। একেকটা বদল হয়, একেকটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে আর শহরের সাথে সভ্যতা এগিয়ে যায় আরও খানিকটা। পথ সাক্ষী থাকে।

রাস্তা কারও বাবার নয়, বলেছিল এক সুবেশ টোটোচালক। গ্র্যাজুয়েট। আগে একটা ছিল, এখন চারটে। গলায় সুখী সুরের গমক। তা বটে! পৈতৃক সম্পত্তিও কি সবার ভাগ্যে থাকে! রাস্তার দখলদারিতে কিন্তু সবারই অধিকার , শুধু বঁড়শিটি যথাস্থানে ফেলতে হয়, নয়ত দিনভর বসে থেকেও আলু-কাবলির ডালাটি পাতার জায়গাও পাওয়া যায় না।

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে চারচাকার বাহনে চেপে ফ্লাইওভার ধরে পৌঁছে যাওয়া যায় হিলকার্ট রোডের উপকণ্ঠে। কবে যেন রবীন্দ্রনাথও এই পথকে সাথী করেছিলেন। সি মেটাল অ্যান্ড রামসে কোম্পানি কে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ট্র্যামওয়ে তৈরির ভার দেওয়া হয় ১৮৭৮ সালে। তখন পাহাড়ে উঠতে গোরুরগাড়ি টাট্টু পালকি প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। ১৮৮২ সালে এই রাস্তার ওপর দিয়ে খেলনা ট্রেনের খেলনা ইঞ্জিন 'টাইনি' চলত ছোট্ট ছোট্ট চাকা ফেলে — কুউউ ঝিক ঝিক! জঙ্গলে ঘেরা সীমিত বাড়িঘর নিয়ে টিমটিমে শিলিগুড়ির প্রধান রাস্তা বলতে তখন হিলকার্ট রোড। মাঝ বরাবর ট্রেনের রাস্তা। আর তার পাশে মুষ্টিমেয় কয়েকটি দোকান। আজ রাস্তার দুইধারে ঝাঁ-চকচকে শো-রুম নানা কোম্পানির, নানা কিসিমের। ঝকঝকে সেইসব বিপণি-বিলাসের রঙীন মায়ায় শিশু ভিখারি ভিক্ষাও ভুলে যায়। তার লোলুপ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পথের মায়া হয়। সারাদিন ধুলো-ধোঁয়ার আড়ালে থাকা পথ যখন ঘুমোবে বলে পাশ ফিরছে, তখনি মাতালের চিৎকার, পুলিশের টহলদারি ভ্যান সবকিছু নিয়ে সময় খানিকটা হৈ-হৈ করে ওঠে। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে পথ ফিরে যায় সত্তরের উত্তাল হাওয়ায়। পথে এসে ভিড় জমায় রেডবুক, মাও-সে-তুং, মেধাবী যুবার দল, যাদের চোখে দিনবদলের স্বপ্ন। লোহার ব্রিজ মহানন্দার ভেজা বালুটুকু পার করিয়ে দিয়ে একটু গর্বভরে তাকায়।

লোহার ব্রিজের দিন পেরিয়ে বহু রাত পেরিয়ে এসেছে পথ। একটা একটা করে এখন তিন-তিনটি ব্রিজ। গতিময় এই পথের সাথী প্রায় চল্লিশটি বিলাসবহুল হোটেল, দশটিরও বেশি পার্লার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের শাখা-অফিস, বড় বড় বিপণি। রাস্তার দু'পাশে বেশ কিছু ছায়াময় গাছ, সৌন্দর্যায়নের জন্য কখনও লাগানো হয়েছিল। ব্যস্ত পথে অক্সিজেন ছড়িয়ে ছায়া ঢেলে সেসব এখনও দাঁড়িয়ে। তবে কোনো এক শান্ত সকালে পথটি পুরোপুরি জেগে ওঠার আগে রিকশা-সওয়ারি হয়ে যেতে যেতে মনে হয়েছে ডিভাইডারে গাছ লাগালে বেশি ভাল হত। মনে হয়েছে একই রাস্তায় চারচক্রবাহনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অটো বা রিকশা না চললেও পারত। যদিও দূষণমুক্ত ত্রি-চক্র যানের জন্য বেঁধে দেওয়া আছে সময়। কিন্তু বাকিরা তো দূষিত করেই চলেছে রাস্তা ও শহরকে। শহরটি ছিল গন্ডগ্রাম। যারা একদিন সামান্য মূল্যে কিনে ফেলেছিল জমি আজ তাদের অবস্থা জমজমাট। সেই জমাটি আড্ডা কে প্রশাসনিক নরম-গরমে সেঁকে রাস্তাকে বেশ চওড়া করে নেওয়া যেতে পারত। না হয় রাস্তার একটা দিক থেকে যেত খেলনা ট্রেনের জন্য। অন্য অংশে ওয়ানওয়ের ব্যবস্থা। এসব হয়ত কল্পনা। তবুও কি কল্পনাকে রূপ দেওয়া যেতে পারত না?

ভোরের শহরে হিলকার্ট রোড ধরে কখনও কখনও বেরিয়ে পড়েছি প্রাতঃভ্রমণে। হাঁটতে হাঁটতে দূরের পাহাড় দেখতে পাওয়া স্বপ্নময় বৈ কি! উত্তরের মৃদু শীতল বাতাস মেখে এগিয়ে যেতে যেতে কখন পৌঁছে গেছি মহানন্দা ব্রিজ-এর ওপরে। ভাল লাগার চরম মুহূর্তে পৌঁছেও মন খারাপ হয়েছে নদীর দিকে তাকিয়ে।

এই শহর মানুষের রাতের বিশ্রামের শহর। সফর বিরতির শহর,আবার দূরদূরান্ত থেকে কেউ কেউ শুধুই আনন্দ-ফূর্তি করতে কাটিয়ে যায় একটি যাদুকরী রাত। অনেককিছুর হাতবদল ঘটে। ভালোমানুষ- মন্দমানুষ, খুনি-গুন্ডা, চোরাচালানকারী , জমিমাফিয়া, ধান্দাবাজ, পর্যটক — সকলের পায়ে পায়ে দিন পেরোতে থাকে পথ।

তবু কোনও কোনও দিন হিলকার্ট রোডের মহানন্দা ব্রিজে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে বড় অলৌকিক মনে হয় এই পথটিকে, আকাশ পানে এগিয়ে যেতে যেতে পৌঁছে গেছে দার্জিলিং।

শ্যামলী সেনগুপ্ত

ভেজাল কোথায়?

সেদিন যারা তেলে ভেজাল দেওয়ার প্রতিবাদে গুলি খেয়েছিল, তাঁদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া শাসক দলের গুলিতে কোনও ভেজাল ছিল না। যাঁরা ভেজাল তেল না জেনে কিনতেন, তাঁদের দেওয়া টাকাতেও কোনও ভেজাল ছিল না। সেদিন যিনি আন্দোলনে না এসে ঘরে বসে সময় কাটাচ্ছিলেন, তিনি যখন আজ সেই প্রতিবাদ মিছিলে থাকার স্মৃতি রোমন্থন করেন— তখন সেই মিথ্যেতে কোনও ভেজাল পাওয়া যায় না।

আসলে ভেজাল কোথাও নেই। ক-দিন আগে কোচবিহারের পথে যে তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়ে অবশেষে মরে গেল সে-ও তো খাঁটি একটা গুলি খেয়েছিল। বন্দুকে ভেজাল ছিল? বোমায়? বুভুক্ষুর মত কাট মানি খাওয়ায়? ক্ষমতার খাঁটি স্বাদ পাওয়ার জন্য পায়ে তেল মাখানোর চেষ্টায় কি ভেজাল থাকে?

সত্যি বলতে কি, জনতা বড্ড ভেজাল পছন্দ করে। জনতাকে খাঁটি খাবার দিতে নেই। পেট খারাপ হবে। মাংস ভাগার থেকে আসছে না ডাস্টবিন থেকে আসছে সেটা বড় কথা নয়। আসল হল স্বাদ। দোকানের আলো দেখুন, এসি দেখুন, টেবিল চেয়ারের বাহার দেখুন, বাসনপত্র দেখুন— পয়সা তো এরজন্যই দেওয়া! এরপরে যা খেলেন তা কোত্থেকে এলো তাতে কী এসে যায়? ভেজাল দিচ্ছি কারণ আমার ভোট আছে। ভেজাল ইন্ড্রাস্ট্রির কত ভোট তা জানেন স্যার? যে এই ইন্ডাস্ট্রির দিকে ব্যাড লুক দেবে তার ভোট রাতারাতি হাওয়া করে দেব। লাল ঝান্ডার দিনেও মাংসের ঝোলে মোবিল মিশিয়েছি। এখন ঘাসফুল যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তো ওটাকে পদ্মফুল বানিয়ে দেব।

আপনারাও মাইরি কিছু বুদ্ধিজীবি হয়েছেন! কবে সাগর দীঘির পাড়ে দু-তিনটে ছোকরা ভেজাল তেলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মরে গেছে তা নিয়ে এখনও হা-হুতাশ করেন। শহীদ দিবস দেখুন! মারল এক দল, মরল আরেক দল, মোচ্ছব করে আরও একটা দল আর গালি দেয়আরও আরও একটা দলকে। কই? এরমধ্যে তো ভেজাল খুঁজে পান না আপনারা?

আসলে স্যার আপনারা পোতিবাদ করতে ভুলে গেছেন। আপনাদের হয়ে সব পোতিবাদ সিনেমায় পোসেনজিৎ করে দিয়েছে। ভেজাল শুনলে আগে পাব্লিক রাস্তায় নামত। আমাদের টেনশন হত। এখন অত চাপ নেই বুঝলেন। ভাগারের মাংস দিয়ে চিলি চিকেন বানাব— টের পেলে ফেসবুক পোস্ট মারবেন। পলিটিক্স করবেন। পুলিশ ছান মারলে বলবেন, বিরোধি করে বলে ফাঁসান হচ্ছে। এই রকম ফাঁসান এখন বাংলার ধর্ম —তাই মিডিয়া ব্যাপারটা খেয়ে নেবে।

কিন্তু ভুলেও রাস্তায় নামবেন না। নামলে যদি ভেজাল উঠে যায় তবে তো আপনাদের পেট খারাপ হবে, তাই না স্যার? আপনারা ফর্সা হওয়ার জন্য ক্রিম মাখেন, লম্বা হওয়ার জন্য পাউডার খান, বুদ্ধি বাড়ানর জন্য চল্লিশটা পুষ্টিগুণ যুক্ত চকলেট ড্রিঙ্কস খান শুনেছি। এই রকম বুদ্ধি নিয়ে খাঁটি খাবার খেতে লজ্জা করে না?

লক্ষ্য করলে দেখবেন আমরা ভেজাল দিয়ে খাবারটা ভগবানের ফোটোর সামনে রাখি। কই, ভগবানের তো পেট খারাপ হয় না! আপনারা যে ভগবান হতে পারেন নি সেটা কি আমাদের দোষ? মাংস একটু পচে গেলে কী ক্ষতি হয়? সীমান্তে জওয়ানরা দেশের জন্য মরছে আর আপনারা ভেজাল ভেজাল করে লাফাচ্ছেন। এইজন্যই তো দেশের কিছু হয় না। সত্তর বছর ধরে ভেজাল খেয়েছেন, কই, তখন তো কিছু টের পান নি। রাজ্যের ফুড কনট্রোল বিভাগকে ফালতু দোষ দেবেন না। আগের গম্মেন্ট দু-লাখ কোটি টাকা লোন রেখে গেছে। ফুড কনট্রোল কী করবে?

মোদ্দা কথা শুনে নিন স্যার! এটা হল ভেজালের যুগ। ভেজাল ডাক্তার, ভেজাল গবেষক, ভেজাল কবি, ভেজাল নেতা, ভেজাল ধর্ম —এরাই তো সব চারদিক করে কম্মে খাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামলে দেখবেন খাঁটি লাঠির বাড়ি, খাঁটি গুলি-বোমা, খাঁটি ফাঁসিয়ে দেওয়া, খাঁটি গণধোলাই সবাই হাজির! খাঁটির প্রতি এত টান যখন ওসব নিলেই তো পারেন! বছর তিরিশেক আগে কারা জানি খাঁটি জিনিস টেস্ট করতে গেছিল, গম্মেন্ট টেস্ট করিয়ে দিয়েছে!

তাই বলছি স্যার, এই মাটন বিরিয়ানিটা খেয়ে দেখুন। মুরগির পটি গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিয়েছি। হাত চেটে খাবেন। ভেজাল খান, ভালো থাকুন। পোধানমন্ত্রীরা তো অলওয়েজ খাঁটি আর সেরা খাবার খায়। তার ফল দেখছেন তো? শুধু উল্টোপাল্টা বকছে। আসলে স্যার ভেজাল দেওয়া আচ্ছে দিনটাই সত্যি। বাকি সব বখওয়াস! কারণ ডিজিটাল যুগে একমাত্র ভেজাল শব্দটাই খাঁটি।

কে আছিস! বাবুকে ডিটারজেন্ট মেশানো খাঁটি দুধ দে তো এক লিটার!

অনু ঘটক

রিস্ক নিয়ে যা রোজ খাই

ভোজ্য	সম্ভাব্য ভেজাল	ব্যারাম হতে পারে
পাউরুটি	খারাপ মানের ঈস্ট	ডাইরিয়া-বমি-অ্যালার্জি
ডিম	সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	ডাইরিয়া-বমি
মাছ	ফর্মালিন	ব্রঙ্কাইটিস-ক্যানসার
শাকপাতা	গামা বিএচসি	ক্যানসার-শ্বাসকষ্ট
আনারস	ইথিয়ন	শ্বাসক্রিয়ায় সমস্যা
গাজর, শুটকি মাছ	ডিডিটি	ক্যান্সার-জন্মত্রুটি
টম্যাটো	ইথিয়ন	শ্বাস কষ্ট
ক্যাপসিকাম	গামা ক্লোরডেন	হজমে গণ্ডগোল লিভারের অসুখ
চিকেন	সিপ্রোফ্লোক্সাসিন সালফোনেমাইড	ডাইরিয়া-বমি চামড়ায় র‍্যাশ
দুধ	অ্যালড্রিন ফর্মালিন	মাথা ঘুরে সংজ্ঞাহীন ক্যানসারের রিস্ক
কলা	ক্যালসিয়াম কার্বাইড	হজম ও লিভার সমস্যা ক্যানসারের সম্ভাবনা
নুন	সাদা চকের গুড়ো	অ্যাপেনডিসাইটিস
সবুজ সব্জি	ম্যালাসাইট গ্রিন	দীর্ঘদিন খেলে ক্যানসার
আপেল	মোমের কোটিং	পেটে আলসার
চা পাতা	কোল টার	বিষাক্ত, ক্যানসার
আম	কার্বাইড	মাথাঘোরা বমি বমি স্নায়ু রোগ
আইসক্রিম	ওয়াশিং পাউডার	পেটের অসুখ

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

অভিনব ডুয়ার্সে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২০০ টাকা

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি।
দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের সেরা তিন লেখকের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

ক্রাইম থ্রিলার

লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা

ছোটদের বই

সবুজ মনের গল্পগুলি। রীতা রায়। ১২৫ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা

সিকিম।
সংকলন। ২০০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে।
২য় খণ্ড ১৫০ টাকা

মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন।
তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা

সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা

পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
মেইল করুন dooarsbooks@outlook.com **বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।**
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যাবে (বই না পেলে সরাসরি অর্ডার করুন আমাদের)

শিলিগুড়ি: হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড কাস্টমস বিল্ডিং সংলগ্ন। **ইকনমি বুক স্টল,** কলেজ রোড। **বিশ্বাস বুক এজেন্সি,** হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: আড্ডাঘর,** মার্চেন্ট রোড। **গ্রন্থ ভারতী,** ডিবিসি রোড। **আলিপুরদুয়ার: শ্যামলী বুক ডিপো,** নিউটাউন। **কোচবিহার: এস বি বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স,** রূপনারায়ণ রোড। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** গ্রন্থভারতী। ধানসিঁড়ি। ওয়েস্ট দিনাজপুর বুক সাপ্লাই এজেন্সি। **কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর,** কলেজ স্ট্রিট।

বই আপনার কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে ফোন করুন
উত্তরবঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮, কলকাতায় ০৩৩-৪০৭০ ১৪৪৪

ডুয়ার্স প্যাকেজ টুর

২ রাত ৩ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা
৩ রাত ৪ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সুনতালেখোলা-জল্পেশ তিনবিঘা-কোচবিহার।
৪ রাত ৫ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা জল্পেশ-তিনবিঘা-কোচবিহার-জলদাপাড়া-বক্সা।
নিউ জলপাইগুড়ি/নিউ মাল থেকে,
ইকনমি/ডিলাক্স প্যাকেজ
যোগাযোগ ৯৮৩০৪১০৮০৮/৯৯৩৮৩২১২৩

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Common Dine-in place for breakfast- lunch-evening snacks-dinner,
Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9434442866, 9002772928

মোহিনী মূর্তির পাড়ে আয়েশের সঙ্গে মেশে রোমাঞ্চ

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.